অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শর্মিষ্ঠা বর্মন

রেজিস্ট্রেশন নং : A00BE1200315, রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২৮.০৭.২০১৫

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পায়েল বসু

সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

Certified that the Thesis entitled

“অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)”

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Assistant Professor D. Payel Bose Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor :

Dated :

Candidate:

Dated :

প্রাক্‌কথন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীন পি.এইচ.ডি গবেষক হিসাবে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় – **"অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)"**। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকুল্যে গবেষণার কাজ শুরু করি।

এই গবেষণার কাজের এক একটি ধাপে বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহায্য প্রতিমুহূর্তে আমাকে অনুপ্রেরণা দান করেছে। বিভিন্ন সমস্যার কারণে যখন গবেষণার কাজ থমকে যেতে বসেছিল তখন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের অনুপ্রেরণা আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক উদয় কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা গোপা দত্ত, অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার, অধ্যাপক আবদুল কাফি, অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিনহা সাহায্য করেছেন নিরন্তর।

গবেষণার শুরুতেই অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল। কম্পিউটার টাইপ বানান সংশোধন ও গবেষণাপত্র নির্মাণ তাঁর নির্দেশে শেখা। গবেষণা সংক্রান্ত বইয়ের অপ্রতুলতা তিনি পূরণ করে দিয়েছিলেন তাঁর বইয়ের সম্ভার উজাড় করে দিয়ে।

আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. পায়েল বসুর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তিনি আমার উপর সীমাহীন ভরসা রেখেছেন। আর যখন বিভিন্ন সমস্যার কারণে পি. এইচ. ডি-র কাজ থমকে যাচ্ছে বলে ভেঙে পড়েছি তিনি আমার অসীম ভরসাস্থল হয়ে পাশে থেকেছেন। দিদির মত সাহচর্য্য প্রদান করেছেন। যে সাহচর্য্য ব্যাতিরেকে এই গবেষণার কাজ শুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর এ অবদান কোনও কিছুর বিনিময়েই পূরণ করা যায় না।

ধন্যবাদ জানাই শ্রী সুপ্রতীপ দেবদাস মহাশয়কে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সংগ্রহের পত্র-পত্রিকা-বই এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য। আর উল্লেখ করতে চাই ভাই শীর্ষ

দাশগুপ্তের কথা। বিভিন্ন সময় নিজস্ব উদ্যোগে বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে এই গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পাশে থাকার জন্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগারিক আইভি দি, হরিশদা, নিতাইদা, সুদীপের সাহায্য ছাড়া এই কাজ এগোনো সম্ভব হত না। আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন লাইব্রেরির জনাব মশিকুর রহমানের কাছ থেকে। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রী সন্দীপ দত্ত তাঁর নিজের অসুস্থতা উপেক্ষা করে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন। তাঁর এ অবদান ভোলার নয়। সাহায্য পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের থেকেও।

আমার বাবা, দুই বোন, চিকিৎসক প্রদ্যোৎ কুমার হাজরা এবং আমার প্রিয় বন্ধু সুমন দাসের নিরন্তর সাহচর্য্য ও সহযোগিতা গবেষণার কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। আর আমার মা– একজন বহু প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ। তিনি তাঁর সমস্তটা দিয়ে তিন মেয়েকে একজন ভাল মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন। আমাকে বড় করতে চেয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা সম্পন্ন হতে পারেননি। তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাটুকু ছাড়া দেওয়ার কিছু নেই আমার।

ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু রূপম প্রামানিককে, গবেষণার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য। আমার বন্ধু, দাদা, দিদি, জুনিয়র গবেষকদের ধন্যবাদ জানাই যারা আমার গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যায় আমার পাশে থেকেছে।

আমার জন্মস্থান গোসাবা-বিজয়নগর এলাকার মানুষ যাঁরা আমাকে ধুলো কাদা মাখা মেঠো পথ, নদীর চড়ায়, মাঠে ঘাটে শৈশবের দিনগুলিতে বেড়ে উঠতে দেখেছেন; পরবর্তীকালে পিয়ালিতে এসে বাস করার সময় একটা আনকোরা মেয়েকে তাঁদের সামনে স্কুল-কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে দেখলেন; আমার অনেক খেলারসাথী, বান্ধবী যারা প্রথমিক শিক্ষার গণ্ডীটুকু পার হওয়ার সুযোগ পায়নি, বাল্যকালেই বিয়ে হয়ে গেছে বা যারা একটু পড়ার সুযোগ পেয়েছে আরও সুযোগ পেলে হয়তো অনেক কিছুই করতে পারত– এমন জানা অজানা বহু মানুষের হয়ে আমার এ গবেষণার কাজ।

সবেশেষে স্মরণ করি সেই সব মহীয়সীদের যাঁদের লেখা নিয়ে আমার গবেষণা। তাঁদের লেখা, তাঁদের জীবন সংগ্রাম প্রতিনিয়ত আমাকে একজন মানুষ হিসাবে চিনতে শিখিয়েছে। যে বিপুল শক্তি নিয়ে অন্ধকারের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়েছেন এবং আত্মশক্তিতে জয়ী হয়েছেন তা আমাকে প্রতি মুহূর্তে শক্তি যুগিয়েছে। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা আমার গবেষণার শুরুতে জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম লিখতে গিয়ে শুধু জন্ম সাল উল্লেখ করেছি মাত্র। কিন্তু গবেষণার শেষে এসে আজ তাঁরা না পাওয়ার দেশে বিলীন হয়ে গেছেন। কিন্তু রেখে গেছেন তাঁদের বলিষ্ঠ চেতনা।

গবেষণা সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি কিছু মুদ্রণ ও বানান প্রমাদ থেকে যায় তার জন্য গবেষক ক্ষমা প্রার্থী।

পরিশেষে আমার পড়াশুনা, চিন্তন এবং সিদ্ধান্তের এই লিপিবদ্ধ গবেষণা অভিসন্দর্ভ মাননীয় বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে বিনীতভাবে উপস্থাপন করছি।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা

- ভূমিকা ১-৭
- প্রথম অধ্যায়— ৮-৪২

  সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান : বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত।
- দ্বিতীয় অধ্যায়— ৪৩-৭৭

  রোকেয়া রচনায় সমাজচিন্তা ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৩২)।
- তৃতীয় অধ্যায়— ৭৮-১০৭

  রোকেয়া সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন।
- চতুর্থ অধ্যায়— ১০৮-১৫৪

  রোকেয়া পরবর্তী বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন(১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে)।
- পঞ্চম অধ্যায়— ১৫৫-১৭২

  ১৯৫২ র ভাষা আন্দোলন : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়।
- ষষ্ঠ অধ্যায়— ১৭৩-২০৩

  বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় পূর্ব বাংলার সমাজ প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭০)।
- সপ্তম অধ্যায়— ২০৪-২৩৯

  বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়।
- উপসংহার— ২৪০-২৪৬
- গ্রন্থপঞ্জী ২৪৭-২৬১

ভূমিকা

ভূমিকা

গবেষণার সময়কাল ১৯০৫ থেকে ১৯৭১। বৃটিশের বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ। এই সময়ের অভিঘাত বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় কিভাবে ধরা দিয়েছে তা খুঁজতে চাওয়া হয়েছে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন থেকে যে নারী ঘর থেকে বেরুতে শুরু করলেন সেই নারীর কাছে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে ঘর ও বাহির সমান হয়ে গেল। নারীর এই যাত্রা পথ ধরতে চাওয়া হয়েছে এই গবেষণায়। এই যাত্রাপথে রাজনৈতিক উত্থান পতনের সাথে নানান সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে সে। এই কর্মকাণ্ড দীর্ঘ দিনের পুরুষতন্ত্রের নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে। এই কর্মকাণ্ড নারীর নিজস্ব সংস্কার ভাঙার তাগিদে। এই কর্মপ্রচেষ্টায় সমাজের এবং নারীর নিজস্ব জগতের পরিবর্তন হয়েছে ক্রমশ। তাই দেখতে পাই বিশ শতকের প্রথমার্ধে এদের রচনায় যে বিষয়গুলো প্রধানত স্থান পেয়েছে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম শতকে অবরোধ প্রথা, বহু বিবাহ, তালাক প্রথার কুফল, নারী শিক্ষা, নারীর ভোটাধিকার, নারীর মর্যাদা, বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা এগুলি স্থান পেয়েছে তাদের রচনায়। স্থান পেয়েছে বৃটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের নানা ঘটনাক্রম। দ্বিতীয় দশকে মুসলিম নারীর রচনায় দেশ ভাগের অভিঘাত, ভাষা আন্দোলন, সামরিক শাসন, মৌলবাদ, মুক্তিযুদ্ধের নানান দিক ধরা পড়েছে। এই যাত্রাপথে প্রথম মাইল স্টোনের মতন দাঁড়িয়ে আছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে রোকেয়ার স্থান তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটা যুগের প্রতীক। তিনি সেই সাথে সেই যুগেরই অনেক আলোক কণার সমাহার। তাঁর আগে এমন কয়েকজন বাঙালি মুসলমান নারী বাংলাদেশে জন্মেছিলেন যাঁরা নারীদের প্রতি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যায় আচরণ গুলির প্রতিকারে সামিল হয়েছেন; কলম ধরেছেন। শুধু মুসলমান নারী নয় তাঁর আগে সমাজ পরিবেশের মোড় এমন দিকে যাচ্ছিল যে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা অন্ধকার অবরোধের দ্বার ঠেলে আলোর সন্ধান করছেন, শিক্ষিত হওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। উনিশ শতকের শুরু থেকে

সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার দৈবী প্রভাব সরিয়ে 'মানুষ' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যে পর্ব বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন রামমোহন(১৭৭২-১৮৩৩) বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১)। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে যুক্তি ভিত্তিক 'মানুষ' করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের হাত ধরেই নারীকে 'মানুষ' হিসাবে গণ্য করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এদেশে। যদিও মুসলমান সমাজে আধুনিক চিন্তার আলোকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগিতা শুরু হয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে। নারীমুক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা আসে আরও পরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চিন্তা আসেই। বাঙালি মুসলমানের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অংশই নারীশিক্ষা, নারীমুক্তির ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভাবনা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। নারীরাও এক অদম্য প্রয়াসে পুরাতন জ্বরাগ্রস্ত চিন্তার বিরুদ্ধে নিজের মননকে প্রস্তুত করেছে। এগিয়ে গেছে আধুনিক চিন্তার অভিমুখে। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে নারীর অবস্থান তার চিন্তা যা ছিল দ্বিতীয় অর্ধে তার কিছু পরিবর্তন হল। বিশ শতকে নারীর নিজস্ব মুক্তির ইতিহাসে অন্য এক দিগন্ত উন্মোচিত হল যার সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকেই। আবহমান কালের ইতিহাসে নারীর এ এক ভিন্ন অবস্থান। এই সবটা মিলিয়ে অধ্যায় বিভাজনের দিকটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন যুগে নারীর অবস্থান সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা কেমন ছিল তার নির্যাসটা ধরতে চাওয়া হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে নারীর অবস্থানের একটি রূপরেখা আমরা দেখতে চেয়েছি। বৈদিক যুগের সাথে সাথে দ্রাবিড় অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী অধ্যুষিত বাংলায় নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা আমরা দেখতে চেয়েছি। এরপর ক্রমাগত এক এক জনগোষ্ঠী বাংলায় আসছে। আর্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা, মুসলিম রাজাদের আগমণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, সহজিয়া-আউল-বাউল সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বাংলার নারীদের অবস্থা কি ছিল তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধরতে চাওয়া হয়েছে। তারপর অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে সারা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বনিকী ব্যবস্থার সাথে নিয়ে এসেছে ইয়োরোপের নবজাগরণের বলিষ্ঠ চিন্তা। এই চিন্তার প্রভাবে ভারতবর্ষেও

আধুনিকতার জন্ম দেয়। যার অভিঘাতে পরিবর্তিত বাংলাদেশের উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ঘটনাক্রম ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনাক্রমে বাঙালি নারীও সাড়া দিয়েছে। তার সাথে তার নিজের মুক্তির প্রচেষ্টায় আগুয়ান হয়েছে। বাঙালি মুসলিম নারীরাও দীর্ঘদিনের আগল ঠেলে বেরিয়ে এসেছেন। নিজেদের মুক্তির দাবি নিয়ে সামনে এসেছেন। রোকেয়া যদি নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাত সূর্য হন তাহলে তাঁরা ঊষার আলোক। রোকেয়া পূর্ববর্তী এই বাঙালি মুসলিম নারীদের সমাজ তথা নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁদের সেদিনের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রোকেয়া রচনাকে ভিত্তি করে তাঁর মানস জগৎকে ধরতে চাওয়া হয়েছে। যদিও তাঁর চিন্তার যে ব্যাপ্তি তাঁকে ধরা সম্ভব হয়নি অনেক ক্ষেত্রেই। এমনকি তাঁর সব রচনাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে কিছু রচনা নির্বাচন করতে হয়েছে।

রোকেয়ার সময়ে যাঁরা লেখালিখি করেছেন, তাঁর সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন— তাঁদের রচনা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়। যদিও খায়েরুন্নেসা(১৮৭৪/৭৬- ১৯১০) রোকেয়ার আগেই জন্মেছেন। কিন্তু তাঁর লেখালিখি রোকেয়ার সময়কালেই। আবার মাসুদা রহমান(১৮৮৫- ১৯২৬), মামলুকুল ফতেমা খানম(১৮৯৪- ১৯৫৭), বিদ্যাবিনোদিনী নুরুন্নেসা খাতুন(১৮৯৪-১৯৫৭), এঁরা সবাই রোকেয়ার পরে জন্মেছেন কিন্তু লেখালিখি করেছেন তাঁরই সময়ে। মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসার জন্ম-মৃত্যু সাল জানা যায়নি। তবে তিনিও লিখছেন একই সময়ে। এবং এঁদের রচনা প্রায় ১৯৪০ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাসুদা রহমান মারা গেছেন। ফতেমা খানম অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর লেখালিখি প্রায় বন্ধ এবং নুরুন্নেসা লেখালিখির জগৎ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন। তাই উনিশ শতকে যাঁদের জন্ম এবং বিশ শতকের প্রথম অর্ধে যাঁরা গদ্য রচনা করছেন তাঁদের রচনা নিয়ে এই অধ্যায়। এই পর্বের রচনায় নারী শিক্ষা, পর্দা, অবরোধ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয় ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয় বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মত সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তাঁরা যা ভেবেছেন তা আমরা ধরতে চেয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁদের রচনা নিয়ে আলোচিত হয়েছে যাঁরা রোকেয়ার ঠিক পরবর্তী সময়ের প্রতিনিধি। এই সময় রোকেয়া সহ আরও অনেকের মিলিত প্রচেষ্টায় একটু একটু করে বাঙালি মুসলিম সমাজ মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করছে। যে সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে চেয়ে পরিবারের চাপে সমাজের চাপে এগুতে পারছেন না তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মত সামাজিক মননও তৈরি হয়েছে। এই পর্বের রচনায় নারীর নিজস্ব দাবি- শিক্ষা, ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সহ বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে এসেছে। উঠে এসেছে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লববাদ, গান্ধীবাদ, শ্রমিক বিপ্লব, ফ্যাসিবাদ, কমিউনিস্ট আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়। ফজিলতুন্নেসা(১৯০৫-১৯৭৬), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা(১৯০৬-১৯৭৭), রাজিয়া খাতুন চৌধুরী(১৯০৭-১৯৩৪), শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪), আছিয়া মজিদ বি.এ, সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯), জাহানারা ইমাম(১৯২৯-১৯৯৪) এঁদের প্রবন্ধ, চিঠি এবং স্মৃতিকথায় ১৯৪৭ সাল পূর্ববর্তী সময়ের নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতির ভাবনাকে ধরতে চাওয়া হয়েছে।

বাঙালি মুসলিম নারীরা ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনে কিভাবে সামিল হচ্ছেন সে প্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়। উক্ত আন্দোলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের লেখা প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাকে ভিত্তি করে এই অধ্যায়। ভাষার দাবিতে এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে স্বল্প পরিসরে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। এই পর্বে সুফিয়া আহমদ(১৯৩২-২০২০), রওশান আরা বাচ্চু(১৯৩২-২০১৯), সুফিয়া কামাল, সনজিদা খাতুন(১৯৩৩), বেগম হবিবর রহমান-এর লেখা প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথার উপর ভিত্তি করে ভাষা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবস্থানকে আমরা দেখতে চেয়েছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গের মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থান, নারীর নিজস্ব কর্মকাণ্ডকে তাঁদের লেখায় ধরতে চাওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে নতুন দেশ গঠনের পর থেকে ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে শাসকের বিভিন্ন ফরমানের সাক্ষী থেকেছে পূর্ব বঙ্গের মানুষ। তারা এই ফরমানের

বিপদ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত নতুন দেশের নাগরিকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি ধর্মের নামে শাসকের সমাজ সংস্কৃতির উপর আক্রমণকে। মেয়েদের অবস্থানও আরও বেশি সংকটের সম্মুখীন হয়। অর্জিত স্বাধীনতা এবং অধিকারও খর্ব হতে বসে ধর্মের নামে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গবাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সামরিক শাসন। এসবের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানের সামনে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়। সে আগে 'বাঙালি', তারপর তার অন্য পরিচয়। এই পরিচয়েই সে তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হল। নারীও তার নিজস্ব মুক্তির দাবিকে আরও মজবুত করতে চাইল। সাথে দেশের দুর্দিনে দেশ রক্ষার লড়াইতে যোগ দিল। সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম(১৯৪৪), নবুয়াত ইসলাম পিনকি, কোহিনূর হোসেন, সনজিদা খাতুন লিখেছেন সেই সময়ের প্রচ্ছদ।

সপ্তম অধ্যায়ে বাঙালি মুসলমান নারীর রচনায় ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে তার বহুদিক ব্যপ্ত অবস্থানকে দেখতে চাওয়া হয়েছে। ত্রিশ লক্ষেরও বেশি প্রাণ ও দু লক্ষেরও বেশি 'বীরাঙ্গনা'র আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। গঠিত হয়েছে বাংলা দেশ। এই বিজয়ীভূমিতে যাঁরা অনেক কিছুর বিনিময়ে স্বাধীনতা দেখেছেন তাঁদের স্মৃতির আগুনে উসকে থাকা সময়কে ধরতে চাওয়া হয়েছে। কেউ হারিয়েছেন তাঁর স্বামী-সন্তান-বাবা-দাদা কিম্বা অন্য কোনও প্রিয়জনকে। তাঁরা তাঁদের অবস্থান থেকে সেই প্রিয়জনের বীরত্ব তাঁর আদর্শকে ব্যক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সেই অস্থির সময়ে জাতিকে উজ্জীবীত ও রক্ষা করার জন্য মেয়েরাও নানান দিকে অভূতপূর্ব ভুমিকা পালন করেছে। কেউ যোদ্ধা হয়ে কেউ সেবিকা হয়ে কেউ সংবাদ সংগ্রহ করে কেউ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। বাঙালি মা হয়ে উঠেছেন যোদ্ধা মা, শহীদ জননী। পর্দা-অবরোধে আটকে থাকা বাঙালি মেয়ে হয়ে উঠেছেন 'বীরাঙ্গনা'। জাহানারা ইমাম, রাবেয়া খাতুন(১৯৩৫-১৯২১), মালেকা বেগম, নীলিমা ইব্রাহীম(১৯২১-২০০২), পান্না কায়সার(১৯৪৭), সেলিনা হোসেন(১৯৪৭), বেগম মাসুমা চৌধুরী, সুলতানা রহমান, রোকেয়া বানু, শেখ সালমা নার্গিস, সারা আরা মাহমুদ, জেসমিন সাদিক, যেবা মাহমুদ, মারুফা হাসিন, শামসুন্নাহার আজিম, মিলি রহমান, শাহজাদী বেগম, ডাঃ জাহানারা রাব্বী,

ঝর্ণা জাহাঙ্গীর, কাজী তামান্না, আরশেদা বেগম রীনা, সেলিনা খাতুন, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা আখতার জাহান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাসিনী(১৯৪৭) প্রমুখের রচনায় বাঙালি মুসলিম নারীর বহু বিস্তৃত দিকটি ধরা পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়— নারীর এই বহু বিস্তৃত কর্মকাণ্ড তাকে এক অন্য আকাশ দিয়েছে। সে জগৎকে দেখতে পেরেছে অন্য ভাবে। বহু ঘটনা প্রবাহে বিধ্বস্ত একটা জাতির সামনে লাইট হাউসের মত দিক নির্দেশকারী ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। মেয়েরা আজ শিক্ষায়- দীক্ষায় ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতায় অনেক এগিয়ে। কিন্তু যে আলোর সন্ধান রোকেয়া এবং তাঁর পূর্ববর্তী নারীরা শুরু করেছিলেন এবং যে অনুসন্ধান রোকেয়ার পরবর্তী নারীরাও জারি রেখেছিলেন সে পথ এখনও অনেকটাই অপ্রাপ্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মানুষ হিসাবে নারীর মর্যাদা আজও অধরা। গত শতাব্দীর সেই মহীয়সী নারীদের সংগ্রামী চেতনা আরও বেশি প্রয়োজন আমাদের আজকের সময়ে। সেই চেতনাকে পাথেয় করে আজকের পথচলা সার্থক হবে।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার বিষয় "অবিভক্ত বঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৭১)"। ফলে এই সময়ের মধ্যে লিখিত গদ্য রচনা এবং ওই সময়ে অবস্থানকারী বাঙালি মুসলিম নারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে স্মৃতিকথা গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মূলত তা 'প্রাথমিক উপাদান'(প্রাইমারি সোর্স)। অনেক সময় এই প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করতে সেকেন্ডারি সোর্সের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবে ১৯০৫ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত প্রাথমিক উপাদানের সমস্ত উপাদানও ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। মূলত চিঠি, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, নক্সা জাতীয় গদ্য রচনা গবেষণার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার ব্যাপ্তির কারণে উপন্যাস গল্পকে এখানে ব্যবহার করা যায়নি। একমাত্র রোকেয়ার *পদ্মরাগ*(১৯২৪) উপন্যাসটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, রোকেয়ার জীবন-সংগ্রাম ও সমাজ চিন্তার সমস্ত দিককে

একীভূত করে এই উপন্যাস। এবং তার সাথে রোকেয়ার স্বদেশ চিন্তার বিষয়টি বুঝবার জন্য দু-একটি গল্পকে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও স্মৃতিকথার ক্ষেত্রেও সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, স্মৃতিচারণা। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের স্মৃতিতে ভরা আছে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য। একটি অধ্যায়ে তার খুবই নগণ্য অংশকে গ্রহণ করা গেছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে গবেষণার অভিমুখ দুই বাংলার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নারীর রচনা কেন্দ্রিক হয়ে গেছে। দেশভাগের আগে যাঁদের ঠিকানা— কর্মক্ষেত্র, বাসস্থান, কলকাতাতে কিম্বা পশ্চিমবঙ্গে ছিল তাঁদের ঠিকানা হয়ে যায় পূর্ববঙ্গ। ফলে তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ববঙ্গের নিরিখে। তাই বর্তমান গবেষণা ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ববঙ্গ অভিমুখী হয়েছে। তবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরও যে মুসলিম বাঙালি নারীরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এবং এখানকার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে, নারী কেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেছেন লেখালিখি করেছেন তাঁদের রচনা নিয়ে বৃহত্তর গবেষণার সম্ভাবনা খোলা থাকল। এছাড়াও অনেক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনাকে গবেষকের ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করা যায়নি। তাঁদের মধ্যে লায়লা সামাদ(১৯২৮-১৯৮৯), মেহেরুন্নেসা(১৯৪২-১৯৭১), সেলিনা পারভিন(১৯৩১-১৯৭১) অন্যতম। এঁরা নিজেরা ছিলেন লেখক। ছিলেন পূর্ববঙ্গের তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী। ভবিষ্যতে এঁদের লেখা সংগ্রহ ও গবেষণার ইচ্ছা রইল। বাঙালি মুসলমান নারীর সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জগতে সামগ্রিক অংশগ্রহণ সম্বন্ধে এক বৃহৎ গবেষণা ক্ষেত্র অধরা আছে। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আশা রইল।

প্রথম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান :

বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান : বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত

সমাজ বিকাশের ইতিহাসকে ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি, সমাজ অভ্যন্তরে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়, স্থির নয়, স্থানু নয়। বস্তুজগতের পরিবর্তনশীলতার নিয়মে সমাজও পরিবর্তনশীল। এই মাপকাঠিতে দেখলে আমরা দেখতে পাব সমাজে নারীর অবস্থানও চিরকাল একই রকম ছিলনা। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আজকের গণতান্ত্রিক যুগেও 'নারীমুক্তি'র যে স্লোগান বিশ্বময় উচ্চারিত হচ্ছে তা আজকের সমাজে নারীর অবস্থাকে চিহ্নিত করে। সেই অবস্থা হল— নারী আজও বন্দিনী। অর্থাৎ একজন মানুষ হিসাবে সমাজে যে অধিকারগুলি তার প্রাপ্য শুধু নারী হওয়ার কারণে সে তার মানুষ পরিচয়ের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত। যদিও এ বঞ্চনার ইতিহাসও অনেক বড়। সে সুদীর্ঘ ইতিহাসের অলিতে গলিতে নারীর উপর সামাজিক বঞ্চনার স্বরূপও বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু বঞ্চনার সেই নিদারুণ ইতিহাসের আগে সমাজে নারী, পুরুষের মতই মুক্ত ছিল।

সমাজ বিকাশের ইতিহাস অনুযায়ী সমাজে কৃষি ও পশুপালনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টির পরেই সমাজে নারীও বন্দী হয়েছে। বিশ্বময় নারীর এই অবস্থার অঙ্গ হিসেবেই ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে নারীর অবস্থান।

বৈদিক সমাজে নারীর অবস্থা

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইতিহাসের যে বিস্তৃত ক্ষেত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী রচিত হয়েছে তার ভিত্তি প্রাক বৈদিক যুগে। আর্যদের আসার আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী মানুষের বাস ছিল এই ভূখণ্ড। পরে এদের সাথে যুক্ত হয় আল্পীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এরা বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা নয়। সেই অবস্থায় নর্ডিক আর্য-

জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। নর্ডিক আর্যরা মূলত যাযাবর জাতি ছিল। ফলে তাদের সমাজে নারী ছিল পুরুষের মতই মুক্ত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। যেখানে নারীর মুক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়—

> প্রাচীন বৈদিকযুগে নারীর কিছুটা সাম্য ভোগ করার সাক্ষ্য মেলে। দেবগণ ও পিতৃগণকে দৈনন্দিন জল দেওয়ার প্রসঙ্গে এমন তিন নারীর নাম পাই যাঁদের উদ্দেশ্যেও জল দেওয়া হত। তাঁরা হলেন গার্গী, ... , বাচক্নবী, বড়বা, আত্রেয়ী, সুলভা, মৈত্রেয়ী।[১]

এমনকি নারীর গৃহকর্মের বিস্তৃত তথ্যও বেদ থেকে আমরা পাইনা।

ক্রমে যাযাবর আর্যরা কৃষিকাজ শুরু করে। ফসল ও জমি পাহারার জন্য জমির কাছাকাছি স্থায়ী বসবাস শুরু করে। কৃষিকাজের মধ্যদিয়ে সমাজে জমিয়ে রাখার মত সম্পত্তি ফসলের আগমন ঘটে যদিও তা সে সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। তাই ফসলের উপর অধিকার স্থাপনের ভিত্তিতেই সমাজ প্রথম শ্রেণীবিভক্ত হয়। একদল ফসলের ভোগ দখল করে গায়ের জোরে। বাকিরা বঞ্চিত হয়।

> সমাজে অসম ধন বিভাজনের ফলে শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল, ধনী ও নির্ধন দুটি শ্রেণীতে। নির্ধন সমাজে স্থান পেল কায়িক শ্রমের অধিকারে, তার শরীরই তার মূলধন। এই নিরিখে নারী ও শুদ্র এই পর্যায়ভুক্ত হল।[২]

সমাজে চাষবাষ প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে আর একটি বিষয় ঘটে, কৃষির প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট ও সময়োপযোগী শ্রমের চাহিদা বেড়ে যায়। এই প্রশ্নে বাস্তব অসুবিধার কারণে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে। গোষ্ঠীগুলিতে পুরুষের কদর বাড়ে ও পুরুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাস্তবে যে সময় নিয়ে আমাদের এই আলোচনা, সে প্রাচীন সমাজে ‘পরিবার পরিকল্পনা’র মত কোনও আধুনিক তত্ত্ব সমাজে ছিল না। মানুষ পরিচালিত হত মূলত প্রবৃত্তির দ্বারা। ফলে যৌনতা ছিল অবাধ। এই অবস্থায় বছরের বেশিরভাগ সময়ই নারীরা মূলত সন্তান ধারণের পরিস্থিতিতেই অবস্থান করত। ফলে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমদানে তারা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ল। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলির শক্তি তাদের সদস্য সংখ্যার দ্বারা বিবেচিত হত বলে মানব সদস্যের কদর গেল বেড়ে। এই অবস্থায়

নারীই যেহেতু সন্তানধারণে সক্ষম তাই সন্তানধারণকে কেন্দ্র করে নারীকে ভারী শ্রমদান থেকে বিরত রাখা হল। গোষ্ঠীতে সুস্পষ্ট শ্রম বিভাজন সৃষ্টি হল। পাশাপাশি ফসল ও জমির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে নারীর উপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। উত্তরাধিকারকে সুনিশ্চিত করতে নারীকে গৃহবন্দী করা হল।[৩] নারীর জন্য একজন পতিকে জীবনে গ্রহণের নীতি চালু হল বিবাহের নামে। বৈদিক সাহিত্যের শুরুর রচনা ঋগ্বেদে কিছু অবিবাহিত নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- অমাজু, কূলপা, জরৎকুমারী, বৃদ্ধকুমারী প্রমুখ।[৪] কিন্তু পরবর্তী বেদ থকে মহাকাব্যিক যুগ পর্যন্ত নারীর পক্ষে বিবাহের মাধ্যমে একজন পতিকে জীবনে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। যদিও পুরুষের বহু ভার্যা গ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে একটি প্রার্থনা আছে, বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্বামী স্ত্রীকে উদ্দ্যেশ্য করে বলবে—

> এস, আমরা মিলিত হই যেন পুত্রসন্তানের জন্ম দিই, যে সন্তানেরা সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটাবে; যেন লাভ করি পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, বহুভার্যা, রাজ্য, খাদ্য এবং নিরাপত্তা।[৫]

এই প্রার্থনাটি সদ্যবিবাহিত বধূর সাথে করতে হত। বর নববধূর সাথে বহুভার্যা প্রার্থনা করত। এইভাবেই ঋগ্বেদের শুরুর যুগে নারীর শিক্ষার অধিকার যতটুকু ছিল তাকে খর্ব করে বিবাহ, সন্তান প্রতিপালনে তাকে আবদ্ধ করা হল। 'মনু সংহিতা'য় যেমন বলা হয়েছে—

> নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যয়ন এবং পতিগৃহে বাসই গুরুগৃহে বাস।[৬]

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বৈদিক যুগে উত্তম নারীর সংজ্ঞা নির্ধারিত হল—

> যে স্বামীকে প্রসন্ন করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় ও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে না।[৭] (অথর্ববেদ ১১/৫/১৮, উদ্ধৃত।প্রাগুক্ত, পৃ-৯)

বলা হল— 'নারীর প্রকৃষ্ঠ কর্তব্য হল পুত্রোৎপাদন করা'।[৮] এখানে লক্ষ্যণীয় সন্তান উৎপাদন নয়। পুত্রসন্তানই কিন্তু ক্রমে সামাজিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃত হতে থাকল—

> সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে মাটিতে রাখা হয়, পুত্রসন্তানকে উপরে তুলে ধরা হয়।[৯]

নারীর যাবতীয় স্বাধীনতা ক্রমে খর্ব হল। প্রাগার্যযুগে যে নারী প্রায় পুরুষের মতই মুক্ত ছিল, ক্রমে তাকে বন্দী করা হল। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করা হল। বলা হল—

> নারীকে শৈশবে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করে, বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে, স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই।[১০]

এইভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নারী ক্রমে অপসৃত হল। ক্রমে হয়ে উঠল পুরুষের মুখাপেক্ষী। বিনিময়ে নারী তার যাবতীয় মর্যাদা ও সম্ভ্রম হারিয়ে পরিবারে দাসীবৃত্তি ও পুত্রসন্তান প্রসবের যন্ত্রে পরিণত হল—

> মনে রাখতে হবে 'ভার্যা' ও 'ভৃত্য' শব্দ দুটি একই 'ভৃ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন(অর্থাৎ ভরণ করা) এবং মূলগতভাবে তাদের বিষয়ে একই ধারণা। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে স্বামীর উপর নির্ভরশীল নারীর অর্থনৈতিক মূল্য এখনও কোনো আর্থিক দিক থেকে নির্ধারণ করা যায় না, কারণ অর্থনৈতিক দিকে তার গৃহকর্ম কোনো উপার্জন আনে না, তার ভূমিকা এখন শুধু প্রজননমূলক এবং সহায়কের। এর ফলে তাঁদের অবনমন তাঁদের নিজের কাছে এবং সাধারণভাবে সমাজের কাছে যুক্তিসিদ্ধ হয়েছে। উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে নারীকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে তাঁকে সহজেই বোঝানো যেত যে তাঁর স্বামীই তাঁকে ভরণপোষণ যোগায়। ..... নারীর বিবাহের কর্তব্যের অংশবিশেষ হচ্ছে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া, এবং সে যদি এই কর্তব্য পালন না করতে পারে তবে সমাজের অনুমোদন নিয়েই তাকে ত্যাগ করা যায়—শাস্ত্রের অনুশাসন মতে।[১১]

বাংলায় নারীর অবস্থা

গবেষণায় নারীমুক্তি ও প্রগতি আন্দোলনের ক্ষেত্রটি যেহেতু বাংলার ভৌগোলিক সীমায় সীমায়িত, তাই বাংলায় নারীর অবস্থা প্রাচীন কাল থেকে ঠিক কিরকম ছিল সে দিকটি দেখতে চেষ্টা করা যাক। ইতিমধ্যে নর্ডিক আর্যদের যে শাখাটি সিন্ধু তীরে বসবাস শুরু করেছিল, যারা বৈদিক সভ্যতার সূচনা করে তারা ক্রমে প্রাচীন ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বে এগিয়ে আসছিল খনিজ সম্পদের সন্ধানে।[১২]

যদিও বঙ্গে আর্যদের আগমনের সাথে সাথে বৈদিক সভ্যতার প্রভাব বিস্তার সহজ হয়নি। আর্যেতর জাতিগুলি মূলত ছিল অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।[১৩]

প্রাগার্য জাতিগুলির মধ্যে নারী প্রাধান্য ছিল। ফলে আর্য আগমনের আগে প্রাচীন বঙ্গে নারী বন্দী ছিলনা একথা সহজেই উপলব্ধ হয়। এরপর আর্যদের আগমন ঘটে। যদিও প্রাচীন ভারতে যে আর্যরা তাদের প্রথম বসতি শুরু করে তারা ছিল যাযাবর। এরপর আর্যরা কয়েক হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডের প্রাগার্য গোষ্ঠীগুলির সাথে সংঘর্ষের পর প্রাচীন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সংঘর্ষ চলতে চলতেই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। ভাষার বিবর্তন দেখলে এই দিকটি চোখে পড়ে।[১৪] ক্রমে যাযাবর আর্যরা কৃষিজীবি হয়েছে, গড়ে তুলেছে বৈদিক সমাজ। নারীকে করেছে অন্তঃপুরবাসিনী। এই অবস্থায় আর্যরা গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ বেয়ে পূর্বভারতে এসে উপস্থিত হয়েছে।[১৫]

আর্যরা যখন পূর্বভারতে এসে পৌঁছায় সেই প্রায় হাজার বছরের বিবর্তনে আর্য বৈদিক সংস্কৃতি এক অর্থে প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। চতুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগুলির মধ্যদিয়ে সে সমাজ-জীবন সম্পর্কে তার মতন করে একটা পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ফেলেছে। ন্যায়, নীতি, সত্য-মিথ্যা, বিধি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে শাস্ত্রসম্মত রূপ দিয়েছে। এই অবস্থায় বাংলায় এসে তাদের শক্ত প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদিও তা নিছকই গবেষকদের অনুমান। কারণ বাংলার আদি ইতিহাস পাওয়া যায় না।[১৬]

বাংলার আদি জনপদ কখনই একক রাষ্ট্রীয় শাসনাধীন ছিল না। রাঢ়, পুণ্ড্র, গৌঢ়, বঙ্গ, সমতট, হরিখেল প্রভৃতি সুবিস্তৃত বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা বাংলা তাই কখনই সমজাতিসত্তায় আত্মপ্রকাশ করেনি। বহুত্ববাদেই তার পরিচয়।[১৭]

প্রাগার্য যুগ থেকেই এটাই এই ভূখণ্ডের বসবাসকারী জনগণের স্বরূপ। তার আস্থা জীবাত্মায়। জীবন তত্ত্বই তার সমস্ত সাধনার মূলে। তাই সে অনেক বস্তুনিষ্ঠ।

> সর্বপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে এবং জাদুতে তার আস্থাও অবচেতন ও নিঃসঙ্গমনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল।[১৮]

এই বাংলায় তাই আর্যদের হয়ত প্রবল বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে ভাবগত ক্ষেত্রে। তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক আধ্যাত্মবাদ বাঙলার জীবনতত্ত্ব ও জড়বাদের সামনে পর্যুদস্ত হয়েছে। তাই হয়তো মহাভারতে সমস্ত অনার্য রাজাকে দানব হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

এই পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সুসংহত সংগ্রাম পরিচালনা হচ্ছিল— নানা লোকায়ত ধর্ম যেমন চার্বাক সহ বৌদ্ধ ও জৈন মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে। এই সংগ্রামও বহু বছর ধরে চলেছিল নিশ্চয়ই। জৈন ধর্মে আমরা যেমন মহাবীরকে পাই, তার আগেও তেইশ জন তীর্থঙ্করের উপস্থিতি ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে, তার বর্ণপ্রথা, যাগযজ্ঞ, পশুবলীর বিরুদ্ধে অনার্য মননে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছিলই। সেই ক্ষোভের সুসংহত রূপ পেল গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জৈনের হাত ধরে। সে কালের বাংলায় তাই এই দুই ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে। ইতিমধ্যে বৌদ্ধ মতবাদ মৌর্য ও পাল যুগে সরাসরি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতালাভ করায় তা রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে বাংলার বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারলাভ করেছিল। বৈদিক সমাজের ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে দলে দলে সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। সংগঠিত বৈদিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই মানুষ দেখেছিল প্রতিবাদের সংগঠিত রূপ। বৈদিক সমাজে নারী মর্যাদাহীন অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল বলে রমণীকূলেও বৈদিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল। সেক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মে নারীর মর্যাদার প্রশ্নে অভিনব কিছু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল বলে দলে দলে নারীরা বৌদ্ধমতাবলম্বী হচ্ছিল—

> বৌদ্ধ ধর্ম নারীকে মুক্তি দিল। পারলৌকিক কাজের বিষয় এই ধর্মে না থাকায় ছেলের প্রয়োজন জরুরী রইল না। ছেলে না থাকলে বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃত হল বৌদ্ধ ধর্মে।[২০]

কিন্তু বৌদ্ধধর্মও নারীকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। দলে দলে নারী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেও সদ্য বন্ধনহীন নারীকেই সমাজে নৈতিক অধঃপতনের কারণ ভেবে তাকে অনুশাসনের প্রয়োজন বৌদ্ধদের মধ্যে স্বীকৃত হল —

> বৌদ্ধধর্মে নারীদের মঠ জীবনের অধিকার দিলেও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। ভিক্ষুকদের দেখলেই ভিক্ষুণীকে অভিবাদন জানাতে হত। তাছাড়া গৃহহীণ হতে শিখিয়ে বৌদ্ধধর্ম নারীর শৃঙ্খলা বিধানের নামেও কিছু বিধি নিষেধ দিতে থাকল। বৌদ্ধধর্মে এই বিশ্বাস জায়গা করে নিল যে, যে ধর্ম নারীকে গৃহহীন হতে শেখায় তার সামজিক মূল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না।[২১]

এমনকি বৌদ্ধ গ্রন্থে ও জাতকের কিছু ঘটনায় নারী সম্পর্কে কটূক্তি শোনা যায়। এর কারণ হিসাবে শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন বলছেন —

> সম্ভবত সন্ন্যাসের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ গার্হস্থ্যের প্রধান আকর্ষণ- স্ত্রীজাতির উপর ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য এই সকল ঘৃণ্য অপবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুই একখানি বৌদ্ধ জাতকে যে সকল নক্কারজনক উপকথা পাওয়া যায়- তাহা নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছিল।[২২]

যদিও পাল রাজাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেন রাজারা বাংলার শাসন ক্ষমতায় এলে বাংলার রাষ্ট্রীয় ধর্মের পট পরিবর্তন ঘটে। কর্ণাটকের কনৌজ ব্রাহ্মণ সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। ফলে সেন রাজাদের হাত ধরে নতুন করে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল। ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই পর্বে বৌদ্ধদের উপর নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছিল। বৌদ্ধমঠগুলির ধ্বংস সাধন, বৌদ্ধ পুঁথি ও গ্রন্থগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এই ধ্বংসস্তুপে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মণ্যবাদ। ফলে সমাজে জাতি বর্ণ ভেদাভেদ, ছোঁয়াছুয়ি বাছবিচার, ইত্যাদি আবার প্রবল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে অবিচল রাখতে ও তার মৌলিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সেন রাজারা কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রথার প্রচলন করলেন। নারী জীবনে যার ক্ষতিকর প্রভাব হল সুদূর প্রসারী —

> বৌদ্ধ পাল বংশের পতন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন বংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে আদিশূরের কৌলিণ্যপ্রথা ও বল্লাল সেনী স্মার্ত্ত অনুশাসনের মাধ্যমে পুনরুদ্যমে বাঙ্গলার আর্যীকরণ শুরু হয়।[২৩]

কৌলিন্যপ্রথা অনুযায়ী বর্ণপ্রথায় ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ। তাই তার শ্রেষ্ঠত্ব বা কৌলিন্যকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েকে অন্য ঘরে বিয়ে দেওয়া যেত না। ফলে কূল রক্ষার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ পিতা হন্যে হয়ে ব্রাহ্মণ বরের সন্ধান করতেন। অন্যদিকে কূল রক্ষার অজুহাতে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শাতাধিক বিয়ে করতেন। আর এই ব্যবস্থাকে রক্ষার প্রয়োজনে অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথেও শিশুকন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল শাস্ত্র আর কৌলিন্যের দোহাই দিয়ে। বহু বিবাহিত একজন কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী বছরের পর বছর স্বামীর মুখ দর্শনের সুযোগও পেত না। এই অবস্থায় কুলীন ঘরের সধবা নারী বহু ক্ষেত্রেই স্বামীর ঘরে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হত —

> কুলীন মেয়েদের সমস্যা সমাজে প্রকট ছিল। কুলীন পুরুষ বহু সংখ্যক বিয়ে করতেন। কুলীন মেয়েরা শিশু বয়সে বা যে কোনও বয়সেই হোক না কেন বিয়ের পর কুলীন স্বামীর ঘর করতে পারত না। স্বামীকে চোখে দেখাই সম্ভব হত না। কিন্তু মেয়ের বাবা মা মারা গেলে মামা বাড়িতে দাসত্ব করে, ঝি গিরি করে জীবন কাটাতে হত। এই যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের হাত থেকে বাঁচতে অধঃপতিত সমাজের প্রলোভনের হাতছানিতে বহু কুলীন মেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত।[২৪]

যদিও বাংলার সমাজজীবনে ব্রাহ্মণ্যবাদের এই প্রভাবের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনে বাংলার তন্ত্র, যোগের প্রভাব বরাবরের মতই ব্যাপক ছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আলপীয় আর্যদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংকর বাঙালি জাতি চিরকাল তার প্রাণধর্মেই সাড়া দিয়েছে। অধ্যাত্মধর্মে নয়। ফলে বাঙালি তার চরিত্রের এই বিশেষ ধর্ম নিয়েই একসময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে গ্রহণ করেছে- একথা সত্য। তবে তার বিশুষ্ক নির্বান তত্ত্বকে সে নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে বাঙলার তন্ত্রসাধনার সাথে মিলিয়ে। একইভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মদত থাকলেও সমাজজীবনে তার আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বাংলার লোকজীবন সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেনি। সে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নিজের মত করে মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি প্রভৃতি লৌকিক দেবতা তৈরি করে নিয়েছে।[২৫]

ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার এই পর্বেও বৃহৎ সমাজে প্রাগার্য অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সাংস্কৃতিক প্রভাবই বজায় ছিল। ফলে ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন যা নারীর উপর আরোপিত হয়েছিল সম্ভবত তা মূলত হিন্দু উচ্চবিত্তের মধ্যেই ছিল। সাধারণভাবে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই অনুশাসনের প্রভাব তেমন ছিল না।

> তন্ত্র প্রভাবিত বাঙালি সমাজে উচু নিচু বলে ভেদ ছিল না এবং নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল।[২৬]

যা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত হিন্দু সমাজে ছিল না। এই অবস্থায় তুর্কী আক্রমন ঘটলে আবার বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয়ে যায়। তুর্কি আক্রমনের মধ্য দিয়ে মুসলমান শাসকেরা এল বিজেতার বেশে। এই সময় এল সুফী দরবেশরা। সুফীদের হাত ধরে সেই সময় বাংলার মানুষ ব্যপক সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় মদতে বাংলায় ইসলামের প্রসার হয়েছে কম। যতটা হয়েছে তা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারের কারণে।[২৭]

এই অবস্থায় বাঙলার নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদের ও বর্ণপ্রথার নির্মমতা থেকে মুক্তি পেলেও ইসলামে নারীর অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হল না।

> ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত নারীর অধিকার পূর্ব প্রচলিত ধর্ম থেকে উন্নত হলেও নারীরা বঞ্চিত থাকল। যেটুকু অধিকার নারীকে ইসলাম দিয়েছে সেটুকু অধিকারও কিন্তু বাঙলার মুসলিম শাসকরা বাঙলার নারীদের জন্য দিল না। ... ... মুসলিম শাসকরা নতুন নতুন ঘোষণা দিয়ে নারী সমাজের পায়ে বেড়ি বাঁধতে থাকে। ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১ খ্রী) ও সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭) নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করল। বোরখা ও ঢাকা গাড়ি ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা নিষিদ্ধ হল। বাড়ীতে জেনানা মহল তৈরী হল।[২৮]

শুধু তাই নয়, ইসিলাম নির্দেশিত সাম্যের প্রগতিশীল বাণীর থেকেও মুসলিম মহিলারা বঞ্চিত হলেন। পর্দাপ্রথা, একাধিক উপপত্নী প্রথা, ক্রীতদাসী প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদে

পুরুষের একপাক্ষিক অধিকারকেও ইসলামে স্বীকৃতি দেওয়া হল। যার মধ্যদিয়ে নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদাকেও ইসলামে খর্ব করা হয়েছে।[২৯]

মুসলিম শাসনামলেই বাংলায় শ্রী চৈতন্যের নেতৃত্বে ভাব ও ভক্তিবাদী আন্দোলনের শক্তশালী ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণাশ্রম প্রথার জুলুম ও অত্যাচার থেকে বাঁচতে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার যে হিড়িক পড়েছিল, চৈতন্যের প্রেমধর্ম চলে আসায় নিম্নবর্নের হিন্দুরা এবার দলে দলে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। বৈষ্ণব রস মাহাত্ম্যে নারীর রাধারূপ প্রবলভাবে সমর্থিত হতে থাকে। এমনকি নগর সংকীর্তনেও নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়। যদিও বাস্তবে নারীর স্বাধীনতা বা মর্যাদা দেওয়ার মত কোনও বিশেষ দিক বৈষ্ণব ধর্ম দেখাতে পারেনি।

> সমকালীন বৈষ্ণব সমাজে নারী ভাবনায় স্ববিরোধ লক্ষণ অবশ্য কম নয়। তত্ত্বগত অর্থে নায়িকা ভাব গ্রহণ করলেও বাস্তব জীবনে পতিব্রতা স্ত্রী ও সর্বত্যাগিনী মাতাই নারীর আদর্শ। চৈতন্য স্বয়ং একাধিকবার সতীত্ব সম্পর্কে বলেছেন—‘ স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা—ধর্ম’, ‘প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যে জন/ বেশ্যার ভিতরে তারে করিবে গণন।’ [৩০]

এরপর চৈতন্যের মৃত্যুর পর ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব ধর্ম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল ‘গোস্বামী মত’ ও ‘সহজিয়া মত’এ। গোস্বামী মত ক্রমশ সনাতন ধর্মের আচার সর্বস্বতাকে আত্মস্থ করে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিল। অন্যদিকে ‘সহজিয়া মত’ নারী পুরুষের যৌথ সাধনার কথা বলে বাস্তবে অবাধ যৌনতায় পৌঁছে যায়। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে সহজিয়া মতের ব্যপক প্রভাব ছিল। অষ্টাদশ শতকে এই সহজিয়া মতের প্রভাব আমরা দেখি বাউল, কর্তাভজা, সখীভাব, লালনশাহী প্রভৃতি মতে। নারী পুরুষের এই যৌথ জীবনের ফলে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত ছিল তা বলা যায়। যা উচ্চবিত্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে সম্ভব হয় নি—

> এটি লক্ষণীয় বিষয় যে নগর সমাজে ও ধর্মে নারীর স্থান যতই অবদমিত ও সংকুচিত হচ্ছিল গ্রামীন সমাজে নিম্নবর্গের দৈনন্দিন লোক-ধর্মচর্চায় ততই নারীর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি মুসলিম সমাজেও দেখি যখন উলেমা ও মোল্লা মৌলভিরা উচ্চবর্গীয় মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, জুম্মা প্রার্থনা ও ধর্মীয়

> উৎসবে গণ-প্রার্থনায় প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন, তখন গ্রামীন জীবনে দরগা পূজা ও পীরপরস্তি প্রধানত মেয়েদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম একতাপন্থী সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির মাধ্যমে নিম্নবর্গের জীবনচর্চায় নারী অন্য এক মানবিক মাত্রা পায়।[৩১]

যদিও নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে চর্চিত এই লৌকিক সংস্কৃতি কখনই সমাজের মূলধারার সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। তা ছিল নিছক গ্রামীণ লোকজীবনের চর্চা ও চর্যার বিষয়। বাংলার লোকগানে এই সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। যা মূলধারার সংস্কৃতির কাছে ব্রাত্য থেকেছে চিরকাল।[৩২]

আরেকদিকে শাসকের সংস্কৃতি হিসেবে নাগরিক সমাজের সংস্কৃতি সমাজের মূলধারার সংস্কৃতি হয়ে আলোচিত হয়েছে চিরকাল। তাই এই নাগরিক সংস্কৃতি কখনও বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত, কখনও মোল্লাতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু মূলে তা শাসকের সংস্কৃতি। সেখানে সম্প্রীতি অপেক্ষা বিচ্ছিন্নতার সুরই বেশি। সেখানে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ প্রবল। স্পষ্ট নারী পুরুষের অসাম্য। এই অবস্থায় মধ্যযুগের শেষ দিকে বাংলায় হিন্দু- মুসলমান উভয় সমাজেই নারীর বিপন্ন অবস্থা চোখে পড়ে।

প্রাক রেনেসা পর্বেও বাংলার সমাজজীবনে যে প্রথাসমূহের প্রচলন লক্ষিত হয়, তাতে নারীর বিপন্ন অবস্থার ছবি সুস্পষ্ট। যেমন হিন্দু সমাজে কৌলিন্যপ্রথাকে ভিত্তি করে সমাজে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল, যার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে। তবে মুসলমান সমাজেও এই প্রথাগুলির প্রচলন সেসময় ব্যপকভাবে ছিল। বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ উভয় সমাজের মেয়েদের জীবনে অভিশাপের মত ছিল। হিন্দু কূলীন ব্রাহ্মণের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমান সমাজে বিশেষ ক্ষেত্রে চারটি বিবাহ শাস্ত্র সম্মত ছিল। কিন্তু বাস্তবে চার জনের বেশি পত্নী গ্রহণ করতে দেখা যেত। বাল্য বিবাহ সম্পর্কে আনোয়ার হোসেন লিখছেন–

> হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও বাল্য বিবাহের প্রাবল্য ছিল। বিত্তশালী বয়স্ক লোকেদের বালিকা বধূর পাণিগ্রহণ মুসলমান সমাজের একটি কুপ্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৪ সালে শেখ আজিমুদ্দিন লিখেছিলেন ‘কুড়ির মাথায়

> বুড়োর বিয়ে'। এতে তিনি দেখান যে, ধনবান ব্যক্তিরা দরিদ্র পিতার কমবয়স্ক কুমারী কন্যাকে প্রচুর অর্থ ও গহণা দিয়ে বিয়েতে প্রলোভিত করত।[৩৩]

উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজে সতীপ্রথার চল ছিল। মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে যাওয়াকে পবিত্র বলে মনে করা হত। কিছু ক্ষেত্রে নারী স্বেচ্ছায় সতী হয়ে স্বামীর চিতায় দগ্ধ হতে চাইলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ভয়ঙ্কর ধর্মীয় নিপীড়নে নারী হৃদয় সাড়া দিত না। তখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সদ্য বিধবাকে মারধর করে বলপূর্বক স্বামীর চিতায় বসিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত। সতী নারীর আর্ত চিৎকার চেপে রাখার জন্য ঢাক কাঁসর বাজানো হত।

> আমার বিশ্বাস হয়না যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর গভীর প্রেম থেকে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। ..... আসল কথাটা হলো এদেশের স্ত্রী জাতির নিষ্ঠুর দাসত্ব প্রথার এ একটা বড় নিদির্শন। স্ত্রী হল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গহনা ও টাকাকড়ির প্রাণহীন পোঁটলা পুঁটলীর মতন। মরার পর তিনি সম্পত্তিটি রেখে যেতে চান না, সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। তার জন্যই সহমরণের প্রয়োজন, এবং শাস্ত্র বচনের আধ্যাত্মিক আস্তরণ দিয়ে এই হীন উদ্দেশ্য চাপা দেওয় দরকার। এই হল পতিভক্তি প্রণোদিত সহমরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা। ..... সতিরা অবশ্য সমাজে বীরাঙ্গনা বলে কীর্তিত হন এবং পতিগতপ্রাণা বলে কিছুদিন সমাজের লোক তাদের স্মরণ করে।[৩৪]

মালেকা বেগম এই সময়ের সহমৃতাদের পরিসংখ্যান দিয়ে বলছেন-

> ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছিল। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার ৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হয়েছে।[৩৫]

অনেকক্ষেত্রে নারীরা বৈধব্যের নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সহমরণে অংশ নিত। হিন্দু পরিবারের বিধবারা চুল বড় রাখতে পারত না। অনাড়ম্বর পোশাকে অর্ধাহারে অনাহারে তাদের জীবন কাটাতে হত দাসীর মত। কোনও শুভ অনুষ্ঠানে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভারতিয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা রদ (১৮২৯) হয়। কিন্তু বিধবা বিবাহ সমাজে

প্রচলিত না হওয়ার কারণে নারীর জীবনে বৈধব্যের চরম যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। পরে মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) উদ্যোগে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হল (১৮৫৬) বটে, তবে তা মানুষের সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারল না। যদিও বিধবা বিবাহ মুসলিম ধর্মসম্মত, তবুও এদেশের মুসলমানরা বিধবা বিবাহকে লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য মনে করত।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা ছিল। পর্দা ও অবরোধের কদর্যরূপ এদেশের মেয়েদের জীবনে চরম আকার ধারণ করেছিল। ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরোধের প্রতি সমাজে যে শ্রদ্ধার মন তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজের মহিলা মহল ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই পর্দাপ্রথাকে তারা জীবন দিয়েও পালন করত। রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) *অবরোধ বাসিনী* (১৯৩২) গ্রন্থে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই উচ্চবিত্ত পরিবারে দাসী ও বাঁদী রাখার প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহল ও বহির্মহলে এই দাসী, বাঁদী ও চাকরানীরা কাজ করত। বহুক্ষেত্রে এই প্রথা ছিল বংশানুক্রমিক। কখনও বা দাসী কিনে আনা হত।[৩৬]

এইভাবেই প্রাচীনকাল থেকে নারীর অবস্থা ক্রম বিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তনের পথে সমাজও ক্রমশঃ সভ্যতার আলোকতীর্থে যাত্রা করেছে। তবে সে যাত্রায় নারীকে সে সঙ্গী করেনি। তাকে বাহন করেছে। সমাজ মননে এই ধারাটিই প্রচলিত ধারা হিসাবে চর্চিত হয়েছে। আর একটি ধারা যেখানে নারী প্রায় পুরুষের সমান মর্যাদায় অবস্থান করছে। এই ধারাটি অপ্রচলিত লৌকিক ধারা হিসাবে সমাজে রয়ে গেছে। আবার পাশাপাশি দীর্ঘকাল চলতে চলতে দুটি ধারা বহুক্ষেত্রেই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে। তবে তা সত্ত্বেও দুটি ভিন্ন মৌলিক ধারা হিসাবে সমাজে রয়ে গেছে।

এই অবস্থায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের আলো আসে রামমোহন বিদ্যাসাগরের কর্ম প্রচেষ্টায়। দীর্ঘ দিনের ধর্মতন্ত্রের নাগপাশ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে প্রথমেই শুরু হয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রদ করার জন্য শুরু হয় আন্দোলন। নবজাগরণের ধর্মনিরপেক্ষ-বৈজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সমাজ সংস্কারকরা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নতুন নতুন কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নবজাগরণের আধুনিক ও উন্নত চিন্তার প্রসার ঘটে।

যদিও এই সংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু সমাজ ভিত্তিক। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এর প্রভাব ছিল না। ইংরেজ জাতির কাছে পরাস্ত হওয়ার বেদনা মুসলিম সমাজের অনেকাংশ জুড়েই ছিল। তার সাথে মুসলমান সমাজের চাকরি বাকরি সহ নানা বিষয়ে কাটছাঁট করেছিল ইংরেজ শাসক। ফৌজদারী মামলায় প্রচলিত ধর্মীয় আইনের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসকের আইন প্রবর্তিত হয়। কর্ণওয়ালিসের আইনি সংস্কারে মুসলিমদের ক্ষমতা অনেক সঙ্কুচিত হয়ে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উকিল কমে ২৫% এ নেমে আসে। সামরিক ক্ষেত্রেও কোম্পানির সেনাবাহিনীতে মুসলিমের চেয়ে হিন্দু কর্মচারীর নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়।[৩৭] এর ফলে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ বিদ্বেষ তৈরি হয়। তাই ইংরেজদের হাত ধরে আসা আধুনিক শিক্ষা সহ সমস্ত কিছু থেকে সচেতনভাবেই দূরে থেকে বিশ্ব ইসলাম ভাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে চান তাঁরা। এই ‘প্যান ইসলামীজম’ এর প্রভাব নবজাগরণের সমস্ত স্রোত থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে —

> ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে রাখে এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। এই শতকের প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজে এক সংস্কারমূলক বা পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়। ফরায়েজী তরীকাহ-ই-মহম্মদিয়া (ওহাবী), তাউনী, আহ্‌লে হাদিস নামে পরিচিত এইসব

> আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষারও বিরোধিতা করেন।[৩৮]

সিপাহী বিদ্রোহে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ব্যবস্থা শেষবারের মত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এই বিদ্রোহে মুসলমান সামন্ত রাজা ও মুসলমান জনগণের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত ছিল। ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমান জনগণের এই রাগে ইংরেজ প্রমাদ গুণেছিল।[৩৯]

এইভাবে ১৮৫৭ সাল সময় পর্যন্ত ইংরেজ রাজশক্তি ও মুসলমান জনগণের বড় অংশ পরস্পর যুযুধান পক্ষ হিসাবেই অবস্থান করছিল। অন্যদিকে হিন্দু, ব্রাহ্ম জনসাধারণ ইংরেজের সাহায্য নিয়ে স্কুল কলেজ স্থাপনা, সরকারি চাকরিতে প্রভূত উন্নতি করে নিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের কয়েকজন (যাঁরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন) মুসলমানদের এই অবস্থায় আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা চেষ্টা করেন কিভাবে ইংরেজ সরকার, মুসলমান জনগণের প্রতি সদয় হয়। বিপরীতে মুসলমান সমাজও ইংরেজের প্রতি এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। আবদুল লতিফ(১৮২৮-১৮৯৩) ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। প্রবন্ধ রচনার বিষয় দেখলে বোঝা যায় মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর প্রচেষ্টার কথা।

ফারসী ভাষায় লিখিত ওই প্রবন্ধের বিষয় ছিল – 'ভারতের মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরাজি শিক্ষার উপকারিতা ও তার গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা'। আবদুল লতিফ সারা জীবনের শ্রম নিয়োগ করেছেন মুসলমান জনগণের উন্নতিকল্পে। এই কারণে ব্রিটিশ রাজশক্তির উপর আনুগত্যে এতটুকুমাত্র প্রশ্নচিহ্ন আসতে দেন নি। তাই কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন নি। মুসলমান জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য প্রথম যিনি ভাবলেন তিনি সৈয়দ আমীর আলী(১৮৪৯-১৯২৮)। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন- সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৭৭)। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা গড়ে সচেতনতার প্রক্রিয়াকে আরও তেজী করতে চেয়েছিলেন।

আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের কর্ম প্রচেষ্টার ইতিবাচক দিক ছিল প্রভূত। কিন্তু তার সাথে বাঙালি মুসলমানের সংকটের একটি দিকও লুকিয়ে ছিল। এঁরা নিজেরা কেউ বাংলা জানতেন না। বাংলা ভাষা শেখাকে অপ্রয়োজনীয়ও মনে করতেন। লতিফ- 'উচ্চশ্রেণির জন্য উর্দু ভাষা শিক্ষার পক্ষে অভিমত দিয়েছিলেন, কেবল নিম্নবৃত্তির লোকেরা বাংলা শিখবে'।[৪০] এরকম অভিমতের পিছনে দুটি কারণ আছে। প্রথমত, মুসলমান সমাজ অনভিপ্রেতভাবে দ্বিবিভাজিত ছিল। উচ্চবর্ণকে বলা হত 'আশরাফ' আর ধর্মান্তরিত দরিদ্র মুসলমানদের বলা হত 'আতরাফ'। উচ্চবর্ণের মুসলমানদের ভয় ছিল এই বুঝি এদেশের গরিব মুসলমানদের পঙতিতে মিশে যান। তাই এদেশীয় মুসলমানদেরর সাথে এদেশের ভাষাকেও সযত্নে পরিহার করতেন। যথা সম্ভব আরবি, ফারসি, উর্দুর ব্যবহার দেখা যেত। এবং বৃহত্তর মুসলিম জনসাধারণকে ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথক রাখার চেষ্টা করা হত। সেকারণে মুসলিম জনসাধারণ ইংরেজি ও বাংলা ভাষা চর্চা থেকে দূরে ছিল। বাংলাভাষার প্রতি এই বিরাগ বিশ শতকেও দেখা গেছে।[৪১] আর বাংলা ভাষার চর্চা যতটুকু ছিল তারমধ্যে আরবি, ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে দুর্বোধ্য 'ইসলামী বাংলা'র জন্ম দিয়েছিল। আবার 'আশরাফ'রা বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা হিসাবে পরিত্যাগ করেছিল। ফলে নতুন যুগের দাবি নিয়ে, ব্যক্তি ও সমষ্টীর দাবি নিয়ে যে আধুনিক বাংলা গদ্য ভাষা জন্মলাভ করেছিল তা থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠী ছিল দূরে। সংস্কৃত হোক বা আরবি ফার্সি হোক এই ভাষাগুলো, আধুনিক ভাবে চিন্তার বাহন হয়ে উঠতেই পারেনি। যেমন আধুনিক যুগের চিন্তা প্রকাশের বাহন হয়ে উঠতে পারেনি ল্যাটিন ভাষা। নতুন যুগের চিন্তার বাহন হয়ে উঠেছিল ইংরাজী ফরাসি প্রভৃতি এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বাংলা হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভাষা। বাংলার মুসলমান সমাজ দীর্ঘ্যদিন বাঙ্গলা ভাষা থেকে দূরে থাকার কারণে বাংলা ভাষাও তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। এইভাবে ইসলাম সমাজ আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করলেও তার ভাষাগত সমস্যার দিকটি নিরসন হয়নি। অর্থাৎ মুসলমান সমাজে আধুনিক যুগের সূচনা পর্ব থেকেই তার ভাষা সঙ্কট ছিল। তাই আধুনিকতার পথে যাত্রা করার সময় তাকে বাংলা ভাষা শিখবার সংগ্রাম করতে হয়েছে। বাংলার মুসলমানকে স্বাধীনতা আন্দোলনের গোটা পর্ব জুড়ে বাঙালি হওয়ার সংগ্রাম করতে হয়েছে। এবং বাঙালি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে 'বায়ান্ন'র

ভাষা আন্দোলনে শহীদের রক্তের বিনিময়ে। এবং সর্বশেষে 'জয়বাংলা' ধ্বনি নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মোটামুটি- শতাব্দীর শেষ প্রান্তে (ঊনিশ শতক) মুসলমানরা সংস্কৃতি ঘেঁষা বাঙ্গলা লিখতে শুরু করেন। যা নতুন ধরণের শিক্ষার ফল।[৪২]

হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-মিলন

ইউরোপের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ভারতবর্ষের নবজাগরণে পার্থিব মানবতাবাদের অধ্যায়টুকু বাদ দিলে ধর্মীয় ঐতিহ্যবাদের সাথে মানবতাবাদের সুরটি মিশে ছিল। পার্থিব মানবতাবাদের যে ধারা বিদ্যাসাগর জন্ম দেন তা নিঃশেষিত হয়ে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধারার জন্ম নেয়। শুরু হয় হিন্দু মেলা (১৮৬৭-১৮৯৯), শিবাজী উৎসব(১৯০২-১৯০৭)। মুসলমান বিজয়কে খাটো করে হিন্দুর মহিমা ব্যঞ্জক ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলি লেখা হতে থাকে। এরই বিপ্রতীপে মুসলমান জনগণ তার ভাবালুতা নিয়ে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। মুসলমান বীরত্ব ব্যঞ্জক কাহিনি লেখা হতে থাকে। আবার সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। এর সাথে ছিল শাসক ইংরেজের জনসাধারণকে বিভক্ত করার সুচতুর কৌশল। নবজাগরণের সাম্য মৈত্রীর বানী এদেশে শাসক হয়ে আসার পর ইংরেজরা এড়িয়ে যায়। তাই ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা দানের পরিবর্তে ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষার ব্যাবস্থা করে। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে ১৭৮০ সালে। হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করা হয়। কান্ট মিলের বস্তুবাদী দর্শনের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের দর্শন পড়ানোর প্রস্তাব আসে।[৪২] এরই অনিবার্য ফল স্বরূপ ১৯০৫ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গ। হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে দিয়ে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে দূর্বল করে দেওয়া। যার প্রতিফলন এই সময়ের সাহিত্য কর্মে পাব।

এই পরিকল্পনায় ইংরেজের লাভ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রথম এক বিরাট বিচ্ছিন্নতার বাতাবরণে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এক অদম্য প্রচেষ্টা শুরু করল। এই প্রথম ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন দেখা দিল। এবং দীর্ঘ লড়াইয়ে

১৯১১ সালে ইংরেজ রাজশক্তিকে মাথা নীচু করিয়ে বঙ্গভঙ্গের আইন রদ করতে বাধ্য করাল। বাঙালি মুসলিম মহিলা এই প্রথম অবরোধের কঠিন বেড়াজাল ভেঙে রাজপথেও বেরুলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখনী ধরলেন। তারজন্য এক নতুন যাত্রাপথের সূচনা হল।

বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রকাশের হাতিয়ার: পত্রিকা

এই কালপর্বেই চাহিদা আসে মুসলমান সমাজের দাবি উপস্থাপনার, আপন সমাজের সমস্যা সমাধানের নিজস্ব মুখপত্রের। এই চাহিদা একেবারে নতুন। প্রকাশনা হতে থাকে একের পর এক পত্রিকা- বালারঞ্জিকা(১৮৭৩), আজীজননেহার(১৮৭৪), আখবারে এসলামীয়া(১৮৮৪), মুসলমান(১৮৮৪), ইসলাম(১৮৮৫), আহমদী(১৮৮৬) হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী(১৮৮৭), ভারতের ভ্রম নিবারণী(১৮৮৯), হিতকরী(১৮৯০), ইসলাম প্রচারক(১৮৯১), মিহির(১৮৯২), হাফেজ(১৮৯২), টাঙ্গাইল হিতকরী(১৮৯২), মিহির ও সুধাকর(১৮৯৫), কোহিনূর(১৮৯৮), প্রচারক(১৮৯৯), লহরী(১৯০০), মুসলমান পত্রিকা(১৯০১), সোতান(১৯০১), নুরুল ইসলাম(১৯০১), বালক(১৯০১), নবনূর(১৯০৩), মহাম্মদী(১৯০৩), হানিফি(১৯০৩), সুহৃদ(১৯০৪), সওগাত(১৯১৮), ধূমকেতু(১৯২৩), শিখা(১৯২৬), প্রভৃতি পত্রিকা সেই যুগের চাওয়া পাওয়াকে তুলে ধরেছে। কিছু কিছু পত্রিকা শুধুমাত্র ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের উদ্দ্যেশ্যে প্রকাশ হত। নারী কেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে। সেই পত্রিকাগুলি পণপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথার কুফলগুলিও তুলে ধরে। তবে শিক্ষা সম্পর্কে পত্রিকাগুলির মতামত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। পত্রিকাগুলি প্রথমেই মুসলিম মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য মত দেয় নি। একটা নির্দিষ্ট পরিসরে বলা ভাল অন্তঃপুরে শিক্ষাদানের কথা বলেছে। তবে এ ভাবনা মূলত উনিশ শতকের শেষ দিকের ভাবনা। যদিও বিশ শতকেও বিরোধী ভাবনা দেখতে পাওয়া –

> মোছলেম ললনাগণকে শিক্ষিত করিতে মোছলেম সমাজের উপযোগী শিক্ষাদান করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে তাহাদিগকে শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সুফল প্রসব করিবে না। স্যামিজ কামিজ আঁটিয়া

> গাড়ী চড়িয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয় গমন করা মোছলেম মহিলাগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ..... ইদানিং বটতলার বা অশ্বত্থ তলার নভেল নাটক পাঠ, সচিত্র প্রেমপত্র লিখন, রঙ্গালয়ে গমন বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গরাগ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয় যেমন শিক্ষার অঙ্গ হইয়াছে, যে শিক্ষায় রুচি বিকৃত হয়, অনাচার এবং ধর্মে-কর্মে অনাস্থার ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নয়।[৪৪]

মেয়েদের জন্য তার পরিসর আরও উন্মুক্ত করার আবেদন নিয়েও লেখা প্রকাশ হয়। 'মিহির ও সুধাকর' মুসলমান মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করে। কারণ ১৯০১ এর আদম সুমারীতে ৫০০ জন মুসলিম মহিলা ইংরেজি শিক্ষার দাবিতে মতামত প্রকাশ করেছে। এই পত্রিকা এমনকি বিদ্যালয় শিক্ষার কথা বলেছে।[৪৫]

অন্যদিকে ১৯০৪ সালে *নবনূর* পত্রিকায় 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে মুসলিম সমাজে তীব্র আলোড়ণ শুরু হয়। এই 'মিহির ও সুধাকর'ই তখন বিরোধিতা করে লেখা প্রকাশ করে। -

> স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা দান করা সমাজের কর্তব্য কিনা এই বিষয়ের মীমাংসার এ পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। স্ত্রীশিক্ষা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তাহার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা চাই। অর্থাৎ কোরাণ শরীফ পড়া, কিছু উর্দু ও বাংলা ভাষায় মুসলমানি মসলা- মসায়েলের কেতাবগুলি পাঠ করিয়া ধর্ম সম্বন্ধিয় যাবতীয় রীতিনীতি অবগত হইয়া শরাশরিয়ত অনুযায়ী সমস্ত ধর্মকার্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় ললনা বা তৎতুল্য কোন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া সাংসারিক কাজকর্মে সুশৃঙ্খলা, সাস্থ্যরক্ষা, সন্তান লালন-পালন রীতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারা যায়, এই আমাদের সমাজের ভগ্নীগণকে ঐ পরিমান বিদ্যাশিক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তাহাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।[৪৫]

পত্রিকাগুলিতে অনেকসময় মুসলমান সমাজের তালাকপ্রথা, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে মতামত গঠন করেছে। তালাক প্রথা রোধের জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী' লিখছে-

> আজকালকার মুসলমান সমাজ সাধরণত তালাকের অধিকারের যে প্রকার অপব্যবহার করিতেছে তাহা এছলামের আদর্শ নহে- বরং ঘৃণিত অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার।[৪৭]

মাসিক মোহাম্মদী ঐ সংখ্যায় আরও লিখছে-

> আজকাল অনেক মুছলমান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়ার জন্য বহু অর্থ ও শ্রমের সদ্ব্যয় ও অপব্যয় করিয়া থাকেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কি মিশরের অনুকরণে বিবাহ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধন করিতে পারেন না? মোছলেম লীগ, জ্মইয়তে ওলামা ও অন্যান্য মোছলেম প্রতিষ্ঠান গুলোকে এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি।[৪৮]

পুরনো বিবাহ আইনে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে ধর্মীয় এই আইন সংস্কারের দাবি উঠেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। *সাম্যবাদী* পত্রিকা ১৩৩০ সালে 'বিবাহে বরপণ' শীর্ষক প্রবন্ধে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। যদিও ইতিমধ্যে রোকেয়া বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, পণপ্রথা, তালাক প্রথা নিয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও তা একজন মেয়ের লেখা বলে সমাজ যেমন গুরুত্ব দেয়নি তেমনি একজন মহিলার এমন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সমাজ মেনে নিতে পারেনি।

এছলাম বাদী পত্রিকায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশ হয়। ১৩৩০ সালে *সুলতান* পত্রিকা জন্ম নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে সওয়াল করে। 'মাসিক মোহাম্মদী' তে ১৩৩৪ সালে তোরাব আলী জন্ম নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে লেখেন- 'নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নহে' [৪৯]

উনিশ শতকে বিশ্বনারীমুক্তি আন্দোলন

১৭৯৩ সালের বিপ্লবের পর ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে 'মানুষের অধিকার' সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। কিন্তু নারীরা ফরাসী বিপ্লবে এবং ইউরোপীয় আক্রমনের মুখে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও 'মানুষ' হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। অনেক আন্দোলনের পর কনভেনশনের ১৭ নং ধারায় 'নারীর অধিকার' সংযোজিত হয়েছিল। এই সময় মেরি উলস্টোন ক্রাফট(১৭৫৯-১৭৯৭) প্রমুখ নারীর মুক্তির দাবি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টীকারী

ভূমিকা পালন করেছিলেন। উলস্টোন ক্রাফটের লেখা, *Vinidiction Of the Right of Woman* , বইটি বহুল চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়[৫১]।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত ধর্মেই মেয়েদের দাসী ছাড়া আর কিছু ভাবার অবকাশ দেয়নি। পাশ্চাত্যেও ছিল একই ধারণা। এর বিরুদ্ধে প্রথমে নবজাগরণের চিন্তা পরে কার্ল মার্ক্স(১৮১৮-১৮৮৩), এঙ্গেলস(১৮২০-১৮৯৫) এর সমাজতান্ত্রিক দর্শন নারীকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দান করতে শিখিয়েছে। নবজাগরণের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথমে- পরিবারে নারীর ভূমিকা ও তার মর্যাদা দিতে হবে, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দিতে হবে, নারীর নিজস্ব রোজগারের উপর তার আইনি প্রতিষ্ঠা দিতে হবে; এই দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে নারীর ভোটাধিকার সহ বিভিন্ন দাবি যুক্ত হয়।

১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের 'পার্লামেন্টারি রিফর্ম এক্টে' মেয়েদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এইসময় কাজের দাবিতে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মানি ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে হাজার হাজার নারী ট্রেড ইউনিয়নে নাম লিখায়।[৫২] ভোটাধিকার আন্দোলন গড়িয়ে যায় পরের শতকেও। অবশেষে গ্রেট ব্রিটেনে ১৯১৮ সালে সীমিত সংখ্যক নারী ভোটাধিকার পান এবং ১৯২৮ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার পায় মেয়েরা। এই সময় ১৯১৮ তে জার্মানিতে, ১৯২০ সালে আমেরিকায় নারীরা ভোটাধিকার পায়। ভারতবর্ষে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলন জোরদার হয় ১৯৩৫ সালে।[৫৩]

১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কে শ্রমজীবী মহিলারা ৮ ঘণ্টা কাজ ও সমকাজে সমবেতনের দাবিতে আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনে কয়েকজন আন্দোলনকারী শহীদ হন।[৫৪] (অই, পৃ- ৪০)। এই দিনটিকে স্মরণ করে জাতিসংঘ ১৯৮৪ সালে ৮ মার্চ দিনটিকে 'নারী দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের আঁচ বাংলাদেশের প্রগতিশীল মানুষদের প্রভাবিত করেছিল। নারীরাও অনেকাংশেই তাপিত হয়েছেন এই আন্দোলনে।

উনিশ শতকে বাংলার সমাজ সংস্কার ও নারী কেন্দ্রীক সমস্যা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলার নারীমুক্তির বিষয়ে সমাজ সংস্কারকরা আন্দোলন শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতিতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীমুক্তি নারী স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে মহিলাদের উদ্যোগেই প্রকাশিত হচ্ছে *বামাবোধিনী, বান্ধব,* প্রভৃতি পত্রিকা। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮৬২-১৯২৩), চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪), লেডী অবলা বসু (১৯৬৫-১৯৩৭) জ্ঞানদানন্দিনী দেবী(১৮৫০-১৯৪১) প্রমুখ পুরাতন সমাজের চিন্তার সাথে লড়াই করে নারী মুক্তির পথকে প্রশস্ত করেছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্ব-স্ব ক্ষেত্র। কিন্তু মুসলমান সমাজে সামগ্রিক ভাবেই নারীমুক্তির চেতনা সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফূট হতে আরও সময় লেগেছে।

> উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে মুসলিম নবজাগরণের পুরোধা স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ভারতীয় মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালালেও নারীদের মুক্তির জন্য কোনও উদ্যোগ নেননি। তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আমীর আলি, আব্দুল লতিফ, আমীর হোসেন প্রমুখও তাদের স্বসমাজের নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেননি। ফলে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীও সবক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।[৫৫]

একদল পুরুষ মানুষ যখন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছেন, তখন অন্তঃপুরে নারীরা কঠিন অবরোধে আটকে আছেন। রান্না বাড়া, নির্জলা উপবাস, জড়োয়া অলংকার পরে কুটকচালি করা আর বছর বছর সন্তান জন্ম দিয়ে সুতিকা রোগে জীবন অতিবাহিত করা- এই ছিল মেয়েদের জীবন। সূর্যের আলো অন্তঃপুরে প্রবেশ না করায় অন্তঃপুর যেমন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন তেমনি শিক্ষার আলো বঞ্চিত মেয়েদের মন ততোধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। এদিকে পুরুষ কয়েকধাপ এগিয়ে গিয়ে দেখছেন জ্ঞান জগতে তাঁর কোনও সঙ্গী নেই। একা একা এগুনো সম্ভব নয়। তখনই অন্তঃপুরের মেয়েদের লেখা পড়া শেখানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন তাঁরা।

এক দল শিক্ষা পেয়ে এগিয়ে গিয়ে এও বুঝলেন তাঁদের সন্তান সন্ততিকে উপযুক্ত শিক্ষিত করার জন্য তাদের মায়েরও উপযুক্ত শিক্ষার দরকার। এই বোধ সম্ভবত উনিশ শতকের আশির দশক থেকে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পায়।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখছেন,

> নারীকে পিছনে রাখিয়া অন্ধ অন্তঃপুরের শতবিধ মূর্খতা ও কুসংস্কারের জটিল ও কুটিল বেষ্টনে বেষ্টিত রাখিয়া যাহারা জাতীয় জীবনের কল্যান ও মুক্তির কামনা করে, আমার বলিতে কুণ্ঠা নেই, তাহারা মহা মূর্খ। নারীর শক্তি যাগাইতে না পারিলে—নারীর প্রাণে প্রাণ না জাগাইতে পারিলে—সন্তানের শক্তি সন্তানের প্রাণ আসিবে কোথা হইতে? জাতির মেরুদণ্ডই নারী। জাতি কখনই স্কুলে কলেজে গঠিত হয়না; জাতি গঠিত হয় মায়ের উদরে এবং মায়ের কোলে।[৫৬]

রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে। তখনও পর্যন্ত নবাব ফয়জুন্নেসা প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া মুসলিম ছাত্রীদের জন্য অন্য কোনও বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। ১৮৮৩ সালে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' অন্তঃপুরের মুসলিম মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

এই প্রচেষ্টার আগে অদম্য সাহসের অধিকারী কয়েক জন মহিলা নিজেদের শিক্ষিত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। যাঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রোকেয়ার যাত্রাপথের হাতিয়ার হয়ে আছে। ফয়জুন্নেসা (১৮৩৪-১৯০৩), তাহেরুন্নেসা, করিমুন্নেসা (১৮৫৫-১৯২৬), লতিফুন্নেসা (১৮৭৭-), এবং সহিফা বানু (১৮৫০-১৯২৬) এঁদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এক অনন্য সাধারণ ভুমিকা রেখে গেছেন।

তাহেরুন্নেসা: প্রথম মুসলিম মহিলা গদ্য লেখিকা

গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় নারীর শিক্ষার দাবি নিয়ে প্রথম গদ্য রচনা করেন তাহেরুন্নেসা।[৫৭] ১২৭১ বঙ্গাব্দের (১৮৬৫) ফাল্গুন মাসে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় 'বামারচনা' বিভাগে নারী পুরুষের সমতার দাবি নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন।[৫৮]

তাঁর জন্ম পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের শেষে তাঁকে বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] পরিবারের উন্নতির জন্য নারী শিক্ষা কেন প্রয়োজন তা তাঁর এই লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি লিখছেন –

> বিদ্যোপার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয় আকাশ জ্ঞান শশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম প্রতিপালনপূর্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না[৬০]।

লক্ষণীয়, তাহেরুন্নেসা জোর দিচ্ছেন, পরিবারের উন্নতির জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন, তার নিজের প্রয়োজনের কথা তিনি বলছেন না। আসলে নারীও যে মানুষ সে ধারণা সমাজে তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্তত মুসলিম সমাজে। তাই নারীর নিজস্ব বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনের বক্তব্য সমাজ মানবেনা। এ তিনি জানতেন। এই কারণে এই সময়ের নারীমুক্তির পথ প্রদর্শকদের প্রায় প্রত্যেককেই পরিবারের বিকাশের জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হয়েছে। শাস্ত্র ও অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে নারীদের গুরুত্ব বোঝাতে হয়েছে। তাহেরুন্নেসাও তাই করেছেন –

> পূর্বতন রমণীগণের মধ্যে লীলাবতী, খনা, রানী ভবানী প্রভৃতি স্ত্রীগণ আপন আপন বিদ্যাপ্রভাবে কিরূপ যশোরাশি বিস্তারকরত পিতৃ এবং স্বামী বংশ সমুজ্জল করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।.. ... অতএব হে এদেশীয় সভ্য ভদ্র মহোদয়গণ ! আপনারা আর স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না।[৬১]

তাহেরুন্নেসার এ আবেদন পুরুষতন্ত্রের মূলে নাড়া দিতে পারেনি। সম্ভবও ছিলনা। পুরানো সংস্কার পুরুষকে পিছু টেনেছে, পিছু টেনেছে পুরুষতন্ত্রের ইগো। পাশাপাশি সে দেখেছে প্রতিবেশি হিন্দু সমাজের মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে পুরুষদেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। এতে মুসলিম সমাজ প্রমাদ গুনেছে। মেয়েদের শিক্ষাকে আটকে রাখতে

চেয়েছে।তাহেরুন্নেসার গদ্য রচনায় সাবলীল প্রবাহ পাঠকে আকর্ষণ করে। আনোয়ার হোসেন লিখছেন-

> তাহেরুন্নেসাই প্রথম গদ্য লেখিকা যাঁর গদ্যে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের সুস্পষ্ট প্রভাব ও ছন্দোস্রোত লক্ষ্য করা যায়। মীর মোশারফ হোসেনের আগে তাহেরুন্নেসার গদ্যেই বিদ্যাসাগরীয় প্রভাব পড়েছিল। পরিমিত ভাষণ এবং জোরালো যুক্তি দিয়ে তিনি মুসলমানগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে স্ত্রীলোককে শিক্ষাদান অবশ্য কর্তব্য।[৬২]

এমন প্রতিবাদী তাহেরুন্নেসা কোথায় হারিয়ে যান। হয়তো, সেই সময়ের ব্যতিক্রমী মহিলার পক্ষে সমাজের সাথে বেশিদিন লড়াই করা সম্ভব হয়নি। গোলাম মুরশিদ(১৯৪২) এক আশঙ্কা ব্যক্ত করে লিখছেন –

> তাঁর উপরোক্ত রচনায় যে মহৎ বীজ লুকানো ছিল, হয়তো তাঁর বিবাহের ফলে সেকালের বহু মহিলার মতো অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল।[৬৩]

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী: প্রথম মুসলিম মহিলা সমাজ সংস্কারক

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী তাঁর সময়ের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। স্বামী-সংসারকে নারী জীবনের সার মনে করেননি তিনি। স্বামীর বহুবিবাহের প্রতিবাদ করে দুই মেয়ে সম্বল করে স্বামীর ঘর ছেড়েছেন। উপলব্ধি করেছেন নারী জীবনের সার শিক্ষায় এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে নিহিত আছে। স্বশিক্ষিত হয়েছেন। সেই সময়ে *বান্ধব* পত্রিকা, 'সখী সমিতি' প্রভৃতির সাথে যুক্ত থেকে নিজেকে আরও বিকশিত করেছেন। অশিক্ষা কুশিক্ষা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছেন। লিখেছেন *রূপজালাল* (১৮৭৬), *তত্ত্ব, জাতীয় সংগীত, সঙ্গীত লহরী* নামের চারটি গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থ তিনটি সঙ্গীত বিষয়ক। *রূপজালাল* গ্রন্থটি তাঁর জীবনের করুণ কাহিনি নিয়ে। তবে তিনি 'নারী শিক্ষার অগ্রনায়িকা'[৬৪] হিসাবে ভূমিকা পালন করলেও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি কিছু লেখেননি। এ নিয়ে সমালোচকদের সংশয় নিরশন হয়নি[৬৫]।

এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষকের মত ফয়জুন্নেসা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার তত্ত্বের বাকবিতণ্ডায় যেতে চাননি। নিভৃতে থেকে নারীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের কাজ করে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন বালিকা বিদ্যালয়, জেনানা হাসপাতাল। শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তিনি থেমে থাকেননি। মেয়েদের পড়ার সুবিধার জন্য স্থাপন করেছেন ছাত্রীনিবাস বা গার্লস' হস্টেল। সেইসঙ্গে জমিদারি আয় থেকে হস্টেলের খরচ নির্বাহ ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন[৬৬]।

এইভাবে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর সমাজ কল্যাণমুলক কাজ নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে। তারই সাথে নারীর গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজকে ভাবতে শিখিয়েছে।

রোকেয়ার অনুপ্রেরণাদাত্রী করিমুন্নেসা

করিমুন্নেসা নিজের অসীম প্রচেষ্টায় এবং বহু প্রতিকুলতা পার হয়ে বহু জ্ঞানের অধিকারিণী হন। তিনি অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করেও কর্তব্যে অটল একজন বিরল মানুষ। তিনি সমাজের কটূক্তি উপেক্ষা করে দুই সন্তানের শিক্ষার উপযুক্ত ভার গ্রহণ করেন। লেখেন কাব্যগ্রন্থ – *দুঃখতরঙ্গিণী* এবং *মানব বিকাশ* । হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বার্তা বাহক *আহমদী* পত্রিকা তাঁর আনুকূল্যেই প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে করিমুন্নেসার অবদান এখানেই শেষ নয়। রোকেয়ার মত মহান মানুষকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রোকেয়া লিখছেন –

> আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্য নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ! তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য – চর্চ্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে।... ...। আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না।[৬৭]

করিমুন্নেসা বুঝেছিলেন মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। কিন্তু নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান নি। সমাজ প্রতি পদে আটকেছে।

তাঁকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা থেকে। কিন্তু স্নেহের রোকেয়ার ক্ষেত্রে এমন যাতে হতে না পারে তার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। লেখায় উৎসাহী করেছেন। সে কারণে রোকেয়ার এমন বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে করিমুন্নেসার অবদান অনস্বীকার্য।

লতিফুন্নেসা : প্রথম মুসলিম মহিলা চিকিৎসক

নিজের যুগকে হার মানিয়েছেন লতিফুন্নেসা। যে যুগে স্কুলে পাঠরতা মুসলিম ছাত্রী বিরল ছিল সেই যুগেই তিনি মাসিক ৭৮ টাকা বৃত্তি পেয়ে ভার্ণাকুলার লাইসেন্সিয়েট মেডিসিন ও সার্জারি কোর্স পাশ করেন। লক্ষণীয়, মাত্র তার দশ বছর আগে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।[৬৮] কি অদম্য সাহস ও অবিচল নিষ্ঠা থাকলে মুসলিম সমাজের অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

লতিফুন্নেসা নিজে শিক্ষিত হয়ে মুসলিম নারীর কাছে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। সে কারণে তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের আহ্বান জানিয়েছেন অবরোধের নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য।

অনন্য সঙ্গীত সাধক: সহিফাবানু

সিলেট জেলার প্রথম কবি সহিফা বানু সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়ে বেশি পরিচিতি অর্জন করেছেন। তাঁর সহিফা সঙ্গীত এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। গ্রন্থটি সিলেট সাহিত্য সংসদে রক্ষিত আছে। তাঁর অন্য গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না। ব্যক্তি জীবনেও সহিফা উদার চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। বোরখা পরেননি কোনওদিন। সেই সময়ে নারীর সঙ্গীত চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। তখনই সহিফার কলমে অজস্র সঙ্গীত রচিত হয়েছে, সুর সংযোজিত হয়েছে। এই উদারতা তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয়। লক্ষিত হয় তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনাতেও। তাই তাঁর কাব্যে প্রতিবেশী হিন্দুর মৃত্যুতে তার পরিবারের বেদনা করুণ সুরে প্রকাশ পেয়েছে।[৬৯]

প্রবল অবরোধের বিরুদ্ধে মুসলিম নারীর আত্মপ্রকাশের যে অবদমিত ইচ্ছাকে আমরা ভাষা পেতে দেখেছি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মধ্য দিয়ে, তা কোনও

বিছিন্ন ঘটনা নয়; একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফসল। যার সর্বোন্নত রূপ আমরা দেখতে পাই বেগম রোকেয়ার মধ্যে। মুসলিম নারীর আত্মজাগরণের সে দীর্ঘ যাত্রাপথে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাহেরুন্নেসা, ফয়জুন্নেসা, লতিফুন্নেসা, সহিফা বানু, করিমুন্নেসা খানম প্রমুখ মহীয়ষী নারী। এঁদের উত্তরাধিকারী হিসাবে নারীমুক্তির পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন রোকেয়া। তাকে পৌঁছে দিয়েছেন বহুজনের কাছে। তিনি তাঁর স্নেহ, সাহচর্য্য ও নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে ভবিষ্যতের যোদ্ধা হিসাবে একদল নারীকে তৈরি করেছেন।

রোকেয়া একজন মেয়েকে সমস্ত দিক থেকে একজন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনভর সমাজের সাথে এক অসম লড়াইতে নেমেছিলেন। সেই সময় একজন নারীর এমন বলিষ্ঠ পদচারণা সমাজে গ্রহণ করার মত মনন তৈরিই হয় নি। কিন্তু তাঁর অসীম মনোবল মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও নারীমুক্তির সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি। তিনি ছিলেন মূলত একজন সমাজ সংস্কারক। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন নারীর মুক্তি না আসলে সমাজের মুক্তি অসম্ভব। তাই মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়া শিক্ষিত হওয়ার জন্য করেছেন মহিলা সংগঠন ‘আঞ্জমানে খাওয়াতীনে ইসলাম’(১৯১৬)।

রোকেয়ার পূর্বসুরী এই সব সাহসী মহিলাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও নারীমুক্তির জন্য সমাজের দাবি আরও একদল মুসলিম নারীকে শিক্ষার অঙ্গনে, সামাজিক আন্দোলনে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকেই রোকেয়ার কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। এবং নিজস্ব উদ্যোগেও গড়ে তুলেছিলেন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আগামী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছিলেন এক বলিষ্ঠ উত্তরাধিকার। এই পর্বে রোকেয়ার সহযোদ্ধা এবং প্রায় সেই যুগের দাবি নিয়ে যাঁরা নারীর এবং সমাজের প্রগতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন- খায়েরুন্নেসা(১৮৭৪/৭৬-১৯১০), মাসুদা রহমান(১৮৮৫-১৯২৬), মামলুকুল ফতেমা খানম(১৮৯৪-১৯৫৭), নূরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী(১৮৯৪-১৯৭৫)প্রমুখ। এঁদের রচনায় নারীর শিক্ষার ও স্বনির্ভরতার অধিকার, পর্দা ও অবরোধ, তালাক প্রথা, বহু বিবাহের বিরোধিতা, বিধবা বিবাহে স্বীকৃতি প্রভৃতি নারীর নিজস্ব মুক্তির বিষয়টি উঠে এসেছে।

তার সাথে তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সচেতন। তাই তাঁদের রচনায় এই স্বদেশী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বাংলা ভাষার প্রতি মর্যাদা দান প্রভৃতি বিষয়গুলিও দেখতে পাওয়া যায়। রোকেয়া সহ এই সব মহান মনীষার বিপুল কর্মদ্যোগে আরও একদল বাঙালি মুসলমান নারীর আগমন ঘটে। তাঁরা আবার নতুন যুগের দাবি নিয়ে নতুন উদ্যোমে বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিতে নিজেদের যুক্ত রাখেন। তারই প্রতিফলন পাই তাঁদের লেখায়।

বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্ধকার কোণে নবজাগরণের আলো কিছুটা প্রবেশ করতে পেরেছিল। সেই আলোকিত চিন্তায় বাড়ির মেয়েদেরও শিক্ষিত করার প্রয়াস অনেকাংশেই লক্ষিত হয়। আমরা রোকেয়া পরবর্তীযুগের মুসলিম নারীদের রচনায় দেখতে পাব সেই সব চিত্র। ধর্মীয় গোঁড়ামী কাটিয়ে পরিবারের বিরুদ্ধে নিজেরা শিক্ষিত হচ্ছেন এবং নিজের স্ত্রী কন্যাকে শিক্ষিত করছেন।[৭০] যেমন মামলুকুল ফতেমা খানমের বাবা তাঁর কন্যা সন্তানদের ইংরেজ মেমের কাছে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। এবং তাঁর মা এর ইংরেজি শিক্ষা ও ক্রুশের কাজ শিক্ষার জন্যও একজন ইংরেজ মেম শিক্ষিকা নিযুক্ত করেছিলেন। ফতেমা খানমের ভাগ্নী, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী(১৯১৯-১৯৮৭) লিখছেন-

> আমার নানি, খালাম্মা – সবাই লেখাপড়া জানতেন। তাঁরা পর্দার ভিতরে থাকলেও বাড়িতে তাঁদের পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। আমার নানিকে ইংরেজি এবং ক্রুশ কাঠিতে উলের বোনাবুনির জন্য আমার নানা একজন ইংরেজ মিশনারী নারীকে নিযুক্ত করেছিলেন।[৭১]

আখতার মহল সৈয়দা খাতুন(১৯০১-১৯২৮) এর পরিবারে এরকমই চিত্র দেখা যায়। যদিও তাঁর স্বামীর বাড়িতে ছিল পুরনো চিন্তারই পরিবেশ। সেখানে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন এবং লিখতেন। কিন্তু তাঁর নিজের বাড়িতে ছিল অন্যধরণের পরিবেশ সেখানে সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত, বাঁশির সুরে সবাই মেতে থাকতেন। তিনি নিজে রচনা করেছিলেন দুটি উপন্যাস বা এক অর্থে বড়ো গল্প। আরও অনেক লেখাই লিখেছিলেন কিন্তু সে লেখা হারিয়ে যায়। একবার নোয়াখালিতেতে নজরুল এসেছিলেন। তাঁকে

আপ্যায়নের জন্য আখতার মহলের শ্বশুর পরিবারের পক্ষ থেকে লেখাপড়া জানা বৌমার কাছ থেকে একটি অভিনন্দন বার্তা লিখিয়ে নেওয়া হয়। সেই কবিতাটি পড়ে নজরুল এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর আরও লেখার খোঁজ করেন। সেই লেখা পত্রিকার ছাপানোর উদ্দেশ্যে নজরুল নেওয়ার পর তা কোথায় হারিয়ে যায়। যদিও তাঁরই উদ্যোগে 'নিয়ন্ত্রিতা' ও 'মরণ বরণ' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে *নওরোজ* ও *সওগাত* পত্রিকায়।[৭২]

সমাজ ও বিবর্তনের এই ধারাতেই বাংলা একদিন ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় বাংলার মানুষ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই সেই অর্থে বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক গণসংগ্রাম। ইতিহাসের এই পর্বে এসে আমরা বাঙালি মুসলিম নারীদের নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম নারী আত্ম-অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে তারা যে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেছিল বঙ্গভঙ্গের সময়ে তাঁদেরকেই আমরা পাচ্ছি রাজনীতি সচেতন নারী হিসাবে। পর্দা ও অবরোধের প্রতিবন্ধকতা তার তখনও ছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও ছিল। কিন্তু তা প্রধান ছিল না। ইতিমধ্যে বাংলার মুসলিম নারীর চিন্তা প্রসারিত হয়েছে রাজনীতি ও সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে এখন সে শুধু নিজের মুক্তির পথ খুঁজছে না। খুঁজছে সামগ্রিক সমাজ মুক্তির পথ। অবিরত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী ও সর্বোন্নত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ পেয়েই শুধু তারা তৃপ্ত নয়। বহুদিনের লালিত সনাতনী পর্দা ও অবরোধের সীমাকে অতিক্রম করে আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ মুক্তির সেই পথে সে ভূমিকা পালন করছে।

তথ্যসূত্র:

১. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২য় প্রকাশ জুলাই ২০১০, মূল্য- ১০০টাকা, পৃ-২।

২. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ২০০৯, মূল্য- ১৩০ টাকা, পৃ- ১৩।

৩. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৯।

৪. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৯।

৫. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

৬. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ-৪।

৭. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

৮. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ-৯।

৯. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

১০. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৬।

১১. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৯-১০।

১২. সুকুমারী, ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারতে নারী : বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ', *ভারত ইতিহাসে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ-১১।

১৩. বেগম, মালেকা, 'উৎসের সন্ধানে', *বাঙলার নারী আন্দোলন,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, ১ম প্রকাশ- ১৯৮৯, পৃ- ২।

১৪. আন্তনভা, কোকা; লেভিন, গ্রেগরি বোনগার্দ; কোৎভস্কি, গ্রেগরি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* , প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় প্রকাশ -১৯৮৬, পৃ- ৪৪।

১৫. সেন, সুকুমার, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, আনন্দ, দ্বাদশ মুদ্রণ -২০১৫, মূল্য- ২৫০টাকা, পৃ- ৯।

১৬. শরীফ, আহমদ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব* , অনন্যা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ৩য় মুদ্রণ- ২০১২, পৃ- ১২, দাম- ২৫০/- টাকা।

১৭. শরীফ, আহমদ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

১৮. শরীফ, আহমদ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

১৯. সেন, দীনেশ চন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ* , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১, পৃ- ৪৭।

২০. বেগম, মালেকা, 'উৎসের সন্ধানে', *বাঙলার নারী আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮।

২১. বেগম, মালেকা, 'উৎসের সন্ধানে', *বাঙলার নারী আন্দোলন,* পৃ- ৭।

২২. সেন, দীনেশ চন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ* , প্রাগুক্ত পৃ- ৫১।

২৩. ভাদুড়ী, রীনা, 'মধ্যযুগে বাংলায় নারী ভাবনা ও নারীর স্থান সাহিত্য ও সমাজে' , *ভারত ইতিহাসে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫।

২৪. বেগম, মালেকা, *বাঙলার নারী আন্দোলন,* পৃ- ১১।

২৫. শরীফ, আহমদ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩-৩৪।

২৬. বেগম, মালেকা, *বাঙলার নারী আন্দোলন,* পূর্বোক্ত পৃ- ৭।

২৭. বিবেকানন্দ, চিঠি, *রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ : মুক্ত মনের আলোয়* (পত্র বিতর্ক সংকলন), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০০২, মূল্য-২০ টাকা। পৃ- ৩০।

২৮. বেগম, মালেকা, *বাঙলার নারী আন্দোলন,* পূর্বোক্ত পৃ- ৮।

২৯. ভাদুড়ী, রীনা, 'মধ্যযুগে বাংলায় নারী ভাবনা ও নারীর স্থান সাহিত্য ও সমাজে' , *ভারত ইতিহাসে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

৩০. ভাদুড়ী, রীনা, 'মধ্যযুগে বাংলায় নারী ভাবনা ও নারীর স্থান সাহিত্য ও সমাজে' , *ভারত ইতিহাসে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯।

৩১. ভাদুড়ী, রীনা, 'মধ্যযুগে বাংলায় নারী ভাবনা ও নারীর স্থান সাহিত্য ও সমাজে' , *ভারত ইতিহাসে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

৩২. সেন, ডঃ দীনেশ চন্দ্র, 'মুসলমান কবিদের শ্রেষ্ঠ অবদান পল্লীগাথা', *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান,* কথা সংস্করণ ২০১১, মূল্য- ১০০ টাকা, পৃ- ৬৩।

৩৩. হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙলার মুসলিম নারী (১৮৭৩- ১৯৭১)* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩০।

৩৪. ফে, এলিজা, চিঠিপত্র, ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* , ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা- ৭৩, ৭ম সং- ২০১৩, পৃ- ২০৯-২১০, মূল্য- দুইশত কুড়ি টাকা।

৩৫. বেগম, মালেকা, *বাঙলার নারী আন্দোলন*, পূর্বোক্ত পৃ-১০।

৩৬. হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙলার মুসলিম নারী (১৮৭৩- ১৯৭১)* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১।

৩৭. আমিন, সোনিয়া নিশাত, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ- ২০০২, পৃ- ৩৫।

৩৮. হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩।

৩৯. বেগম, রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* , বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ- আষাঢ় ১৪০০, মূল্য- ৯০টাকা, পৃ- ১০৫-১০৮।

৪০. *Ibid*, page- 225, আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৮৩, পৃ- ১৩৯।

৪১. রোকেয়া, রহমান, মুজিবরকে লেখা পত্র, ৩০ নভেম্বর, ১৯১৭, *রোকেয়া রচনাবলী* , ঘোষ, অনিল(সম্পা) কথা, কল- ৪৭, মূল্য-৪০০টাকা , পৃ- ৫৫৩- ৫৫৭।

৪২. Ahamad, Sufiya, Muslim Community in Bengal, 1884-1912, Dhaka, by the author. উদ্ধৃত- নিশাত, সোনিয়া আমিন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩০।

৪৩. Eswar Chundar Sarma, ' Notes On The Sanskrit College', 12 April, 1852, উদ্ধৃত, মিত্র, ইন্দ্র, *করুণা সাগর বিদ্যাসাগর* , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল- ৭০০০০৯, ৩য় মুদ্রণ ২০০১, মূল্য- ২০০টাকা, পৃ- ৬৫৩-৬৫৫।

৪৪. রহমান, আবদুর, 'শিক্ষার ভিত্তি', *আল-ইসলাম* , কার্তিক ১৩২৬, উদ্ধৃত- হোসেন, আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৮।

৪৫. *মিহির ও সুধাকর*, ২৩ মাঘ ১৩০৯, উদ্ধৃত- আহমদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫০০।

৪৬. *মিহির ও সুধাকর*, ২৩ মাঘ ১৩০৯, উদ্ধৃত- আহমদ, ওয়াকিল, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫০০-৫০১।

৪৭. খাঁ, মহম্মদ আকরম, 'এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার', *মাসিক মোহাম্মদী,* ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৩৪, উদ্ধৃত- হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫।

৪৮. খাঁ, মহম্মদ আকরম, 'এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার', প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৬।

৪৯. আলী, তোরাব, 'জন্ম শাসন ও বাঙালী মুসলমান,*মাসিক মোহাম্মদী,* চৈত্র ১৩৩৪, উদ্ধৃত – হোসেন আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৬।

৫০. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম পুনমূদ্রণ- ২০০৪, মূল্য- ৭০টাকা, পৃ- ২৭।

৫১. মুরশিদ, গোলাম, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমনী* , নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১ম ভারতীয় সং- ২০০১, মূল্য-২০০১, পৃ- ২১।

৫২. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১।

৫৩. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৭।

৫৪. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০।

৫৫. হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ- ২১।

৫৬. সিরাজী, ইসমাইল হোসেন, 'নারী শক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন', *ছোলতান,* পৌষ ১৩৩০, উদ্ধৃত- হোসেন, আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫০।

৫৭. হোসেন, আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৭।

৫৮. হোসেন আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৭-১০৮।

৫৯. হোসেন, আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৮।

৬০. হোসেন আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৮।

৬১. হোসেন আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৯।

৬২. হোসেন আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৯।

৬৩. মুরশিদ, গোলাম, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* বাংলা একাডেমী সং- ১৯৯৩, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা- ৯৭-৯৯, উদ্ধৃত- হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৯।

৬৪. আহমদ, রফিক, 'নারী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজকল্যাণে ব্রতী ফয়জুন্নেছা', *নারী প্রগতির চার অনন্যা,* প্রকাশকাল- জানুয়ারি ২০০৯, কথা, রামগড় কলকাতা ৪৭, পৃ- ২৩, মুল্য- ৮০টাকা।

৬৫. রফিক, আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩।

৬৬. রফিক, আহমদ, পূর্বোক্ত, ২১-২২।

৬৭. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া, *রোকেয়া রচনাবলী* , অনিল ঘোষ(সম্পা), সংস্করণ-২০১৪, কথা, রামগড়, কল- ৪৭, মূল্য- ৪০০টাকা।পৃ- ২৫১।

৬৮. হোসেন, আনোয়ার, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৮-১০৯।

৬৯. হোসেন, আনোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৫।

৭০. ইমাম, জাহানারা, *অন্যজীবন* , চারুলিপি, ৪র্থ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪২৩, বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, মূল্য- ২০০.০০ টাকা।

৭১. মওদুদ, বেবী(সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী), 'আনোয়ারা বাহার চৌধুরী : ঢাকার বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, *প্রথম আলো*, প্রতিচিন্তা, protichinta.com/amp/story, ৮জুন, ২০১৭।

৭২. আখতার, শাহীন; ভৌমিক, মৌসুমী(সম্পা), *জানানা মহ্‌ফিল* , স্ত্রী, কল, পৃ- ১১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোকেয়া রচনায় সমাজ চিন্তা ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯০৫-১৯৩২)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোকেয়া রচনায় সমাজ চিন্তা ও নারীমুক্তি আন্দোলন

(১৯০৫-১৯৩২)

ভারতবর্ষের নারী মুক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৯৮০-১৯৩২)। শুধু নারীমুক্তি আন্দোলনই নয়, তৎকালীন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যে প্রচেষ্টা চলছিল তারও অংশীদার ছিলেন। এক বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে ঘটেছিল তাঁর আত্মপ্রকাশ। যে ব্যবস্থা সমাজ প্রগতিকে আটকাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর প্রতিবাদ। মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরি করেছেন নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম'। অসংখ্য অবরোধ বাসিনীর অনুপ্রেরণা হয়ে শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি একটা যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর রচনার অভিমুখ অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীবিদ্বেষী ধর্মান্ধ সমাজকে আলোক স্পর্শে আনার প্রয়োজনে। রোকেয়া তাই সচেতনভাবেই প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তাঁর রচনায় সেই ভাবনাই বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর সর্বান্তকরণ জুড়ে ছিল এই অভাগা দেশের ততোধিক অভাগিনী নারীদের মুক্তি কি উপায়ে সম্ভব সেই চিন্তা! তাদের মুক্তি না হলে সমাজের মুক্তি কখনই সম্ভব নয়। এই মুক্তিপথের অনুসন্ধানে তিনি সামাজিক বাধা এবং কুৎসার স্বীকার হয়েছিলেন কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়ে লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত করা যায় নি তাঁকে। আমৃত্যু সে সাধনা চলেছে। কিন্তু তাঁর ভাবনা শুধুমাত্র নারীকেন্দ্রিক ছিল না। সেই সময়ের স্বদেশ চিন্তার নানা দিক তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, চিঠিপত্রে তাঁর বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচনাগুলিকে ভিত্তি করে রোকেয়া রচনায় নারীমুক্তি ও প্রগতি ভাবনাকে খুঁজতে চাওয়া হয়েছে এই গবেষণায়।

রোকেয়া-মানস ও তার ভিত্তি

ব্যক্তি চিন্তা ও সমাজ চিন্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক জনের ব্যক্তি মানস। যা তাকে একজন সামাজিক জীব হিসাবে আত্মসচেতনতার উর্ধ্বে সমাজ সচেতন করে তলে। এই সমাজ চেতনাই তাকে সমাজ বুনোটের ফাঁক ফোকড়ে নিহিত অভাব আভিযোগগুলি দেখিয়ে দেয়, সেই অসাম্যকে দূর করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার দূর্গম পথে তাঁর আত্মমর্যাদাকে খুঁজে পেতে প্রাণিত করে। মানব মনের এই জটিল নির্মাণ প্রক্রিয়াকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বেগম আখতার কামাল[১]। বেগম রোকেয়ার রচনা এর ব্যাতিক্রম নয়।

তাঁর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দে এক মুসলিম পরিবারে। পরিবারে অবরোধ প্রথার প্রভাব ছিল প্রবল। তাঁর রচনায় সেই চিত্র আমরা পাই —

> একবার আমরা কলিকাতায় আসিতেছিলাম; আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর ছিল। সে এবং আমি আম্মাজানের সহিত পাল্কীতে বন্দী হইলাম। সেই পাল্কী স্টীমারের ডেকে রাখিয়া আমাদিগকে নদী পার করান হইল। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল— বানাতের ওয়াড় ঘেরা রুদ্ধ পাল্কীর ভিতর আমার শিশু ভগিনী 'হোয়া-হোয়া' করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। আম্মাজান প্রাণপণে তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পাল্কীর নিকট উপবিষ্ট কোন আল্লাহর বান্দাই ক্রন্দনরতা শিশুকে পাল্কী হইতে বাহির করার প্রয়োজন বোধ করে নাই।[২]

এইরকম মধ্যযুগীয় কুসংস্কারগ্রস্ত জমিদার পরিবারে বিরোধাভাস তাঁর দিদি করিমুন্নেসা ও দাদা ইব্রাহিম সাবের। যাঁরা তাদের স্নেহের রুকুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষার আলো। বিয়ের পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন(?-১৯০৯) তাঁর মধ্যের এই আলোকশিখাকে আরও উদ্দীপ্ত করেছিলেন। যে আলোকবর্তিকা দিয়ে রোকেয়া শুধু নিজের নন, সমগ্র স্ত্রী জাতির মুক্তির পথকে উজ্জ্বল করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে বাংলার নবজাগরণের চিন্তা সমাজে ব্যপক উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। যদিও মূলত হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যদিয়ে বাংলার নবজাগরণের সূচনা রাজা রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) ও আরও পরে বিদ্যাসাগরের

(১৮২০-১৮৯১) চিন্তার দ্বারা হওয়ায় বাংলার মুসলিম সমাজে এই সংস্কারের তেমন কোনও প্রভাব ছিল না। ফলে হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুসলিম সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ। মুসলিম সমাজের পশ্চাৎগামীতার এই দিকটি বেগম রোকেয়া তাঁর রচনাতেও তুলে ধরেছেন—

> হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা বিবাহ প্রচলণের চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয় বিধবা কণ্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।.... .... -..... এখন হিন্দুগণ অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুষ্পাঠী,পাঠশালা,স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিয়াছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।[৩]

এই প্রেক্ষাপটে রোকেয়ার আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক ঘটনা। নবজাগরণের বলিষ্ঠ চিন্তার প্রভাব তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। যার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে রোকেয়া মুসলিম নারীর উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ দেশের মেয়েদের সামনে তুলে ধরেছিলেন মনুষত্ব্যের দাবি। ধর্ম-জাতি-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠে শুধুই মানুষ হিসেবে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা চেয়েছেন তিনি।[৪] বেগম আখতার কামাল তাই যথার্থই বলেছেন—

> রোকেয়া অন্যান্য মুসলমান চিন্তাবিদের মতো স্বসম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব, অবস্থান ও প্রতিষ্ঠার সমস্যাকে খন্ডিত ভাবে বিবেচনা না করে তার প্রাথমিক ভিত্তিকে গড়তে চেয়েছিলেন। ওই রেনেসাঁসের মূল প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজ ও জীবনের পুনর্নির্মাণই তাঁর চিন্তায় অনিবার্য সত্য বলে মনে হয়েছিল.... .... ফলে তৎকালীন মুসলিম চিন্তাবিদদের একাংশে মাতৃভাষা নিয়ে যে সমস্যা, ধর্মাদর্শ ও ঐতিহ্য বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব জটিলতার সংঘাত জেগেছিল, রোকেয়া- মানস তা থেকে আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত।[৫]

এই মুক্তচেতনা নিয়েই রোকেয়া ভারতীয় নারীর উন্নতি চেয়েছেন—

> স্বামীর ঘর করাই নারী জীবনের সার নহে। মানবজীবন খোদাতালার অতিমূল্যবান দান ... ...তাহা শুধু রাঁধা-উনুনে ফুঁ পাড়া আর কাঁদার জন্য

> অপব্যয় করিবার জিনিস নহে। সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে।[৬]

তাঁর রচনা সমূহ পুরুষতন্ত্রের এই অসম বন্টনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর জীবন শুধুমাত্র সমাজের বৈষম্য প্রকাশ করেই থেমে ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তখনকার সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ- বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য তৈরী করেন— সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল(১৯১১)। অসীম ধৈর্য্য, সাহস আর মনোবল নিয়ে একক প্রচেষ্টায় এই স্কুল পরিচালনা করেছেন। সমাজের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্কুল ছাড়াও কলকাতার গরিব বস্তি এলাকায় স্কুল, নারী কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করেছেন। তার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর হাতে গড়ে ওঠা সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯) —

> আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম যে উনি(রোকেয়া) যে করলেন ওইটার কাজ নিয়ে কলকাতার বস্তীতে বস্তীতে আমরা কাজ করেছি। খালি বলতেন দেখ এই যে, কাছে আসে যারা... ... . তারা যে মিটিংএ আসে এইটাই খালি উন্নতি না, আসলে আমাদের দেখতে হবে যে আরও যে আমাদের নির্যাতিত বোনেরা রয়েছে ভাইয়েরা রয়েছে তাদেরকে। ... . এই স্কুলে যতক্ষণ তোমরা আমার সাথে কথা বলতে তার চেয়ে তোমরা বস্তীতে গিয়ে আমার ভাইদের, বোনদের বুঝাও তাহলে আমাদের সমাজের উন্নতি হবে। ওরা যদি স্কুলে নাও আসতে চায় তবুও ওদেরকে একটু লেখাপড়া শিখাও।[৭]
> (কামাল,সুফিয়া, একালে আমাদের কাল, "নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল", সম্পা- শ্যামলী গুপ্ত, আবদুস সাত্তার, গৌতম রায়, পুনশ্চ, কলকাতা- ৭০০০০৯, সব্ররবাধুনিক সং-অক্ট ২০০৭, দাম- ২৭০টাকা, পৃ- ৪৭)

এই কাজে সমাজের প্রবল বিরোধিতাও ছিল। আবার পেয়েছেন অনেক জায়গায় অকুণ্ঠ সমর্থন। প্রবল বিরোধিতা থাকলেও তিনি তা উপেক্ষা করেই স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে গেছেন। যে মেয়েরা সেদিন তাঁর কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা যাতে সমাজের কাজে আরও এগিয়ে যেতে পারে তার দিকে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত কাজ

করতেন। শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪), সুফিয়া কামালের জীবন তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ধন্য হয়েছে।

তবে তাঁর মনন শুধুমাত্র নারীর মুক্তি আন্দোলন কিম্বা সমাজ সংস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ছিলেন সচেতন অংশীদার। ১৯১৭ সালে কলকাতার অধিবেশনে আলী জননী বি আম্মা ও এনি বেশান্ত এসেছিলেন। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। রোকেয়া নিজে এনি বেশান্তের বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।[৮] রোকেয়া পরিচালিত এই সংগঠন স্বদেশী ও খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে মালেকা বেগম লিখছেন —

> রোকেয়া পরিচালিত নারী সংগঠন স্বদেশী ও খিলাফত আন্দোলনের সময়ে অনেক কাজ করেছে মুসলিম নারীদের মধ্যে স্বদেশী ভাবধারা প্রচারে এই সংগঠনের অবদান ছিল। 'চরকা' আন্দোলনের এই সংগঠনের সদস্যরা চরকা কেটে সুতা তৈরি করেছেন, বিলাতি দ্রব্য বয়কট করেছেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ছাত্রীদের শিক্ষা রুটিনে চরকায় সুতা কাটার ক্লাস, সপ্তাহে দু'দিন লেডিস পার্কে লাঠি খেলা শেখার ক্লাস চালু রাখা বাধ্যতামূলক করেছিলেন।[৯]

তাঁর রচনায় তাঁর এই স্বদেশ চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখি। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল দত্তের ফাঁসিমঞ্চে 'আত্মদান'-এর পর রোকেয়া লিখেছিলেন নিরুপম বীর কবিতাটি। কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন নীতির বিরোধিতা করে রচনা করেছিলেন 'আপীল' কবিতা। এরকম অনেক দৃষ্টান্তই তাঁর সাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। যদিও আমাদের গবেষণা গদ্য রচনাকে ভিত্তি করে, তাই তাঁর স্বদেশ চিন্তার প্রতিফলন গদ্য রচনা থেকেই অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

রোকেয়া ও তৎকালীন সমাজ

সেই সময় নারীর উপর পারিবারিক ও সামাজিক অবরোধের কদর্য চিত্র রোকেয়া-মানসে গভীর রেখাপাত করেছিল। প্রবল অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশবাসীর অশিক্ষা, মর্যাদাহীনতা, দেশময় অসাম্যের ক্ষতিকর প্রভাব; যা তাঁকে সমাজের

বিধিনিষেধ ও রক্তচক্ষুর ঊর্ধ্বে সমাজ সংস্কার ও নারীশিক্ষা প্রসারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর কথায় —

> যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতোখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা অপমান কিছুতেই তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, মাথার খুলিকে এতটাই পরিমান মজবুত করিয়া লইতে হইবে, যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্র বিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।[১০]

রোকেয়ার রচনাতেও ঠিক এই মননকেই প্রতিফলিত হতে দেখি আমরা। দেখি ভারতীয় সমাজের পশ্চাৎগামীতা ও তার বিরুদ্ধে মহৎপ্রাণ রোকেয়ার মরণপণ সংগ্রামকে। জনাব মোহম্মদ মেহেদী হাসান তাই যথার্থই বলেছেন —

> রোকেয়া ঔপন্যাসিক নন; প্রধানত প্রাবন্ধিক। তিনি কলা কৈবল্যবাদী ছিলেন না। তিনি কাহিনি সাজিয়েছেন সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য।[১১]

রোকেয়ার রচনায় তৎকালীন সমাজ প্রগতির চিন্তা

রোকেয়া ছিলেন সমাজ রাজনীতি সচেতন একজন মানুষ। আবার তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল নারীমুক্তির স্বপ্নে বিভোর। তাই নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য, নিপীড়ণ তাঁর রচনায় অনেকাংশ জুড়েই আছে। কিন্তু তাঁর রচনায় সুস্পষ্টভাবে তাঁর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজের কদর্যতাকে নানান প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। বাঙালির বীরত্ব ও আত্মমর্যাদার অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। 'নিরীহ বাঙ্গালী' প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। বীরত্ব আর মর্যাদার অভাবের কারণেই যে কাজটি করে সে কাজটিও মনোযোগ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে করে না। ফলে ব্যবসা কৃষিকাজ উভয় ক্ষেত্রেই বাঙালি পশ্চাৎপদ। তার কোমল শরীরে পরিশ্রম সহ্য হয় না। তাই স্বল্প পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন হয় এমন কাজ সে পছন্দ করে। তাতে অনৈতিকতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। এ প্রসঙ্গে 'রায় বাহাদুর', 'খাঁ বাহাদুর' উপাধিধারী ইংরেজের

তাঁবেদার গোষ্ঠীকে বিদ্রুপ করেছেন।[১২] তার এই আলস্য প্রীতির জন্য দুর্ভিক্ষ মহামারীতে আমেরিকায় মত দেশ থেকে সাহায্য ওরফে ভিক্ষা চাইতেও কুণ্ঠিত নয় বাঙালি।

বিদ্রুপ করেছেন পুরুষতন্ত্রের সৃষ্ট আত্মমর্যাদাহানিকর পণপ্রথাকে। ছেলের পাশের বিনিময়ে মেয়ের বাবার কাছ থেকে অর্থ উপার্জনের নির্লজ্জ লোভকে তিনি আঘাত করেছেন।[১৩]

রোকেয়ার স্বদেশচিন্তার প্রতিফলন পাই 'চাষার দুক্ষু', 'এণ্ডি শিল্প' 'জ্ঞানফল' 'মুক্তিফল', *পদ্মরাগ* প্রভৃতি রচনায়।

পদ্মরাগ উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের নির্মম দিক। নীলকর সাহেব রবীনসনের সংলাপে সেই ঘটনা চিত্রিত হয়েছে —

> আমি চুয়াডাঙ্গায় অনেকদিন নীলের চাষ করিতেছিলাম। কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। ... ...কত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছি, সংখ্যা নাই।[১৪]

অথচ এই রবীনসন জয়নবের দাদা মহম্মদ সোলেমান ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করলেও তার শাস্তি হয় না। ভারতীয় ব্যারিস্টার লতিফ তাঁর পক্ষে দাঁড়ান। রবীনসনের ভাষ্যে —

> ব্যারিস্টার লতিফ আমার অভিসন্ধি অবগত হইয়া খুব উৎসাহের সহিত জয়নবকে আসামী সাজাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।[১৫]

নীলকর সাহেবের এই ঔপনিবেশিক শোষণের পাশাপাশি একজন ভারতীয়ের এই ধরণের বিশ্বাসঘাতকতাকে তুলে ধরেছেন রোকেয়া *পদ্মরাগ* উপন্যাসে।

'মুক্তিফল'(১৯০৭) নামক রূপকথাধর্মী গল্পে কাঙ্গালিনী নামক রোগজর্জর মাকে তিনি দেখিয়েছেন। তার এক সন্তান বিদেশি আদব কায়দা, বিদেশি পন্য ব্যবহারে গর্বিত। আর সন্তান তা ব্যবহার করতে পারে না কিন্তু ব্যবহারের আশায় থাকে, আবেদন নিবেদন নীতিতে বিশ্বাসী। এক সন্তান অন্যের নিন্দা করে বেড়ায়। আর এক সন্তান মা এর কষ্ট

নিরসন করতে চায় কিন্তু সে নিতান্তই ছোটো। মায়ের দৈন্যদশা আর রোগাক্রান্তা হওয়ার মূল কারণ অভিশাপ। কারণ তিনি মেয়েদের অবহেলা করে ছেলে সন্তানদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় কৈলাশ পর্বত থেকে অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে মুক্তিফল এনে দিতে হবে। অন্য সন্তানরা স্বার্থের ছলনায় পড়ে নিরস্ত হয়। কিন্তু নবীন চেষ্টা করেও অসফল হয়। শেষপর্যন্ত দুই মেয়ে শ্রীমতি ও সুমতি ঘরের সমস্ত বাঁধন ও বিধিনিষেধ কাটিয়ে মুক্তিফল অর্জনে বেরিয়ে পড়ে। মায়ের আশা এবার ঠিক তিনি অভিশাপ মুক্ত হবেনই।

রূপকথাধর্মী এই গল্প আসলে একটি রাজনৈতিক সামাজিক চেতনার কথা বলে। রোকেয়া নিজে মতিচূর দ্বিতীয় খণ্ডের ভুমিকায় লিখছেন—

> "মুক্তিফল" বিগত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেসের ভঙ্গের পর রচিত হইয়াছিল।[১৬]

কাঙ্গালিনী মা আসলে দেশমাতা। তার দৈন্যদশার মূল কারণ সমাজের এক অঙ্গ নারীকে অবহেলা করে শুধুমাত্র পুরুষকে সমস্ত কিছুতে নির্ভর করা। আর সেই নির্ভরযোগ্যরাই স্বার্থপরতা অকর্মন্যতার স্বীকার। তাদের বিলাসিতাতে আছে বিলাতি জিনিসের প্রতি প্রভূত প্রীতি। আর সন্তান প্রবীনের মধ্যে কংগ্রেসের আপোসকামী ধারার দিকটি দেখিয়েছেন। যে আবেদন নিবেদনে কাজ উদ্ধার করতে চায়। মুখে দেশ উদ্ধারের কথা বলে কিন্তু বিলাতি পন্য ব্যবহারের জন্য লালায়িত। আর নবীন এ সবের বিরুদ্ধে কতিপয় প্রতিবাদী মানুষের প্রতিনিধি। যে সত্যিই দেশমাতাকে ভালোবাসে। যার হাতে থাকে স্বদেশি অস্ত্র। এসব অনুসঙ্গ আসলে ১৯০৭ সালে কংগ্রেসে 'চরমপন্থী' ও 'নরমপন্থী' ধারার রাজনীতির বিভাজনের দিকটি তুলে ধরে। আর সশস্ত্র বিপ্লববাদের পক্ষে রোকেয়ার আন্তরিক সমর্থনের দিকটিও স্পষ্টতই ধরা পড়ে।

রোকেয়া দেশবাসীর নিজস্ব শিল্প অর্থনীতিতে সচেতন নির্ভরশীল হওয়ার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর লেখা 'এণ্ডি শিল্প'(১৩২৮), 'চাষার দুক্ষু'(১৩২৮) প্রবন্ধে সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্বেগ ধরা পড়ে।

কৃষক সমাজের প্রতি রোকেয়ার গভীর ভালোবাসার সন্ধান পাওয়া যায় 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে। সভ্যতা অনেক অগ্রসর হয়েছে, কল-কারখানার আয়ে আরাম আয়েস বেড়েছে। কিন্তু 'সমাজের মেরুদণ্ড' যারা, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। অনেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা বলেন। কিন্তু রোকেয়া মনে করেন তা অজুহাত মাত্র। কারণ পঞ্চাশ বছর আগে যখন নাকি বাজার মূল্য তুলনায় সস্তা ছিল তখনও তাদের দুবেলা দুমুঠো খাদ্যের সংস্থান করা দায় হত। আজও তাই। রোকেয়া লিখছেন —

> ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই — এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধাসনে থাকে।[১৭]

গ্রামীন অর্থনীতির আপাত স্বনির্ভরতা ভেঙে কিভাবে আধুনিক অর্থনীতির বাজার নির্ভরতা সর্বগ্রাসী হচ্ছিল তা তিনি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। এর ফলে গ্রামীন শিল্প, কৃষকের স্বাচ্ছন্দ্য ধ্বংস হচ্ছে তাও তিনি তুলে ধরেছেন। গ্রামীন কৃষি নির্ভর রেশম শিল্প ধ্বংসের ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক দূর্দশা তাঁকে ব্যথিত করেছে। তিনি দেশীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য। তিনি নিজেও এই শিল্পের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তা জানা যায়, মোহসেনা রহমানের আমন্ত্রণের উত্তরে ২৮.১১.৩১ সালের এক পত্রে তিনি জানান। সময়ের অভাবে তাঁর পক্ষে যাওয়া কঠিন, কিন্তু স্থানীয় মানুষদের এণ্ডি পোকা চাষের ব্যবস্থা করে দিলে তিনি সময় বের করেও নিশ্চিৎ যেতে পারবেন।

> তুমি যদি এণ্ডি পোকা পোষার কোন ব্যবস্থা করে দিতে পার; স্থানীয় লোকেরা এণ্ডি পোকা পুষতে রাজী হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চয় তোমার ওখানে একবার যাওয়ার চেষ্টা করব।[১৮]

উল্লেখ্য এই সময় রোকেয়া নিজে ভীষণ অসুস্থ। বারবার হাওয়া বদলে যেতে হচ্ছে। সে সময়ও তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতির কথা ভাবছেন।

'এণ্ডি শিল্প' প্রবন্ধে এই শিল্পের অগ্রগতির কথা ভেবে যথার্থই বলেছেন- সে সময় যে স্বদেশীকতার আবহাওয়া ছিল তার হাত ধরেই এই দেশীয় শিল্পগুলির পুনর্জ্জীবন সম্ভব। না হলে যেমন, চা, নীল প্রভৃতিতে ইংল্যান্ডের অর্থ বিনিয়োগ হয়ে স্থানীয় স্বনির্ভর কৃষকরা তাদের গোলামে পরিণত হয়েছিল তেমনি এণ্ডি রেশম শিল্পে সেই অবস্থা হবে। একদিকে স্থানীয় চাষী, তন্তুবায়রা যেমন তাদের বাঁধা মুজুরে পরিণত হবে, সেই সাথে এই শিল্পের যাবতীয় লভ্যাংশ চলে যাবে দেশের বাইরে। অর্থনীতির এই দিকটি রোকেয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

রোকেয়া রচনায় সম্প্রীতি ভাবনা

রোকেয়া মানসে এমন এক সমাজের স্বপ্ন ছিল যা কোনও ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে না। তুলে ধরে মানুষকে। যেখানে সব ঈশ্বর আসলে এক। মানুষের প্রতি এই অগাধ ভালোবাসা তাঁর রচনাবলীতে পাই। তার সাথে তাঁর জীবন চর্যার মধ্যেই যে সম্প্রীতির অতলান্ত সুরটি বাঁধা ছিল তা আমরা জানতে পারি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলেই ধর্মীয় বিভেদমুক্ত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দান হত। সুফিয়া কামাল লিখছেন—

> এই রকম শিক্ষা দিতেন উনি যে মানুষ হিসেবে সবাইকে দেখবে। হিন্দু না, মুসলমান না, খ্রীষ্টান না, কিছু না। মেথর না, চামার না, সব মানুষ। উনার ঘর যে ঝাড়ু দিত, বাগান সাফ করত ওই জমাদারদের মেয়েকে বউকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বলতেন, ওরাও ত মানুষ।[১৯]

পদ্মরাগ –এর 'নিবেদন' অংশেও আমরা তাঁর লেখনীতে সেই বক্তব্যই পাই

> ধর্ম একটি ত্রিতল অট্টালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু ব্রাহ্মন, শুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান,— সিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানান সম্প্রদায়; ঐরূপ খ্রীষ্টান,— রোমান—কাথলিক—প্রোটেস্টান্ট ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিতলে উঠিয়া দেখ,— একটি কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু কিছুই নাই—সকলে এক প্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ।[২০]

তারিণী আশ্রমে রোকেয়ার এই চিন্তাকেই মুর্ত হতে দেখি—

> কি সুন্দর সাম্য !— মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলে যেন এক মাতৃ-গর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছেন।[২১]

আমরা দেখি মুসলমান ঘরের মেয়ে সিদ্দিকার সাথে একই বিছানায় থাকতে সৌদামিনীর কোনও সমস্যা হয় না। একই ভাবে অসুস্থ লতীফের সাথে আশ্রমের ভগিনীদের সম্পর্ক যে মাত্রা অর্জন করে তাও সাম্যের এই ছবিই তুলে ধরে। যেন ধর্ম-জাত-পাতের বন্ধন তারা কোনও উচ্চ আদর্শের বলে ছিন্ন করেছে। তারিণী আশ্রম শুধু সাম্প্রদায়িকতাকেই নয় আঞ্চলিকতাকেও পরাস্ত করেছে।

> তারিণী ভবনে যেমন নানা জাতি, নানা ধর্ম, এবং নানা শ্রেণীর লোক আছে, সেইরূপ নানা দেশেরও পরিচারিকা.. .. ভুটিয়া, নেপালী, বেহারী, সাঁওতাল, কোল, মাদ্রাজী ইত্যাদি আছে।[২২]

সাম্যের এই মহৎ ধারণা আমাদের আরও আপ্লুত করে যখন আমরা দেখি—

> সায়াহ্ন উপাসনার সময় রাফিয়া ও কোরেশা তারিণীর শতরঞ্চির উপর নামাজ পড়িলেন।[২৩]

এই মহৎ চর্চার মধ্য দিয়েই তারিণী আশ্রমের নানা ধর্মের সদস্যরা এক সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে যুক্ত থাকেন।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রোকেয়া

রোকেয়া দেখেছেন কুসংস্কারে আবদ্ধ একটা জাতি কিভাবে আধুনিক পৃথিবীর যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত। আরও বঞ্চিত সেই দেশের মেয়েরা। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ব্যক্তিজীবনে ছিলেন আপোসহীন। কুসংস্কারের চিত্র আমরা পাই 'আফতাব বেগ'[২৪] প্রসঙ্গে। স্বামীর নাম মুখে না আনার যে প্রচলিত সংস্কার আজও সমাজে লালিত হচ্ছে তারই এক হাস্যকর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি এই পরিচ্ছেদে। পর্দা প্রথার মর্যাদা দিতে গিয়ে আধুনিক সমাজ ও তার যাবতীয় সুফলকেও অবহেলা করছে এ দেশের মানুষ —

> দেখ তোমরা মটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়াছ, সে জন্য এখনই আমার সামনে তওবা কর, জীবনে আর কখনও মটরে উঠিতে চাহিবে না।[২৫]

মানবমস্তিষ্কের যে স্বাভাবিক ক্রিয়া মানবমনের যে স্বাভাবিক চেতনাপ্রবাহ তাও যেন দেশজ সংস্কারে জলাঞ্জলী দিয়েছে এদেশের মানুষ। লেখক গভীর উদ্বেগে বলেছেন —

> সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে।[২৬]

এই সব কুপ্রথা আমাদের এতটাই অন্ধ ও সংস্কারের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে যে, সংস্কারের কাছে আমরা করেছি যুক্তিহীন আত্মসমর্পন।

> আমাদের পীর সাব বলিয়াছেন যে, কোরান শরীফের মানে পড়িলে বা মানে বুঝিতে চাহিলে বে-আদবী হয়, আর ইমান যায়।[২৭]

এই অজ্ঞতার একমাত্র ভিত্তি অন্ধতা ও বিশ্বাস। বিশ্বাসের মাত্রা এতটাই যে —

> তাহারা হাদীসের অতি অস্পষ্ট কিম্বদন্তীও অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। কবে কোন কাফের জিহ্বা চাঁচিয়া কুল্লি করিয়াছেন, সেইজন্য সে বাড়ির কেহ মুখ ধুইবার সময় জিব-ছোলা দ্বারা জিব পরিষ্কার করেনা। ....শরিয়তের অতি তুচ্ছ কিম্বদন্তীও তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। তাঁহার মতে মানুষের ফটো তোলা ভয়ানক পাপকার্য্য।[২৮]

এই প্রবল ধর্মান্ধতা বেগম রোকেয়াকে পীড়িত করেছে। পীড়িত করেছে মানুষের দ্বিচারিতা, সমাজ প্রগতির মুখোশকে। অনেকে মুখে সমাজ প্রগতির কথা বলেন। ভূয়ো পর্দা প্রথার নিন্দা করেন। কিন্তু কাজে করে দেখান না। ১৯৩১ এর ১৬ জুন খান বাহাদুর তসদ্দককে লেখা পত্রে এ সম্পর্কে তাঁর আক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে তাই এই অন্ধতা ও দ্বিচারিতার প্রশ্রয়ে গড়ে উঠেছে মোল্লা তন্ত্র ও ধর্ম-ব্যবসা।

পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, জাতপাতের বাছ-বিচার যে মানুষের কতটা গভীরে ছিল তাও তিনি দেখিয়েছেন তাঁর রচনায়। কিন্তু এই প্রবল

ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের বিরুদ্ধতায় তাঁর উদার গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মনটির সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রচনায়।

নারীরা পুরুষের অধীন থাকবে এটা নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ধর্মগ্রন্থে তাই নির্দেশ। রোকেয়া 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বলছেন ধর্মগ্রন্থ কি বলছে তার থেকে বড় সাধারণ বুদ্ধি কি বলছে। অর্থাৎ ধর্মের বিধানের চেয়ে ব্যক্তির স্বকীয় মতটিই বেশি মূল্যবান।[২৯] এই প্রবন্ধটি ১৯০৪ সালে যখন 'আমাদের অবনতি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল তখন ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল আরও সোচ্চার। তিনি বলছেন —

> আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোনও ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন— রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে![৩০]

রোকেয়া এই প্রবন্ধেই বলছেন, ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি-ব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। যদি মুনি বিধান না দিয়ে মুনি পত্নী বিধান দিতেন তাহলে হয়ত অন্যরকম বিধান হত মেয়েদের জন্য। যদি ঈশ্বরের বিধান হত মেয়েদের অবনত রাখা তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মেয়ের জন্যই তাই হত। তিনি লিখছেন—

> যদি ঈশ্বর কোন দূত রমনী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন ? আমেরিকা এবং সুমেরু এবং কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া রমণী জাতিকে নরের অধীনে থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন ? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?[৩১]

তাঁর বিজ্ঞান মনস্ক মন কত উন্নত ছিল তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু সুন্দর গৃহিনী কেমন হবেন, শিশুকে কিভাবে বড় করতে হবে তা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তার স্বরূপটি বোঝা যায়।

ভারতবর্ষে এত শিশু চিকিৎসা এবং উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে প্রতিবছর মারা যায়। তার প্রতিকারের জন্য রোকেয়া লিখেছেন 'শিশু পালন'(১৯২০)[৩২] নামক প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধে শিশুর মানসিক, শারীরিক সুস্থতার জন্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তৎকালীন পরিবারগুলিতে হাঁস-মুরগি- ছাগল-পায়রা সহ অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন রোকেয়াকে পীড়িত করেছিল। তাই 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে তিনি দেখাচ্ছেন- সন্তান প্রতিপালন, রন্ধন, পশুপালন, পোশাক তৈরি, পরিজনের সেবা শুশ্রূষা সব কিছুর জন্যই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া দরকার। তিনি বলছেন—

> এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপ তত্ত্ব (Horticultre, Chemestry, Theory of heat) শিখিতে হয়।[৩৩]

পরিবার পরিজনদের অসুস্থতায় সেবা করার জন্য নার্সিং এর জ্ঞান থাকা দরকার। এমনকি গৃহিণীদের জন্য তিনি জেনানা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন।[৩৪]

লেখক তুলে ধরেছেন নারী ও পুরুষের অসাম্যের নিদারুণ ছবি। পুরুষ মাত্র সে নারী অপেক্ষা উন্নত, এবং তাকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি তার করুণার ভাব। তাও লেখক দেখিয়েছেন তৎকালীন সমাজে এক অভিভাবকের পাঠান চিঠিতে—

> আপনি মেয়ে মানুষ, তাই কিছু বললাম না। ..... মেয়েলী বুদ্ধি লইয়া আর কত ভালরূপে কাজ করিবেন ? স্কুলের কর্ম নির্বাহক সভায় যদি কোন পুরুষ থাকিত তবে দেখিতেন, স্কুল পরিচালনা কিরূপে হয়।[৩৫]

সমাজে পুরুষের উৎকৃষ্টতার স্বীকৃতি ও নারীর অবমাননাকর অবস্থানকে তিনি আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন 'দাসীপ্রথার' প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে। 'বলিগর্ত্ত'(১৩৩৪) গল্পে তিনি লিখছেন—

> ... ...ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আমলেও বহুদেশে "দাসী" আছে ? ঐ সব দাসী প্রকাশ্য হাটে বাজারে ক্রীত হয় নাই; ইহারা দরিদ্র প্রজার ঘর হইতে ছলে বলে কৌশলে ধরিয়া আনা দাসী।[৩৬]

যে নারী-পুরুষের অবস্থানগত বিস্তর ফারাককে তিনি দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়- আদর্শ হিসাবে সীতাকে অনুসরণ করতে বলা হয়। কিন্তু রোকেয়া বলছেন— সীতা রামের

কাছে পুতুল বই নন। পুতুলকে নিয়ে একটি ছেলে যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে ভালবাসতে পারে, কাদায় ছুঁড়ে দিতে পারে। কিন্তু পুতুলের বলার কিছু থাকে না। তাই রোকেয়া বলছেন—

> রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেন না, বুঝিয়া কার্য্য করিতে গেলে স্বামীত্বটা পূর্ণমাত্রায় খটান যাইত না; — সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইত না।[৩৭]

স্বামী শিক্ষিত হয়ে যখন চন্দ্র সূর্যের দূরত্ব মাপছেন তখন স্ত্রী বালিশের ওয়াড় সেলাই করবার জন্য তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপছেন। স্বামীর কল্পনা জগৎ যখন দূর আকাশে বিচরণ করে তখন স্ত্রী সংসারে চাল ডালের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত থাকে।[৩৮] শুধু তাই নয়— আদর্শ হিসাবে সীতাকে অনুসরণ করতে বলা হয়। রোকেয়া বলছেন এর ফলে একসময় স্বামীর একাকীত্বের ভার বেড়ে যায়। রোকেয়া বলছেন—

> উন্নতির পথে তাঁহারা(পুরুষ) দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন— আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন![৩৯]

সমাজে নারী পুরুষের এই বৈষম্য দূর করতে অনেক পুরুষই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সামিল হয়েছিলেন।

এইভাবে নানা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের বিবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বেগম রোকেয়া। পাশাপাশি এই সীমাহীন অন্ধকারের পরও মুসলিম জনজাতির আত্মন্নোতিতে বিতস্পৃহভাব তাঁকে বিস্মিত করেছে। 'তিন কুঁড়ে'(?) গল্পে তিনি লিখছেন —

> শুনতে পাই বাঙ্গালা মুল্লুকে নাকি প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এঁরা সেই তিন কুঁড়ে — নড়াচড়া, চলাফেরা কিছু করেন না; কেবল কুম্ভকর্ণের মত শুয়ে শুয়ে ঘুম পড়েন।[৪০]

রোকেয়া তৎকালীন সমাজে অন্ধতার যে নিদারুণ ছবি দেখেছিলেন তাকে নির্মূল করার সংগ্রাম ছিল তার। এই সংকল্পই সম্পৃক্ত হয়ে আছে রোকেয়া মানসে। রোকেয়া

উপলব্ধি করেছিলেন সমাজ সংস্কার করতে হলে চাই শিক্ষার বিস্তার। রোকেয়া মানসে যে গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব ছিল তা তাঁর রচনায় ধরা পড়ে। তাঁর শিক্ষা চিন্তাও ছিল এই আধুনিক যুগের দাবি মেনেই গণতান্ত্রিকরীতিতে। তিনি বুঝেছিলেন —

> মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষার ঔদাস্য।[৪১]

তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা করেছেন নারী শিক্ষার জন্য অন্যতম বিদ্যালয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল। এই স্কুলের সাথে তাঁর একাত্মতার চিত্র আমরা রোকেয়া পত্রাবলীতেই পাই। তিনি যখন এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন তখন "Mussalman" পত্রিকার সম্পাদক মুজিবর রহমানকে পত্রে লিখেছিলেন—

> I intend to start a Girls' school in Calcutta in strict observance of Purda at an earlist opportunity possible, which is not only the crying need of the time but the want of which, I believe, is keenly felt by all right thingking men and women.[৪২]

তিনি নিজে পর্দা মানতেন না। কিন্তু এটা ভালোভাবে বুঝেছিলেন পর্দা না করলে কোনও মুসলমান ঘরের ছাত্রীকে তিনি পাবেন না। তাই নিজেও কঠোর পর্দা করতেন আজীবন।[৪৩] (সুফিয়া কামাল, একালে আমাদের কাল, পৃ- ৪৮) এইভাবে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা দানের জন্য এই স্কুলকে নিয়ে কি কঠিন লড়াই তিনি করে গেছেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর পত্রগুলি। স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ভেবেছিলেন কিছু আর্থিক সাহায্য পাবেন সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কিন্তু তা পেয়েছেন কদাচিৎ। বরং এই স্কুল প্রসঙ্গে সমাজ ও সরকারের তীব্র উদাসীনতা তাঁকে ব্যাথীত করেছে—

> These are the people, who can not support a single female school but aspire to have a University. It is no wonder that government denied us the same because we do not deserve it. .... when such an important duty as the education of the females is neglected by the community in this sad manner ? [৪৪]

একদিকে সমাজের চাপ অন্যদিকে পারিবারিক পীড়ন। তাকে তুচ্ছ মনে করেই স্কুলের জন্য কাজ করে গেছেন। স্কুলের উন্নতি না হওয়ায় তিনি যতটা বেদনার্ত হয়েছেন তিনি স্বামী সন্তানকে হারিয়েও তা হননি। তিনি লিখছেন—

> I do not repent for leaving Bhagalpur, but at times I feel some sort of yearning to see the grave of my husband and the tiny graves of my babies. But never my mind. I am brave enough ti bear my cross. For this girls' and this school alone I left Bhagalpur. And it makes me unhappy when I see this school does not prosper as I wish. [৪৫]

কত কিছুর বিনিময়ে কি অপরিসীম ধৈর্য্য ও সমবেদনা ও স্বার্থত্যাগ দিয়ে এই স্কুলকে তিনি রক্ষা করেছেন তার দৃষ্টান্ত আছে মোহসেনা রহমানকে লেখা তাঁর পত্রে (২১।৫।১৯২৯) -

> তুমি কাসন্দ না দিয়া যদি স্কুল ফান্ডে চার পাঁচটা টাকা পাঠাতে তা'তে আমি বেশি সুখী হইতাম।[৪৬]

মরিয়াম রশীদের আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিতে না পেরে লিখছেন-

> এই যে স্কুল সংক্রান্ত রাশীকৃত office work এগুলো করবে কে ? সুতরাং বেহেস্তের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।[৪৭]

তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যের মধ্যে দুঃখ করছেন স্কুলটির জন্য নিজস্ব বিল্ডিং না হওয়ার জন্য[৪৮]।

তিনি মনে করতেন শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রয়োজন। তৎকালীন সময়ে বাংলার মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষাকে ব্রাত্য করে রাখার রেওয়াজ ছিল। রোকেয়া নিজেও বাংলা শিখেছেন অনেক বিরুদ্ধ পরিবেশে। তিনি তাঁর স্কুলে বাংলাকে সিলেবাসের মধ্যে রেখেছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি বাংলার মুসলমানদের অনাগ্রহ তাঁকে ব্যাথীত করেছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার সাত বছর পরও উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রী না পাওয়ায় বাংলা ভাষা শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন —

> It is beyond our means to have the responsibility of the Bengali section on our shoulders and to go on paying a mistress month after month for the sake of 2.5 girls only. We have therefore decided to abolish the Bengali branch from the beginning of January next. [৪৯]

তাঁর এই শিক্ষা চিন্তার সুসংহত রূপও আমরা দেখি *পদ্মরাগের* তারিণী আশ্রমের শিক্ষা পরিকল্পনায়।

> বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র সবই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্ম্মকে প্রাণের অধিক ভালোবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম—নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যত জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবত পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।[৫০]

বেগম রোকেয়া ও নারীমুক্তি

রোকেয়ার চিন্তায় নারীমুক্তি সম্পর্কে দুটি স্পষ্ট ধারণা ছিল। একদিকে দীর্ঘ দিনের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধানের নিগড়ে বাঁধা নারী জীবন। যা পুরুষতন্ত্র দ্বারা আরও আবদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে নারীর নিজস্ব মুক্তির জন্য নারীর নিজস্ব ভূমিকা কথা। তাই একদিকে দেখিয়েছেন— ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের নারী সমাজ-পুরুষতন্ত্র, মোল্লা ও পুরোহিততন্ত্রের দ্বারা কতটা পরিমান নির্যাতিতা। এরই সাথে দেখিয়েছেন বিচার ব্যাবস্থার পক্ষপাতদুষ্ট স্বার্থপরতাকে। অন্যদিকে দেখিয়েছেন নারীকে প্রথমে নিজেকে মানুষ হিসাবে ভাবতে হবে। এবং মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নিজেকেই নারীমনের সব পিছুটান কাটিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

নারীর জীবনের সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়ণের চিত্র পাই মূলত *পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী* 'নারী-সৃষ্টি' রচনাগুলিতে। *পদ্মরাগ* উপন্যাস আসলে তাঁর সংস্পর্শে আসা

মেয়েদের জীবন কাহিনী। এই উপন্যাসে বর্ণিত অনেক মেয়ের জীবন বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি।[৫১] (সুফিয়া কামালের, একালে আমাদের কাল, পৃ- ৪৪, ৪৬ লেখা উল্লেখ করতে হবে)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 'সৌদামিনীর আগুণ' শীর্ষক অংশে সৌদামিনীর জীবনের ট্র্যাজেডি আমরা দেখতে পাই। সন্তানহীনা সৌদামিনীকে প্রতিপদে অপদস্ত হতে হয় শশুরবাড়িতে। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী। সংসারে বিমাতা হিসাবেই তার আবির্ভাব। অথচ সমাজ বিমাতাকে মা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। এই পরিস্থিতিতে সৌদামিনীর স্বগতোক্তি —

> সেই দিনই বুঝিলাম জগৎ অন্ধ! আমার দুঃখ দেখিবার চক্ষু জগতের নাই। আমার যন্ত্রনা বুঝিবার কেহ নাই।[৫২]

সৌদামিনীর পাশিপাশি কোরেশা বি'র জীবনও সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি ওলাওঠায় তার সপত্নি সন্তানের মৃত্যুর ব্যাপারে পরিবারে তাকেই দায়ী করা হয়। কারণ কোরেসা বি বিমাতা, এবং তা এতটাই কদর্যতায় পৌঁছায় যে দীর্ঘ এগার বছর স্বামী তার প্রতি উদাসীনতা বজায় রাখে। এগার বছর পরে— তাঁহার কপাল ফিরিয়াছে। কারণ— এখন তিনি স্বয়ং পুত্রবতী হইয়াছেন[৫৩]

এখানেও আমরা দেখি নারীর মূল্য— শুধু পুত্র উৎপাদনে। তারিনী ভবনের অন্যতম ভগিনী রাবেয়া। তাঁর জীবন বৃত্তান্তও বড়ো নির্মম। তিনি ব্যারিস্টার পত্নী। ব্যরিস্টার দশ বৎসর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে রইলেন। স্বামী বিরহিনী রাফিয়া দশ বৎসর দুধের সর ও আম, না খেয়ে রইলেন। কারণ স্বামী দশ বৎসর ইংল্যান্ড এসব খেতে পাননি। অথচ স্ত্রীর ভালবাসার মর্যাদা দেওয়া তো দূর, সেই ব্যারিস্টার মেমকে বিয়ে করে ঘরে আনলেন। ডাকযোগে চাতুর্যের সাথে তালাক নামায় সই করিয়ে রাফিয়া বেগমকে নিঃস্ব করলেন তার স্বামী। রাফেয়ার এত কষ্ট স্বীকার, স্বামীর প্রতি তার এত ভালোবাসার কোনও মূল্য দেন নি তার স্বামী। আইনের নিখুঁত ও নির্মম বিধানে রাফেয়া বেগম সর্বস্বান্ত হলেন।

এরপর উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে হেলেনের প্রসঙ্গ। তার স্বামী অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত এবং নরহত্যার আসামী। বিচারালয়ের অদ্ভুত বিচারে হেলেন দণ্ডপ্রাপ্ত বাতুল স্বামীর সাথেই আবদ্ধ হলেন। বিচার ব্যাবস্থার ত্রুটির এই দিকটির ধরা পড়ে।

দেশ জুড়ে নারী জাতির এই অবমাননাকর পশুর অধম জীবন রোকেয়ার সমাজ সংস্কারমুখী মনকে নাড়া দিয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন দেশে এই অধঃপতিত নারী জাতিকে তুলে ধরার কেউ নেই। তাঁর কথায় —

> পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই।[৫৪]

সার কথা হল এই যে, নারীর সামাজিক অবস্থান পশুবৎ। যা একটি সুন্দর রূপক ব্যাবহারে রোকেয়া দেখিয়েছেন— নারী ক্লেশ নিবারনী সমিতির নাম প্রসঙ্গে রফিকার উক্তিতে—

> নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি ? এমন নাম ত কখনও শুনি নাই। পশু ক্লেশ নিবারনী সভা আছে জানিতাম।[৫৫]

এই ভাবে একে একে উঠে এসেছে সাকিনা ও ঊষার জীবন প্রসঙ্গ। সাকিনার বিয়ে হয়েছিল উদীয়মান উকিল আব্দুল গফুর খাঁ এর সাথে। অল্প বয়সে গফুরের চরিত্র দোষ ঘটে। বাড়ির পরিচারিকার সাথে তার প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। তার কথায় চোখে না দেখে সে সাকিনাকে অসুন্দর জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং নববধূ সাকিনার সমস্ত অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে গেছিলেন। সাকিনা পরে পত্র মারফৎ সে কদর্যতাকে তুলে ধরেছেন তার স্বামীর উদ্দেশ্যে—

> আপনার বেলা যারে সোন্দর কইব সেই সোন্দর হইব। সে আমাকে সোন্দর বলিয়া সার্টিফিকেট না দেওয়ায় আমার বিয়ে পাশ হয় নাই।[৫৬]

স্বামী প্রসঙ্গে ঊষার উক্তি— আমার তিনি কাপুরুষ।[৫৭] কারন, বাড়িতে ডাকাত পড়ায় তাকে একা ঘরে ফেলে তার স্বামী পাঁচিল টপকে পালিয়েছিল। ডাকাতেরা

ঊষাকেও লুটের অংশ হিসাবেই তুলে নিয়ে গেছিল। পরে অপরে তাকে উদ্ধার করলেও পরিবার আর তাকে গ্রহণ করে নি। তাই সমাজ সম্পর্কে ঊষার তীব্র কষাঘাত—

> যে কাপুরুষ আপন স্ত্রীকে রক্ষা না করিয়া জানালায় লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল, তাহার জন্য কোনও দণ্ড তোমাদের সমাজে নাই ?[৫৮]

গল্পে জয়নবের বিবাহ প্রসঙ্গেও একই অবিশ্বাস ও অমর্যাদার চিত্র পাই যখন দেখি বিয়ের আগেই তার সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ির জন্য লিখে দিতে তাকে চাপ দেওয়া হয়।

বিবাহ সম্পর্কে এ জাতীয় উদাহরণে তিক্ত হয়ে *পদ্মরাগে*-র হেলেন তাই বিবাহ মাত্রই নারীর অকল্যাণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বলে—

> আমার ভুক্তভুগী হৃদয় কাহারও বিবাহ সংবাদ শুনিলে স্বতই আশঙ্কায় কাঁপিয়া ওঠে।[৫৯]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, সমগ্র উপন্যাসে বঞ্চিত যে নারীদের জীবনকে রোকেয়া তুলে ধরেছেন, তারা কিন্তু শুধু কোনও একটি বিশেষ ধর্মের, বিশেষ দেশের নন। সমস্ত ধর্ম ও সমাজের মেয়েরাই আজ লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা। অথচ কোথাওই তাদের কোনও অধিকার নেই। *পদ্মরাগে* শাসকের দেশের হেলেন শাসিতের দেশের সৌদামিনী অপেক্ষা বেশি অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করছে না।

সমাজে নারীর অবস্থানের চিত্রটি আরও করুণ ভাবে উঠে আসে তাঁর অন্যতম প্রধান গ্রন্থ— *অবরোধ বাসিনী* তে। এই গ্রন্থের ৪৭ টি পরিচ্ছেদে পৃথক পৃথক ঘটনা ব্যাবহার করে রোকেয়া ভারতীয় সমাজে নারীর জন্য সৃষ্ট অবরোধের চরমতম কদর্যতাকে তুলে ধরে এর যুক্তিগ্রাহ্যতাকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিদ্রুপ—

> যিনি যত বেশি পর্দা করিয়া গৃহকোণে যত বেশি পেঁচকের মত লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন, তিনিই তত শরীফ।[৬০]

এই শরীফ হওয়ার মতলবে আস্ত নারী জাতিটাই পর্দার বেষ্টনীর আড়ালে সমাজচ্যুত জ্ঞানচ্যুত হয়ে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমগ্ন যেন। তেমনই চিত্র দেখি 'অন্ধ বোরকা' প্রসঙ্গে—

> ... ...হীরার বোরকায় চক্ষু নাই।... ... ...বোরকায় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমত হাঁটতে পারে না.....। হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর— এতটুকু বালিকাকে অন্ধ বোরকা পরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা করা হয় না ![৬১]

পর্দা প্রথার বাড়বাড়ন্ত এতটাই ছিল যে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত।[৬২] স্বয়ং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—

> পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত ; অমনি বাড়ীর কোনো লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণ-ভয়ে-যত্র-তত্র---কখনও রান্না ঘরের ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোনও চাকরানীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটীর অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।[৬৩]

পর্দা প্রথার আতিশয্যে বহু রমণীর প্রাণ পর্যন্ত গিয়েছে তবুও তারা পর্দার মহত্ম (!) কে অক্ষুন্ন রাখতে প্রাণপাত করেছে। এই প্রসঙ্গে লেখিকা তাঁর মামিশাশুড়ির মর্মান্তিক ঘটনা বলেছেন—

> মামানী সাহেবা অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকান্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফর্মের মাঝে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরানী ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোক ছিল না। কুলীরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরানী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল----- "খবরদার ! কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাথ দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন,--কোথায় তাহার 'বোর্কা'... ... ...আর কোথায় তিনি !"[৬৪]

অবরোধে হিন্দু সমাজও পিছিয়ে ছিল না—

> পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শাশুড়ি ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে ভীড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। ...

> ...। সেই ভদ্রলোককে দেখিয়া কনস্টেবল বলে, "তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।" তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন, আরে! এ কাহার বউ পিছন হইতে কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে। প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সে সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে— নিজের স্বামীকে সে কখনও ভালো করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতী ছিলো, তাহাই সে দেখিয়াছে। এই ভদ্রলোকের ধুতীর পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে।[৬৫]

পর্দা ও অবরোধ থেকে শিশু ও কিশোরীরাও রেহাই পেত না। স্বয়ং লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

> ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই ; অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়েমানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে।[৬৬]

অবরোধের বাড়বাড়ন্ত কখনও এতটা বেশি মাত্রা নিয়েছে যে তা হাসির উদ্রেক করে। যেমন—'মশারী যাত্রা', 'পাল্কীর গঙ্গাস্নান', 'পাল্কীর ট্রেনযাত্রা' প্রসঙ্গ আলোচনায়। অবরুদ্ধ জীবনেও মেয়েদের জন্য বহু বিধি নিষেধ ও আত্মসংযম বাধ্যতামূলক ছিল—

> সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ , উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফান ইত্যাদি সবই নিষেধ।[৬৭]

অথচ এই অবমাননাকর কদর্য অবরোধ ব্যাবস্থাকেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এ দেশের স্ত্রী জাতি তাদের আত্মগৌরব জ্ঞানে লালন পালন করছে। এমনকি অবরোধ রক্ষায় নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন এ দেশের নারী—

> এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাত বাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুণ নিভাইতেছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নিচে

> গিয়া বসিলেন।তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য ! কুল—কামিনীর অবরোধ।[৬৮]

এই যে প্রশ্নাতীত আনুগত্য এই যুক্তিহীন আত্মসমর্পণের মূলে কি ছিল ? ছিল গভীর অন্ধতা , বহু দিন ধরে লালিত কুসংস্কার। যাকে এ দেশের নারীরাও মেনে নিয়েছে। ধর্ম, সমাজ ও কূলমর্যাদার দোহাই দিয়ে। এরকম আনুগত্যের চিত্র আমরা পাই 'মাইয়াখানা' প্রসঙ্গে—

> আমার দুই নাতনীর বিবাহ একসঙ্গে হইতেছিল, সেই বিবাহের আমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নাতিনীদের ডাকনাম মজু ও সবু। বেচারীরা তখন মাইয়াখানায় ছিল। কলিকাতায় ত বিবাহের মাত্র ৫/৬ দিন পূর্বে 'মাইয়াখানা' নামক বন্দীখানায় মেয়েকে রাখে। কিছু অঞ্চলে ৬/৭ মাস পর্যন্ত এইরূপ নির্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েদের আধমরা করে।
>
> আমি মজুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না— সে রুদ্ধ গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। শেষে একদিন একটা জানালা একটু খুলিয়া দিলাম। দুই মিনিট পরেই এক মাতব্বর বিবি , 'দুলহিনকো হাওয়া লাগেগী' বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলাম। আমি সবুদের জেলখানায় গিয়া মোটেই বসিতে পারিতাম না। কিন্তু সে বেচারী ছয়মাস হইতে সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে সবুর হিস্টিরিয়া রোগ হইয়া গেল। এইরূপে আমাদের অবরোধে বাস করিতে অভ্যস্ত করা হয়।[৬৯]

যদিও সমাজের এই সমস্যাগুলি তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনি সেগুলি প্রতিকারের উদ্দেশ্যে উদ্যোগও নিয়েছেন। রোকেয়া মানসের এই দিকটি ফুটে ওঠে *পদ্মরাগ* উপন্যাসের 'তারিণী আশ্রমে'। তারিণী আশ্রম যেন লেখিকার মানসজগৎ। তাঁর স্বপ্ন। যে সমাজের স্বপ্ন তিনি বাস্তবে দেখতে চেয়েছিলেন তারই কল্পিত রূপ দেখি তারিণী আশ্রমে—

> যে বিধবার তিন কূলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে ?— তারিণী ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে ?.....

> তারিণী বিদ্যালয়ে। যে সধবা স্বামীর অত্যাচারে চূর্ণ বিচূর্ণ জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথা গমন করিবে ?... ঐ তারিণী কর্ম্মালয়ে। যে দরিদ্র দূরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে তাহারও আশ্রয়স্থল ঐ তারিণী আতুর আশ্রম।[৭০]

তারিণী আশ্রমে আশ্রয়লব্ধ নারী শুধু গলগ্রহ নন তারা স্বনির্ভর ।

> কর্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা—সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। তাঁহারা বিবিধ সূচীকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রী—পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী সেবা শিখেন। ফলকথা, এ বিভাগে রমণীগন আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।[৭১]

রোকেয়া মানসে নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার যে স্বপ্ন তাই যেন মূর্ত হতে দেখি তারিণী আশ্রমে। এ হেন স্বয়ম্ভর তারিণী আশ্রমের অধিবাসীরা শুধু আত্মদুঃখে নিমগ্ন নয়, সামাজিক দায়িত্ব পালনেও তাঁরা সমান উদ্যোগ নিয়েছেন—

> দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ এবং রোগী সেবা করিতে গিয়া থাকেন।[৭২]

তারিণী ভবনের ভগিনীদের পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও আড়ম্বরতার কোনও ঘটা নেই। এমনকি অলঙ্কার পর্যন্ত নেই।

> অলঙ্কারের আড়ম্বর কাহারও নাই; কাহারও কাহারও হাতে বলা কিংবা শাঁখা আছে মাত্র। অলঙ্কার নাই, বিলাসিতা নাই—কেবল যেন সরলতা এবং উদারতায় ভূষিতা।[৭৩]

লেখক নিজেও অলঙ্কারকে দাসত্বের চিহ্ন বলে মনে করতেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা *মতিচূর(১৯০৭)* প্রথম খণ্ডতে এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আমরা পড়েছি। সেই চিন্তাই আমরা আবার পাই তাঁর উপন্যাস *পদ্মরাগ*—এ। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে 'মরীচিকা' শীর্ষক অংশে অলঙ্কার প্রসঙ্গে আলোচনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

> এক দিন তিনি (লতিফের মা) সিদ্দিকার হাত ধরিয়া বলিলেন—‘ একি মা; তুমি হাতে দু-গাছি চুড়ি পর্যন্ত রাখ না, বড় বিশ্রী দেখায়।’ তারিণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, ‘সুশ্রী দেখান ত বাঞ্ছণীয় নহে। এখানে কয়েকজন হিন্দু মহিলা আছেন, তাঁহারা কুসংস্কার বশতঃ শাঁখা ছাড়িতে পারেন নাই।[৭৪]

এখানে লক্ষ্যণীয় কুসংস্কার দূর করতে জবরদস্তিও নেই। এই গণতান্ত্রিক ধাঁচাই তারিণী আশ্রমের ভিত্তি। যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সাম্যের ধারণা ও তার প্রয়োগ।

এ ব্যাপারে তারিণী আশ্রম যে সার্থক, তার প্রমাণ আমরা পাই—আশ্রমের ভগিণীদের জীবন চর্চ্চা দেখে। ভিন্ন জীবনবোধ চর্চ্চা না করলে সিদ্দিকা, সাকিনা, বিভার মতন অনন্য চরিত্রগুলি তৈরী হল কি প্রকারে ? এই চরিত্রগুলির রুচীর কাঠামোর মধ্যেই আমরা নারীমুক্তি আন্দোলনের বীজ যেন দেখতে পাই। যখন দেখি সাকিনা তার স্বামীকে পত্র মারফত জানিয়ে দেয়—

> আপনার সহিত ইহজীবনে আমার মিলন অসম্ভব। আপনি একটি পরিচারিকার কথায় আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন,.....এ অপমান,—আমার মতে সমস্ত নারীজাতীর প্রতি অপমান।[৭৫]

পণপ্রথার বিরুদ্ধে সৌদামিনীর বক্তব্য—

> কণ্যা পণ্যদ্রব্য নহে, যে তাহার সঙ্গে মোটরগাড়ি ও তেতালা বাড়ি ফাউ দিতে হইবে।[৭৬]

অথবা আমরা যখন সিদ্দিকাকে লতীফের ভালোবাসার আবেদনের বিনিময়ে বলতে শুনি—

> তুমি এ বিশ্ব-প্রেমিকার নিকট— এক পয়সা, না, — এক পাই পরিমিত স্নেহের অধিক আশা করিতে পার না। কত ‘পথে কুড়ান’ লোকের কথা আমাকে ভাবিতে হয় !’[৭৭]

কিংবা পুরুষতন্ত্রের অনৈতিক প্রভাব ও একপেশে বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সিদ্দিকার বক্তব্য—

> আমরা কি মাটির পুতুল, যে পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন ?... ... অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব... ...। একমাত্র বিবাহিত জীবন নারী জীবনের চরম লক্ষ্য নহে... ...[৭৮]

রোকেয়া সারাজীবন ধরে এটাই চেয়েছেন নারীরা নিজ শক্তিতে 'মানুষ' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। বাবার, স্বামীর কিম্বা সন্তানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের জীবন নিজেরই মত গড়ে তুলুন। তারজন্য তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য দরকার। একজন পুরুষ যা করতে পারে একজন নারী তা করতে পারে। সেজন্য যা করা দরকার তাই করবে মেয়েরা—

> যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিস্ট্রেট, লেডিব্যারিস্টার, লেডিজজ— সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[৭৯]

তবে নারীকে এমন বলিষ্ঠ হতে গেলে তার নিজস্ব মননের দীর্ঘদিনের সংস্কারকে আগে দূরে সরাতে হবে। রোকেয়ার মত ছিল তাই। তাই তিনি বারবার নারী মনের দাস্যের ভাব (enslaved) কে বিদ্রুপ করেছেন। 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলছেন ভারতবর্ষের মেয়েদের অবস্থা ভিক্ষুকের মত।—

> আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের,— প্রকারান্তরে পুরুষের— দাসী হইয়াছি। ক্রমশ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।[৮০]

আত্মসম্মান রক্ষার প্রচেষ্টা ক্রমে লোপ পাওয়ায় তার নিজের কদর নিজেরই কাছে নেই। তাই ভীরুতা অতলে তলিয়ে গেছে তারা। তাই সামান্য জোঁক, আরশোলা, কীট পতঙ্গ দেখে ভীতবিহ্বল হয়! মুর্ছিতা হয়। মানসিক এই ভীরুতার সাথে সাথে নারীর শারীরিক অক্ষমতার কথা বলেছেন। নারী যেন জড়পিণ্ড। তার আপাদমস্তক শের শের

অলংকার চাপানোর ফলে- শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।[৮১] তিনি নারীর অলংকারকে দাসত্বের চিহ্ন বলে মনে করেন।

> গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে নোলক পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে 'স্বামী"র অস্তিত্বের(সধবার) নিদর্শন। অতএব দেখিলেন ভগিনি! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যাতীত আর কি হইতে পারে? আবার মজা দেখুন যাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যা গণ্যা![৮২]

তবে অনেকেই অলঙ্কারকে দাসত্বের চিহ্ন বলতে নারাজ। সৌন্দর্য্যবর্ধনের উপায় বলে মনে করেন। এই কৃত্রিম সৌন্দর্যবর্ধনকেও রোকেয়া মানসিক দূর্বলতা বলে মনে করেন।—

> যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দূর্ব্বলতা নহে?[৮৩]

তিনি নারীদের কাছে আবেদন করেছেন তারা নিজের মানব সত্তাকে চিনুক। অলঙ্কারে কোনও গৌরব নেই তার।—

> ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন— অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! আমরা অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্য্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক।[৮৪]

রোকেয়া মনে করেন নারী মনের এ সমস্ত দূর্বলতা কাটানো সম্ভব প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে। শিক্ষা শুধু বই পুস্তক নির্ভর নয়। সমস্ত ধরনের শিক্ষা। তাতে দরকার হলে শারীরিক শিক্ষাও চাই।—

> শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশ্রয়।[৮৫]

এহেন তারিণী ভবনের মধ্যে আদর্শ সমাজের স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছেন রোকেয়া। লতীফের বক্তব্যে তা পাওয়া যায়—

> যদি স্বর্গ নামে কোনও স্থান থাকে তবে এই স্বর্গ।[৮৬]

নারীমুক্তি সমাজ প্রগতি আন্দোলন ও সমাজের বিরুদ্ধতা

সমাজ প্রগতি বা নারীমুক্তির মতন এতবড় সংগ্রাম নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় কখনই সম্পন্ন হয় না। ইতিহাস তার সাক্ষী। পুরাতন সমাজকে নাড়া দিতে গেলেই আলোড়ন ওঠে। সমাজ কাঠামো ও কৌলি ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে সমাজপতিরা কোলাহল করেন। এই মিথ্যা কৌলিণ্য প্রথার ভড়ঙে নারী শিক্ষা, নারী মুক্তির মতন আবশ্যক বিষয়গুলির কণ্ঠরোধ করতে পিছপা হয় না মুসলিম সমাজও।

> মূর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কণ্যা বধ করিত। যদিও ইসলাম ধর্ম্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারন করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অম্লান বদনে কন্যাদের মন, মস্তিস্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যপি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলীণ্যের লক্ষণ মনে করেন।[৮৭]

রোকেয়া বহুবার নারীমুক্তি আন্দোলনে এ বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর রচনায় সমাজমুক্তি আন্দোলনের এই দিকটিকেও উল্লেখ করে গেছেন তিনি।—

> আম্মা আমার এখানে আসায় ঘোর আপত্তি করেন, বলেন—তারিণী-ভবনে পর্দা নাই।[৮৮]

আর পর্দ্দা নেই বলে বানুর আম্মা তারিণী ভবনের কর্ণধার মিসিস সেনকে 'বেশ্যা' বলতেও কুণ্ঠিত হন না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারিণীর মন্তব্য—

> ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা ত আমাকে স্পষ্ট "----" ই বলে; মুসলমান সমাজ এখন পর্যন্ত আমাকে তত ভালোবাসেন না।[৮৯]

এই বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে লেখক নারী ও নারীমুক্তি প্রসঙ্গে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীকেও তুলে ধরেছেন। শুধু সমাজ, ধর্ম নয় পরিবার পরিজনদের দ্বারাও প্রতিপদে আর্থিকভাবে এবং আরও বিভিন্নভাবে অপদস্থ হতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর চিঠি পত্রে এই অবস্থার কথা জানা যায়।

কিন্তু সমাজ যাই বলুক, মুক্তি পথিক কখনও তার দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত সংকল্প তার অটুট থাকে। যেমন *পদ্মরাগে* তারিণী বলেন,—

লোকে ওরূপ বলিয়াই থাকে; ও-সব কথা ধর্ত্তব্য নহে।[৯০]

কারণ সামাজিক অব্যবস্থা ও অপূর্ণতার বিরুদ্ধে যিনি সংগ্রাম করেন, তাঁকে মামুলি কথায় ভেঙ্গে পড়ে পথ ছেড়ে দিলে চলে না। তিনি জানেন দ্বায়িত্ব তাঁরই বেশি—

যে যত বড় হয়, তাহার দায়িত্ব তত বেশি। সে তত অধিক গালি শুনে।[৯১]

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এই আদর্শ আজীবন রোকেয়া তাঁর নিজের জীবনেও পালন করে এসেছেন। তাই দেখতে পাই এতদিন যে স্কুলকে সরকার অবহেলা করে এসেছে তাঁর মৃত্যুর ঠিক সাড়ে সাত মাস আগে তার নাম পরিবর্তনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। স্কুলের নতুন নামকরণ হয় "Government H. E. School for Muslim Girls" [৯২]। তাঁর স্বামীর স্মৃতিতে নির্মিত এই স্কুলের নতুন নামকরণে তিনি আপত্তি করেননি ঠিকই কিন্তু ব্যথা পেয়েছিলেন অনেক। মূলত মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুল তৈরি করলেও অন্য ধর্মের ছাত্রীদের জন্য বাধা ছিল না। এং তাঁর স্বামীরও ইচ্ছা ছিল না কোনও ধর্ম উল্লেখের।

পরিশেষে বলতে হয়, রোকেয়া রচনার নানা দিক নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় নারীমুক্তি ও সমাজপ্রগতির যে চিত্র আমরা পাই তার আবেদন যতটানা রস সৃষ্টিতে তার থেকেও বেশি সমাজ সংস্কারে, যা বাস্তবে রোকেয়া মানসেরই প্রতিচ্ছবি। তাই সাহিত্যস্রষ্টা রোকেয়া সমাজ সংস্কারক রোকেয়া যেন কোনও অভিন্ন সত্তা নন। তাঁরা একে অপরের পরিপূরক। তাঁর সর্বান্তকরণ জুড়ে এ দেশের ও এ দেশের মেয়েদের উদ্ধার করবার যে ভাবনা তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশের নারীদের কিভাবে উন্নতি হওয়া সম্ভব তার পরিকল্পনা রচনা করে গেছেন।[৯৩] ক্ষণজন্মা এই মহীয়সী মৃত্যুর মুহূর্তে রেখে গেছেন এক দীর্ঘ যাত্রাপথ ও বলিষ্ঠ পথযাত্রীদের। যাঁদের কর্মপ্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছে তাঁর স্বপ্ন। রোকেয়ার গড়ে দেওয়া যাত্রাপথের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রচনায়।

তথ্যসুত্র:

১. কামাল, বেগম আখতার, *উষালোকে,* মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পা), জানুয়ারি-মার্চ-২০১৩, মালিবাগ ঢাকা ১২১৭। পৃ- ২৪ ।

২. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া, *অবরোধ বাসিনী। রোকেয়া রচনাবলী,* পৃ- ৪০৫, সম্পাদনা- অনিল ঘোষ, কথা, রামগড়, কলকাতা ৪৭, সংস্করণ- ২০১৪। মূল্য- ৪০০টাকা।

৩. পূর্বোক্ত, *রানী ভিখারিনী,* পৃ- ২৫৩

৪. আচার্য অঞ্জন, 'রোকেয়ার জীবনবাস্তবতা: সমাজ-বিশ্লেষণ ভাবনা', *উষালোকে*। পৃ-২২৮।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ- ২৫-২৬।

৬. পূর্বোক্ত, *পদ্মরাগ*। পৃ- ৩৮৭।

৭. কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল* , পৃ-

৮. বেগম, মালেকা, 'রোকেয়ার স্বদেশী আন্দোলন',*রোকেয়া যুক্তিবাদ নবজাগরণ ও শিক্ষা সমাজতত্ত্ব* , সম্পা- ভূঁইয়া আনোয়ারুল্লাহ, রোদেলা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২০০৮, মূল্য-৪০০টাকা, পৃ- ২১৫।

৯. বেগম, মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২১৫-২১৬।

১০. উদ্ধৃতি, *রোকেয়া জীবনী,* শামসুন নাহার মাহমুদ। বুলবুল পাবলিশিং হাউস। ১৯৩৭।

১১. হাসান, মোহাম্মদ মেহেদী, 'পদ্মরাগ-এর দৃঢ়তা: সুলতানার স্বপ্ন', *উষালোকে,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৮১।

১২. রোকেয়া, 'নিরীহ বাঙ্গালী' রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩-২৬।

১৩. রোকেয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫।

১৪. রোকেয়া, প্রাগুক্ত, *পদ্মরাগ,* পৃ- ৩৭৮।

১৫. রোকেয়া, পূর্বোক্ত, পৃ-৩১৮ ।

১৬. রোকেয়া, *মতিচূর* ২য় খণ্ড বিজ্ঞাপন, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৪।

১৭. রোকেয়া, 'চাষার দুক্ষু', প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩১।

১৮. রোকেয়া, মোহসেনা রহমানকে লেখা পত্র, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৪১।

১৯. কামাল,সুফিয়া, 'একালে আমাদের কাল'। arts.bdnews24.comhttp;//

২০. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮১

২১. *পদ্মরাগ* পৃ- ২৮৮।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ—৩৫৩।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৮২।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৫।

২৫. বলিগর্ত্ত, *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৭০।

২৬. রোকেয়া, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি সভানেত্রীর অভিভাষণ, *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪২।

২৭. ৭০০ স্কুলের দেশে, পৃ – ২৬৩। রচনাবলী।

২৮. বলিগর্ত্ত, পৃ- ৪৬৯-৪৭০। রচনাবলী।

২৯. রোকেয়া, 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

৩০. রোকেয়া, 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের বর্জিত অনুচ্ছেদ, উৎস ভৌমিক, মৌসুমী, আখতার, শাহীন (সম্পা),*জানানা মহ্ফিল,* স্ত্রী কলকাতা, সংস্ক- , মূল্য- পৃ-১৯।

৩১ রোকেয়া, 'আমাদের অবনতি' প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্ফিল* , পৃ- ৩১।

৩২. রোকেয়া, 'শিশু পালন, *রোকেয়া রচনাবলী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৭-১৭৪।

৩৩. রোকেয়া, 'সুগৃহিনী,*রোকেয়া রচনাবলী* , প্রাগুক্ত পৃ-৩৮।

৩৪. রোকেয়া, সুগৃহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০।

৩৫. *পদ্মরাগ* , পৃ- ৩৫৮। রচনাবলী।

৩৬. রোকেয়া 'বলিগর্ত্ত', পৃ- ৪৬৯। রচনাবলী।

৩৭. রোকেয়া, 'অর্ধাঙ্গী' প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮।

৩৮. রোকেয়া, 'অর্ধাঙ্গী', পৃ- ৩০।

৩৯. রোকেয়া, 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩।

৪০. ২৯. রোকেয়া, 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

৪১. সাখাওয়াত হোসেন, রোকেয়া, 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সভানেত্রীর ভাষণ', পূর্বোক্ত, পৃ—২৪৭।

৪২. রোকেয়া, মুজিবর রহমানকে লেখা পত্র, তারিখ ১০. ০২. ১৯১১, *রোকেয়া রচনাবলী* প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৪৬।

৪৩. কামাল, সুফিয়া, একালে আমাদের কাল, পৃ-

৪৪. রোকেয়া, মুজিবর রহমানকে লেখা পত্র, ১০.০১.১৯১৩ *রোকেয়া রচনাবলী* প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৪৮-৫৪৯।

৪৫. রোকেয়া, মোহাম্মদ ইয়াসিনকে লেখা পত্র, ০৯.০৪.১৯১৪,*রোকেয়া রচনাবলী* প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫০।

৪৬. রোকেয়া, মোহসেনা রহমানকে লেখা পত্র, *রোকেয়া রচনাবলী* প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩৪।

৪৭. রোকেয়া, মরিয়ম রশীদকে লেখা পত্র, ২৪.০৩.১৯৩০,*রোকেয়া রচনাবলী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩৫।

৪৮. রোকেয়া পত্র, পত্র প্রাপক অজ্ঞাত, ০৬.০৬.১৯৩১,*রোকেয়া রচনাবলী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩৮।

৪৯. রোকেয়া, মুজিবর রহমানকে লেখা পত্র, ২০.১২.১৯১৮, *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫৮-৫৫৯।

৫০. রোকেয়া, *পদ্মরাগ,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮৮।

৫১. কামাল, সুফিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ- ....

৫২. রোকেয়া,*পদ্মরাগ,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১৯।

৫৩. পূর্বোক্ত, ৩২১ পৃ

৫৪. বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সভানেত্রীর অভিভাষণ, *রোকেয়া রচনাবলী।* প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৩

৫৫. *পদ্মরাগ, রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩২৭

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩৪-৩৩৫।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩৫।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩২৮

৬০. রোকেয়া, *অবরোধ বাসিনী, রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৭।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ- ৪১৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ- ৪১৯।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ- ৪১৯।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১৪।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১৩।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১৯।

৬৭. পূর্বোক্ত , পৃ ৪৩২।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১১।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১৩।

৭০. *পদ্মরাগ,* পৃ- ২৮৭। রচনাবলী।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৯। রচনাবলী।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৯। রচনাবলী।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৯। রো।র।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ—৩৫৩। রো।র

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩৪-৩৩৫।

৭৬. পূর্বোক্ত। পৃ- ৩৮৮।

৭৭. পূর্বোক্ত। পৃ- ৩৮৫।

৭৮. পূর্বোক্ত। পৃ- ৩৮৭।

৭৯. রোকেয়া, 'স্ত্রী জাতির অবনতি', প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫।

৮৪. রোকেয়া, 'সুবেহ সাদেক', *রোকেয়া রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬০।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬০।

৮৬. পূর্বোক্ত। পৃ- ৩০৫।

৮৭. বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সভানেত্রীর ভাষণ, পৃ-২৪৪। রো।র।

৮৮. *পদ্মরাগ*। পৃ—৩৬৭।

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৬৮।

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৬৯।

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ—৩৭০।

৯২. রোকেয়া, খান বাহাদুর তসুদ্দককে লেখা পত্র, ২৫.০৪.১৯৩২, *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৪৩।

৯৩. রোকেয়ার শেষ রচনা 'নারীর অধিকার' (*মাহে-নাও*, মাঘ ১৩৬৪তে প্রকাশিত, প্রকাশের সময় নিম্নোক্ত নোট সাথে ছিল)। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া ভোর রাতে মারা যান। সেদিন তিনি যে টেবিলে বসে কাজ করছিলেন সেই টেবিলে পেপার ওয়েটের নীচে এই অসমাপ্ত লেখাটি পাওয়া যায়। এই লেখাটির সংগ্রাহক মোশফেকা মাহমুদ তা জানিয়েছেন। সূত্র- *রোকেয়া রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬১৪-৬১৫।

তৃতীয় অধ্যায়

রোকেয়া সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন

তৃতীয় অধ্যায়

রোকেয়া সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন

নবজাগৃতির আলো বাঙালি মুসলিম সমাজকে ভাস্বর করেছিল ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। তারই স্পর্শ প্রবেশ করেছিল মুসলিম নারীর কঠোর অবরোধে ঘেরা জানানা মহলের ভিতরে। যার ফল স্বরূপ মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের আকুতি তৈরি হতে থাকে। নবাব ফয়জুন্নেসা(১৮৩৪-১৯০৩), তাহেরুন্নেসা, করিমুন্নেসা(১৮৫৫-১৯২৬)র বলিষ্ঠ পদচারনা মুসলিম অন্তঃপুরের চিত্র বদলের ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাতিক্রমী এই মুসলিম নারীরা শুধু নিজেরা শিক্ষার আলোকস্পর্শে আসেননি, অন্দরমহলে বন্দী অন্য নারীদের শিক্ষার জন্য সওয়াল করেছেন। সমাজের উন্নতির স্বার্থে নারীশিক্ষার জন্য তাঁরা লেখনী ধারণ করেছেন। রচনা করেছেন উৎকৃষ্ট কাব্য, গদ্য। এই ধারারই সর্বোত্তম প্রতিনিধি রোকেয়া(১৮৮০-১৯৩২)। সেই যুগের আধুনিক চিন্তার আলোকস্পর্শে রাজনীতি, সমাজ প্রগতি, নারীমুক্তির জগতে পদার্পন করেছিলেন বেশ কয়েকজন বাঙালি মুসলিম নারী। তাঁরা নারী শিক্ষা, পণপ্রথা, তালাক, বহু বিবাহ, অবরোধ সহ নারীমুক্তির দিকটি নিয়ে যেমন কলম ধরেছেন তেমনি সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে মত দিয়েছেন। এই পর্বে যাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে দেখেছি - তাঁরা হলেন- খায়েরুন্নেসা(১৮৭৪/৭৬-১৯১০), মাসুদা রহমান(১৮৮৫-১৯২৬), বিদ্যাবিনোদিনী নূরুন্নেসা খাতুন(১৮৯৪- ১৯৭৫), মামলুকুল ফতেমা খানম(১৮৯৪-১৯৫৭), মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেছা।

খায়েরুন্নেসার রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজচিন্তা

নবজাগৃতির আলোকস্পর্শে যে কতিপয় মুসলিম মহিলা আলোকিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে খায়েরুন্নেসা অন্যতম। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা সমৃদ্ধ গদ্যগুলি পাঠক

মনে সেদিন গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি সিরাজগঞ্জ হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তার সাথে সিরাজগঞ্জে একটি নৈশ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন মূলত মুসলিম মেয়েদের জন্য। এই স্কুল পরিচালনার জন্য তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে স্কুলের খরচ নির্বাহ করতেন।[১] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছিলেন সামনের সারিতে।[২] বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন স্ত্রী শিক্ষার সমস্যাগুলি কোথায়। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অনুভব করেছেন বাঙালি নারীদের পশ্চাৎপদতা। তাই সমস্ত দিক থেকে মেয়েরা যাতে এগিয়ে আসে, নারীশিক্ষার অগ্রগতি হয়, তার জন্য কলম ধরেছেন। যদিও তাঁর লেখাপত্র যা পাওয়া যায় তার সংখ্যা দুটি। অথচ "সতীর পতিভক্তি" নামে রচনায় উল্লেখ করছেন-

> আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন একটি মুসলিম মহিলা। আর কখনও কোন পুস্তকাদি লিখি নাই। কিন্তু যখন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়ত্রী ছিলাম তখন সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতাম।[৩]

'মধ্যে মধ্যে' লিখলেও অনেক প্রচেষ্টাতেও বাকি লেখার সাক্ষাৎ পাননি "জানানা মাহ্ফিলে"র সম্পাদকদ্বয়। অতি জনপ্রিয় এই "সতীর পতিভক্তি"রও একটিও কপি সংগ্রহ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন।[৪] যে দুটি রচনার সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন তা হল- 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়'(১৯০৪) ও 'স্বদেশানুরাগ'(১৯০৫)। আহমদ রফিক(১৯২৯) "নারী প্রগতির চার অনন্যা" গ্রন্থে লিখছেন-

> সৈয়দ আবুল মকসুদের মতে, খায়েরুন্নেসা "নবনূর" এ খয়ের খাঁহ মুনশী ছদ্ম নামে বেশ কিছু রাজনৈতিক ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে মকসুদ অবশ্য কোনও সূত্র উল্লেখ করেননি।[৫]

বর্তমান গবেষকের অনুমান তিনি 'মধ্যে মধ্যে' যে প্রবন্ধ লিখেছেন বলে উল্লেখ করছেন তা সম্ভবত এই 'খয়ের খাঁহ মুনশী' নামে। খায়রুন্নেসা নামের সাথে 'খয়ের খাঁহ' নামটির মিল এই অনুমানকে মান্যতা দিতে সাহায্য করে। তাঁর লেখা 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে যে রাজনৈতিক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে এবং আহমদ রফিক সাহেবের উদ্ধৃত লেখার সাথে তা তুলনা করলে একই চেতনার প্রকাশ বলে বোধ হয়।

'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' প্রবন্ধটি বর্তমান গবেষকের গবেষণা কালের আগে। তথাপি খায়েরুন্নেসার সময়ের শিক্ষা চিন্তাকে ধরবার জন্য কিছু দিক বাদ দেওয়া গেল না। তিনি শিক্ষাকে সূর্য কিরণের সাথে তুলনা করছেন। বলছেন বিদ্যাহীন জীবন পশুর সমান। শিক্ষার আলো না পৌঁছালে সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব নয়।—

> সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, আমাদের রীতিমত শিক্ষা না হইলে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির আশা নাই। বাস্তবিক কথাটা যে একান্ত যুক্তিসিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। বিদ্যাহীন জীবন আর সূর্যহীন জগৎ উভয়েই তুল্য। মূর্খ ব্যক্তি পশুর সহিতই তুলনীয় হইতে পারে। যে বিদ্যা পুরুষকে সৌন্দর্যশালী ও গুণবান করে, সে বিদ্যারূপ অহংকারে স্বভাবসুন্দরী নারী জাতির রূপ ও গুণগরিমা বর্ধিত হইবে না, ইহা কোন কথা ?[৬]

যদিও মুসলিম সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার উপযুক্ত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছিল না। সামাজিক বিধি, রীতিনীতি ইত্যাদির কারণে সমস্যা ছিলই। এই বিষয়গুলির সাথে আর্থিক কারণকে তিনি দায়ী করেছেন। -

> হিন্দুর মেয়েছেলেদের ন্যায় আমাদের গ্রামান্তরে যাইবার অবাধ অধিকার নাই। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তো অবরোধ প্রথার মর্যাদা রক্ষা না করিয়া অন্য বাড়িতে যাওয়াই নিষিদ্ধ। সুতরাং উপযুক্ত স্থানে আমাদের উপযোগী বিদ্যালাভের অভাবই আমাদের শিক্ষা বিস্তার না হওয়ার প্রধান ও প্রথম কারণ বটে। দ্বিতীয় কারণ এই যে আমাদের বঙ্গের মোসলমান সমাজ বড়োই দরিদ্র। অনেকে স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতেই অক্ষম। তাহারা বালকগণেরই শিক্ষার্থে সামান্য ব্যয় করিতে অপারগ, কন্যাগণের কথা তো বহুদূরের। একে স্কুলের অভাব তাহাতে আবার অর্থের অভাব।[৭]

এই লেখা পড়ে খায়েরুন্নেসাকে সমাজ সম্পর্কে অনেক বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ মনে হয়। তিনি তাঁর যুগের সীমাবদ্ধতাকে জানতেন। তা বুঝেই তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন। এবং পর্দাপ্রথাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগকে সমাজপতিদের রোষানলের মুখে ধ্বংস হতে দিতে চাননি। তিনি শিক্ষাবিস্তারে মুসলমান ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের অনীহাকে তীব্র ভাষায়

আক্রমণ করেছেন। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে উপাধি পাওয়ার লোভে তাঁরা অর্থ ব্যয় করেন অথচ প্রকৃত লোকহিতকর কাজে অর্থ ব্যয় করেন না। যে কারণে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি মনে করেন। তিনি স্কুল পরিচালনা করতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তাই লিখছেন-

> .... উপাধির লোভে পড়িয়া আমাদের দেশীয়রা দান করিতে কুণ্ঠিত না হইলেও প্রকৃত লোকহিতকর ও পুণ্যকার্যে দান করিবার সময়ে তাঁহাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। অধুনা এরূপ কার্যে দান অতি বিরল। মুষ্টিভিক্ষা করিয়া কেহ এরূপ স্কুল জীবিত রাখিবেন, সেরূপ প্রত্যাশা করাও নিতান্ত অন্যায়। যে কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটিতেছে না,[৮]

বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য পাওয়া যায় 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে খায়েরুন্নেসার রাজনৈতিক চেতনার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পদানত ভারতবর্ষের মূল রাজনৈতিক চেতনাই ছিল জাতীয়তাবাদ। যাকে ভিত্তি করে এদেশে তখন একাধিক গুপ্ত সমিতি কাজ করেছে। গড়ে উঠেছে জাতীয় কংগ্রেস। সেই রাজনৈতিক আবহে খায়েরুন্নেসার মধ্যে সেই জাতীয় চেতনারই আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একজন বাঙালি মুসলিম নারী হিসাবে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে যিনি নিজে যেমন এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি অন্তঃপুরের মহিলাদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন লেখনী দ্বারা। তিনি প্রবন্ধের শুরুতেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে বলছেন—

> বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সমাজে যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে, ইহাতে আমাদের অধঃপতিত দেশের সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বঙ্গ-বিচ্ছেদ যে এই আন্দোলনের আদি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ প্রত্যেক জেলার গ্রামে-শহরে রাজা, মহারাজা, উকীল, মোক্তার, ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই বিরাট সভার আয়োজন করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ পরিকর হইতেছেন যে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিব না।[৯]

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সমর্থনে নারী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন—

> ভগ্নীগণ আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশী শাড়ি পরিত্যাগ করি, বিলাতী বডিজ, সেমিজ ও মোজা ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেণ্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি .... তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারব।[১০]

তার সাথে দেশীয় কার্পাস, রেশম ব্যবহারের জন্য বলেছেন। তিনি বলছেন, এদেশবাসী ধাতব বাসন ত্যাগ করে ঠুনকো বাসনে ঘর পরিপূর্ণ করছে। সোনার গয়না ছেড়ে ঝুটো অলঙ্কারে নিজেকে সাজাচ্ছে। এরফলে ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ অনেক টাকা এদেশবাসী থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি লিখছেন—

> আমাদিগকে নির্বোধ দেখিয়া, আমেরিকা, ইংলন্ড, স্কট্‌লন্ড, জর্ম্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের বণিকগণ অনবরত সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া আমাদের বহু শ্রমোৎপন্ন শস্যাদি স্বদেশে লইয়া যাইতেছে, আর আমরা দুমুঠা ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে হা,হা করিয়া বেড়াইতেছি। যতদিন আমরা এই সমস্ত বিদেশী বণিকগণের প্রতারণার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইব ততদিন আমরা অধঃপাতে যাইতে থাকিব।[১১]

তিনি, অর্থনীতি সম্পর্কে যে বেশ সচেতন ছিলেন তা তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। দেশবাসী বিদেশী দ্রব্য গ্রহণের ফলে দেশীয় অর্থনীতির যে সর্বনাশ হচ্ছে তা তিনি দেখাচ্ছেন। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি- সে সময় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার রিফাইন্ড চিনি আমদানি করা হত। অথচ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যকর চিনি গুড়ের অভাব ছিল না। এবং বছরে ত্রিশ লক্ষ টাকার চুরুট ও সিগারেট আমদানি করা হত।

বঙ্গভঙ্গ যে ইংরেজের ভেদনীতিরই ফল তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই ভেদনীতির মাধ্যমে ইংরেজ শাসক ভারতবর্ষের সদ্য গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে দুর্বল করতে চাইছিল। তাই ধর্মের নামে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে খায়েরুন্নেসা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিভেদনীতির বিরুদ্ধে তিনি বলেন—

> ভেদনীতি দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন দূর্বল করিতে সংকল্প করেন।[১২]

তিনি আরও বলেন—

> ... . ইংরাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে হিন্দুর কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্রের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াই মুসলমানকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া বিবেচনা করেন।[১৩]

বাস্তবে খায়েরুন্নেসা সম্পর্কে এর অতিরিক্ত তথ্য অমিল। তবুও যতটুকু তথ্য সামনে এসেছে তা থেকে নারী শিক্ষা প্রসারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিস্মিত করেছে। ততোধিক বিস্মিত করেছে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ। রাজধানী থেকে বহুদূরে অবস্থান করেও তাঁর এমন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক অবস্থান পাঠক সমাজকে বিস্মিত করে। সেই সময় বঙ্গভঙ্গের আবহে লিখিত যে সব লেখাপত্র সংগ্রহ করা গেছে তার ভিত্তিতে দেখা যায়—খায়েরুন্নেসাই একমাত্র মুসলিম নারী যিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তখনই বলিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

মাসুদা রহমান

মাসুদা রহমান এক ব্যতিক্রমী বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নিয়ে বাংলার প্রগতিকামী মানুষের মন জয় করেছিলেন। মাত্র একচল্লিশ বছরের জীবনে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখেছেন একের পর এক আগুন ঝরা প্রবন্ধ। এই যোদ্ধাকে বাংলাবাসী ডাকতেন 'অগ্নি নাগিনী' বলে। সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে লেখালিখি শুরু করেন। রোকেয়ার রচনা তাঁকে কলম ধরতে সাহায্য করেছিল বলে মনে করা হয়।[১৪] রোকেয়ার এমন মহৎ উদ্যোগে বাঙালি মুসলমানের নিস্পৃহতা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তাঁর রচনায় সেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। তিনি তাঁর রচনায় সমাজ-পরিজন কাউকে রেয়াত করেননি। এমন একজন প্রতিবাদী মানুষ সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে করা যেতে পারে তাঁর জীবনও ছিল তাঁর রচনার মতই বলিষ্ঠ প্রতিবাদীর। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে মা বলে সম্বোধন করতেন। মাসুদার বাবার সাথে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ প্রীতির ছিল না। কিন্তু নজরুলের গ্রেফতারের সম্ভাবনা দেখা দিলে খান বাহাদুর বাবার সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। যদি বাবার প্রভাব খাটিয়ে নজরুলের গ্রেফতার এড়ানো যায়। কিন্তু বাবা সে চেষ্টায় যাননি। তাতে মাসুদা দুঃখ

পেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন – জীবিত অবস্থায় বাড়িতে তিনি আর আসবেন না। আসলে তাঁর লাশ আসবে। সত্যিই হয়েছিল তাই।[১৫]

তিনি ছিলেন রোকেয়ার সহযোদ্ধা। রোকেয়ার কাজের প্রতি তিনি কতটা আন্তরিক ছিলেন তা তাঁর 'সদনুষ্ঠান "কথা বনাম কাজ"'(বিজলী, ৩০ চৈত্র, ১৩২৯,) প্রবন্ধ থকে জানা যায়। তাঁর জনৈক বন্ধু মিসেস রসাদ পরিবার পরিজনের ভয় ভীতি উপেক্ষা করে মেয়েদের জন্য একটি কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই কর্মশালার উন্নতির জন্য রোকেয়াকে সাথে নিয়ে বাড়ি বাড়ি অর্থের জন্য ঘুরেছেন। অনেকেই আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও অর্থ সাহায্য করেননি। এই মিথ্যাচারে মাসুদা ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এঁদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন—

> এহেন জাগরণের যুগেও কি তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে? আমরাও মানুষ, মানুষের সবকিছু অধিকার আমাদিগকেও পেতে হবে। আগেও বলেছি এখনও বলছি ভাল জিনিস কেউ কখনও হাতে তুলে দেয় না, দেবে না। জোর ক'রে কেড়ে নিতে হবে পরিশ্রম করে অর্জন ক'রতে হবে।[১৬]

নারীকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তাঁর রচনাতে ছড়িয়ে আছে।

সেই সময় দাঁড়িয়ে মুসলিম নারীর আধুনিকায়নে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সেক্ষেত্রে শুধু প্রচলিত সামাজিক রীতিরই বিরোধিতা করেননি। ধর্মের নামে সমস্ত রকম জড়তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি লিখছেন—

> ইসলাম আমাদিগকে কারা প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ থাকতে, জড় পুত্তলিকার মত গৃহসজ্জার উপকরণ হয়ে থাকতে বলেনি, জ্ঞানলাভ অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে।[১৭]

তিনি মুসলমান সমাজের গোঁড়ামির চিত্র দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন—

> পন্ডিত নামের কলঙ্ক মূর্খদের পাপে সমাজপতিদের স্বেচ্ছাচারে, মানুষের পরিবর্তে দেশে পশুরদল বৃদ্ধি হচ্ছে, তার ফলে দেশ অধঃপথে এগিয়ে গিয়েছে, জাতি মরনোন্মুখ।[১৮]

এই প্রবন্ধে তাঁর স্বচ্ছ স্বদেশ চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। স্বরাজ মানে যে শুধু ইংরেজ তাড়ান নয়। দেশের প্রতিটি মানুষের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপনা করা বোঝায়। না হলে প্রকৃত স্বরাজ আসা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। এবং স্বাধীনতার পতাকা বহন করার জন্য যে বীরত্ব দরকার তা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে মিথ্যা ধর্মমোহে—

> জরাজীর্ণ আধমরা বহন করবে স্বাধীনতার পতাকা? অনেকখানি বলবীর্যের আবশ্যক তাতে। ... ... রক্ষণশীল বৃদ্ধদের হাতে জপমালা দিয়ে তপবনে রেখে এস, ভন্ডমিথ্যাবাদীদের হাত থেকে ধর্মগ্রন্থ কেড়ে নাও, দূর করে দাও অনাচারীদিগকে সমাজ মন্দিরের পবিত্র বেদী থেকে। মানবের হিতার্থে স্রষ্টার বাণী প্রচার কর।[১৯]

ধর্মের বিরুদ্ধে এমন দ্ব্যর্থহীন উক্তি সে যুগে ছিল বিরল। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় মানুষের এই জয়গান দেখতে পাই। মাসুদা আরও বলেন— পুরাতন যা কিছু ভণ্ডামি, পাশবিকতার মূলে আগুন জ্বালিয়ে শেষ করা হোক যত আবর্জনা। উড়ুক ‘গগণচুম্বী মুক্তি পতাকা’। সেই নতুন জীবনে নতুন মানুষ সৃষ্টি হোক। সেই বীর সন্তান সৃষ্টির কারিগর মায়েরাই। তাঁদেরকে মুক্তিপথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[২০] কিন্তু মা হওয়াতেই তার সার্বিক স্বার্থকতা নেই। তিনি নারীকে পুরুষের সাথে সমমর্যাদার অধিকারী হওয়ার লড়াই করতে বলেছেন। প্রচলিত সমাজ যেভাবে নারীকে গৃহবন্দী করেছে, যেভাবে ঘর কন্যার কাজেই তার মোক্ষ অর্জনের ধারণা প্রস্তুত করেছে এম রহমান ছিলেন তার ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলছেন—

> ধর্মদ্রোহী মাতৃদ্রোহী সমাজ বিধান দিয়েছে, মেয়ে মানুষ শুধু রসনা তৃপ্তকর খাদ্য রান্না করবে, কুক্কুরির মত বছর বছর বাচ্চা দেবে, নতমস্তকে তাদের স্বার্থ-কলুষ ভরা বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, অন্ধভাবে তাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দেবে!!

> আমরা দেবী, আমরা নারী, সেই আমরাই ডাকিনী যোগিণী। এখনও সাবধান হও, মা হয়েছি বলে কি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েছি ?[২১]

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে নারী হিসেবে সার্থকতা না চেয়ে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রত্যাশা করেছেন তিনি। সমাজ কর্তৃক 'নারীত্বে'র যে বিধান স্থির হয়েছে তাতে তাকে অন্তঃপুরে বন্দীই করেনি; তাকে দাসী করেছে। অথচ সেই বন্দী জীবনকেই গৌরবান্বিত করে বিবাহকেই জীবনের একমাত্র মোক্ষ বলে স্থির করে দিয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজ। মাসুদা রহমান 'আমাদের স্বরূপ' প্রবন্ধে বলছেন—

> নারীত্ব সার্থক করার সহস্র পথ আছে, বিবাহ ছাড়াও করবার কাজ অনেক আছে।[২২]

'আমাদের স্বরূপ' প্রবন্ধটিতে মাসুদা রহমান নারীদের নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আবেদন করেছেন। মেয়েদের নিজেদের অবস্থাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একজন নারীর না আছে শিক্ষা না আছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। অন্যদিকে পুরুষতন্ত্রের প্রধান দুই স্তম্ভ 'পিতা' এবং 'পতি' এঁরা সমাজে দ্বিতীয় ঈশ্বর হয়ে বসে আছেন। এঁদের প্রতি যে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা তাকে তিনি তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন—

> জন্মের পূর্ব্ব থেকেই বোধহয় শুনে আসছি-
>
> পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ
> পিতাহি পরমতপ।
>
> বাস্তবিক কথাই তাই। ভ্রূণাবস্থা থেকে শিক্ষা পাচ্ছি , "পতি পরম গুরু", জার্ম্মানীর গচরুণীতে লেখা, "পতি পরম গুরু", ম্যানচেষ্টারের শাড়ির পাড়ে লেখা, "পতি পরম গুরু", ... ক'টা জিনিসেরই নাম করবো;
>
> "যে দিকে ফিরাই আঁখি
> প্রভুময় সব দেখি,-" [২৩]

কিন্তু এর প্রতিদানে পিতা কিম্বা স্বামীর কাছ থেকে মেয়েরা কি পেয়েছে ! বাবা মেয়েদের যথাযথ শিক্ষিত করেননি, আবার সু-পাত্রে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেননি। স্বামীর কাছ

থেকে না পেয়েছে সম্মান, না পেয়েছে স্বাধীনতা। তাই তিনি সবার প্রথমে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর রচনায় সমাজ কতৃক নারীদের অবদমনের প্রতিবাদে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়েছে—

> সমাজরূপী শয়তানকে দমন ক'রতেই হবে।
> অবলা, সরলা, প্রমোদের সঙ্গিনী হ'য়ে আর কতকাল রাক্ষসদের ভক্ষ্য হবে, আর কতকাল কামুকদের কামবহ্নিতে ইন্ধন জোগাবে ?
> জননী সুলভ স্নেহ মমতা অতলে বিসর্জন দাও, পর্য্যাপ্ত পরিমানে জিনিসটা ওদিগকে দিয়েছ, অতি লোভে ওরা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।[২৪]

পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তরবারির ঝলক ও তার গতি নিয়ে লেখা তাঁর 'শান্তি ও শক্তি'(ধূমকেতু, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) প্রবন্ধটি। রণং দেহি দুর্গা, কালী, ফতেমা জোহরার যে রূপ তেমন ক্ষিপ্রতায় নারীদের জ্বলে উঠতে বলেছেন তিনি। সেই সাথে 'নারী নরকের দ্বার' মনুর সেই বহু চর্চিত উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছেন।[২৫]

নারীদের অমিত তেজে জ্বলবার আহ্বান ঘোষিত এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের প্রসঙ্গটি। আমরা আগেই দেখেছি বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বাংলার মুসলিম সমাজের অনেকেই সামিল ছিলেন। কিন্তু মুসলিম সমাজের সচেতন অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। মাসুদা রহমানের এই প্রবন্ধ থেকে তাঁর ইংরেজবিরোধী দেশপ্রেমিকরূপটি সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়। তিনি লিখছেন—

> লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষে, বাঙালীর জাগরণ-সুচক তূরী যখন বেজে উঠলো 'বন্দেমাতরম' রবে,[২৬]

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলা থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী গণজোয়ার শুরু হয়। সেই স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন। তার সাথে তাঁর আক্ষেপ এই গণজোয়ারে যে সন্তানরা অংশগ্রহণ করবে তারা যদি সু-শিক্ষার অধিকারী না হয়, তাদের সে শিক্ষা কে দেবে ! সুশিক্ষার প্রথম পাঠ তো আসে মায়ের থেকে। তিনি যে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ! তাই মাকেও এই জাগরণে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবেই একটি জাতি সম্পূর্ণ হতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি পুরুষদের দ্বারা মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রসঙ্গে একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন। বলছেন যাদের মন পরাধীন তারা অন্যকে স্বাধীনতা দেবে কি করে—

> পুরুষের কাছে চাইলেও পাবে না, দেবার ক্ষমতা নেই তাদের, ... । আর দেবেই বা কোথা থেকে, তাদের যেমন শিক্ষা অর্থাৎ রাজপুরুষের কাছে যেমন সম্মান স্বাধীকার তারা পাচ্ছে সেই রকমই দেবে তো। আহা ! ওরাই দয়ার পাত্র.. ..[২৭]

অর্থাৎ অধিকাংশ পুরুষ ইংরেজ শাসকের শাসনযন্ত্রের চাপে মাথা নিচু করে নিজের জন্য কিম্বা জাতির জন্য দয়া ভিক্ষা করছে; যাদের নিজেদেরই মন পরাধীন তারা অন্যকে স্বাধীনতা দেবে কি করে! এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাথে তাঁর রাজনীতি সচেতন মনটি আমরা দেখতে পাই। পরাধীন জাতির ন্যুব্জ শিরদাঁড়ার প্রতি কটাক্ষ করেছেন 'আমাদের দাবী'(ধূমকেতু, ২ আশ্বিন, ১৩২৯)প্রবন্ধে। তিনি বলছেন—

> অধিকার চাই কার কাছে, না পুরুষের কাছে। যাদের নিজেরই কোনও বিষয়ে অধিকার নেই, কাঙালের প্রবৃত্তি নিয়ে যারা বড় হতে চাইছে, গোলামীর নাগ-পাশে শত রকমে আপনাদিগকে বেঁধে জীবনের আদর্শকে যারা ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর ক'রে ফেলেছে, আত্মা পর্য্যন্ত যাদের গোলাম হ'য়ে গিয়েছে তারাই দেবে আমাদিগকে অধিকার?[২৮]

মাসুদা রহমান যে কতটা স্পষ্টবক্তা ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তা এই প্রবন্ধের প্রথম কয়েকটি বাক্য থেকে আন্দাজ করা যায়। তিনি লিখছেন—

> উচিত কথায় আহম্মক রুষ্ট; বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে, সেই ভয়ে অনেকে উচিৎ কথা বলতে ইতস্ততঃ করে; আমি বলি বিচ্ছেদ হ'লো তো ব'য়েই গেল। উচিত কথায় যে বন্ধু রুষ্ট হয়, ঘৃণার সহিত আমি প্রত্যাখ্যান করি তার বন্ধুত্বকে।[২৯]

এই সত্যবাদিতার কারণে তাঁকে 'মদ্দা মেয়ে', 'জ্যাঠা মেয়ে' এমন নানাবিধ বিশেষণ দিয়ে সমাজ দূরে ঠেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত

হননি। তিনি এই প্রবন্ধে বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বহুবিবাহের সমর্থক পুরুষদের উদ্দেশ্যে তীব্র ধিক্কার বর্ষণ করেছেন—

> বিশ্বস্রষ্টা উহাদিগকে কুকুরবৃত্তি দিয়ে জগতে পাঠিয়েছেন, আমরণ ও ঘৃণিত বৃত্তি ওরা ত্যাগ করতে পারবে না।[৩০]

তিনি এই প্রবন্ধে মেয়ে সন্তানের সাথে ছেলে সন্তানের অসাম্য, মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। হজরত মহম্মদ ছেলে মেয়েতে কোনও পার্থক্য করতে নিষিদ্ধ করেছেন। তা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান সমাজ তা মান্যতা দেয়নি। যে মহম্মদী আইনের বিধান তারা পাড়েন, সেই আইনের তোয়াক্কা না করে মেয়েদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে। মেয়েকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। একদিকে পুত্রসন্তান জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। তখন কন্যাসন্তান শিক্ষাহীন, সম্পত্তিহীন হয়ে অন্যের বাড়ি দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষিত করার প্রশ্ন আসলে বাবা তার মেয়ের বিয়ের সময়ের খরচ করে নিঃস্ব হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। তাতে মাসুদা বলেন—

> মেয়ের বিয়ের খরচ ক'রে কার উপকার করো? দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলো গয়নায় জড়পুত্তলিকা গৃহসজ্জার উপকরণ ক'রে তোমারই মত একটা হৃদয়হীনের ড্রয়িংরুম সাজিয়ে দিয়েছ।[৩১]

রোকেয়ার মতই মাসুদা অলংকারকে দাসত্বের চিহ্ন মনে করতেন। তা এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। তাঁর উপন্যাসেও এই অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি।[৩২] তার সাথে জন্মদাতা পিতাকে তিনি 'হৃদয়হীন মূর্খ' বলতেও পিছুপা হননি। ধর্মগ্রন্থের বিধান যে মানুষের মনগড়া বিধান সেও তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩৩] মাসুদা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে কতটা ক্ষিপ্ত ছিলেন তা এই প্রবন্ধের শেষ অংশটি থেকে বোঝা যায়—

> প্রকাশ্য রাজসভায় যারা পূজনীয় নারীকে উলঙ্গিনী ক'রেছিল, কারবালার মহাপ্রান্তরে, জগতপূজ্যা, শোকাতুরা মহিলাগণকে মস্তকাবরণহীনা (ওড়নাহীনা) করেছিল, মাতৃজাতিকে যারা রক্ত লোলুপা বাঘিনী বলতে কুণ্ঠিত হয় নাই (বর্ত্তমান সময়ে নারীর অপমান কহতব্য নয়) তারাই দেবে তোমাদিগকে

> সম্মান! মানুষের শ্রদ্ধা যে পায় না, সে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। তাই আজ যুগ যুগের পুঞ্জিভূত অপমান, শুধু বাঘিনী নয়, ফণিনীও ক'রেছে আমাদিগকে। রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অপমানকারীদের হৃদয়ের রক্ত পান ক'রে শরম বেদনার উপশম ক'রবো, দলিতা ফণিনীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদগার ক'রে, দংশনে দংশনে তাদিগকে জর্জ্জরিত ক'রে তীব্র অপমানের জ্বালা ভুলব।[৬৩]

মাসুদা রহমানের জীবনের বহু সংগ্রাম মুখর ঘটনা জানা না গেলেও তাঁর রচনা পড়ে তাঁর আপোষহীন বিদ্রোহী সত্তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা তৎকালীন পুরুষতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের ভিতে কি তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে নারী-মুক্তির সংকল্পে অটুট থেকেছেন। তাই তিনি বাঘিনী, তাই তিনি ফণিনী। বাংলার মানুষ তাঁকে ডেকেছেন 'অগ্নি নাগিণী' বলে। মাসুদা রহমান তাঁর যুগে এবং এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও একজন বিরল প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে আমাদের মনে স্থান করে নিয়েছেন।

বিদ্যাবিনোদিনী নুরুন্নেসা খাতুন

বাংলা সাহিত্য আকাশে ধূমকেতুর মত আগমন নুরুন্নেসা খাতুনের। তাঁর সাহিত্য জীবন মাত্র ছয় বছরের। অথচ সাহিত্য জীবনের এই স্বল্প সময়ে যে ক্ষ্যাতি ও সফলতা তিনি অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তিগুলি হল 'নিয়তি', 'স্বপ্নদ্রষ্টা', 'আহ্বানগীত' 'রাজত্ব', 'আত্মদান', 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি', 'জানকীবাঈ' এছাড়া *সওগাত* পত্রিকায় 'আমাদের কাজ'(১৩৩৬, ভাদ্র) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নুরুন্নেসা হঠাৎ লেখিকা নন। অনেক আগে থেকেই তিনি লেখিকা হওয়ার ইচ্ছা মনে পোষণ করতেন। ছোট বোন ফতেমাকে একবার সে কথা তিনি জানিয়েছিলেন—

> বই লিখিতে আমারও বড় সাধ হয়, কিন্তু অসম্ভব ভাবিয়া সাহসে কুলায় না।[৩৫]

যদিও সে সাধ পূরণের কোনও সম্ভাবনাই তাঁর রক্ষণশীল পরিবারে ছিল না। কারণ সাহিত্য রচনার জন্য বহির্জগৎ সম্পর্কে যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কৌতুহল থাকা প্রয়োজন, সে জাতীয় কৌতুহল পোষণ করাটাও পরিবারে গর্হিত অপরাধ ছিল—

> কঠিন পর্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলিতে কি পিত্রালয়ে মস্তকোপরি চন্দ্র তারকা খোচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন কোনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই।[৩৬]

যদিও বৈবাহিক জীবনে স্বামীর ঘরে এই পর্দা প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল না। এই নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতি নুরুন্নেসার সাহিত্য জীবনে উল্লেখযোগ্য অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল। সে অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় মগ্ন লেখিকা বাস্তব হাতরে সমাজে দীর্ঘ অসাম্যের চিত্রকেই সাহিত্যের উপজিব্য করেছেন। লিখেছেন পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে, যে পর্দার জন্য তাঁর শিক্ষা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি লিখছেন—

> কখনও পাঠাগারের বেঞ্চে বসার আস্বাদ পাই নাই। কখনও কোনও শিক্ষকের নিকট বই খুলিয়া বসি নাই। আপন কৌতুহল নিবারনার্থে আপনা আপনি সামান্য 'ক', 'ধ', 'ঠ' শিখিয়া দুচারখানি বই হাতে করিয়াছি মাত্র।[৩৭]

জীবনের এই সমস্যাকে নিছক ব্যক্তিগত করে দেখেননি নুরুন্নেসা। নারী সমাজকে অজ্ঞতার পাঁকে ডুবিয়ে রাখার যে চিরাচরিত সামাজিক বিধি তিনি সেই বিধির বিরোধিতা করেছেন এবং স্ত্রী শিক্ষার অপরিহার্যতার প্রসঙ্গও তাঁর নানান লেখায় আলোচনা করেছেন।

> স্ত্রীশিক্ষা নিশ্চয়ই আজকাল অপরিহার্য জিনিসের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আর এইটি আমাদের রুগ্ন সমাজের মধ্যে নেই বললেই চলে। তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন সব রকমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতায় আমরা এত নিম্নস্তরে নেমে চলেছি যে ভাবতে গেলে ভবিষ্যৎ জীবনগুলো সেখানকার অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।[৩৮]

যদিও নুরুন্নেসা বলেছেন তাঁর সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা সীমিত। তা সত্ত্বেও বৈবাহিক জীবনে স্বামীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তাঁর সে দীনতা অনেকটাই ঘুচেছিল। তাই

তাঁর ছয় বছরের সাহিত্য জীবনে তাঁর সাহিত্যের যাবতীয় উপজীব্যই সামাজিক। তাঁর লেখায় আমরা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে যেমন বলিষ্ঠ বক্তব্য পাই তেমনি সে যুগের হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধেও তাঁকে সোচ্চার হতে দেখি।

ফলে শৈশবে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও তৎকালীন সমাজ মননে আধুনিক চিন্তা ও নারী প্রগতির যে অভিঘাত প্রবল হচ্ছিল নুরুন্নেসার সাহিত্য সেই অভিঘাতেই আন্দোলিত হয়েছে।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার কথা বলেছেন আবার শুধু স্ত্রীশিক্ষাই নয়, সমগ্র সমাজের উন্নতির প্রয়োজনে জ্ঞান চর্চার অপরিহার্যতাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। আবার জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তখন সবথেকে আধুনিক মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা। যে ভাষাকে ইতিমধ্যেই প্রায় সামাজিক ভাবে বর্জন করে প্যান ইসলামিজমের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল মুসলিম সমাজ। এক্ষেত্রেও ইংরাজী ভাষা প্রসঙ্গে নুরুন্নেসার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিজ্ঞানসম্মত।[৩৯] তিনি মুসলিম সমাজের এই অন্ধতা ও কূপমণ্ডুকতার বিরোধিতা করেছিলেন।

এই গণতান্ত্রিক যুক্তিবাদী মুক্তচেতনা দিয়েই তিনি সমস্ত কিছু বিচার করতে পেরেছেন, তাই যখন বহু বছর এদেশের জল হাওয়ায় বড় হয়েও এদেশের মুসলিম সমাজের একাংশ আত্ম-অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে আরব ইরানকে নিজ ভূমি জ্ঞানে তাঁর ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করছিল, তখন নুরুন্নেসা স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বিরোধিতা করেছেন।

> পুরুষানুক্রমে যুগ যুগান্তর ধরে বাংলা দেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, আর এই বাংলা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যাক্ত করেও যদি বাঙালী না হয়ে আমরা অপর কোনও একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই ,তাহলে আমাদের ত আর কখনই উত্থান নাই-ই। অধিকন্তু চির তমসাচ্ছন্ন গওহ্বর মধ্যে পতনই অবশ্যম্ভাবী।[৪০]

নূরুন্নেসা এই প্রবন্ধে আরও বলছেন— বাঙলার মুসলিমের সাহিত্য চর্চার মাধ্যম বাংলা ভাষায় হওয়া দরকার। —

> আমাদের জন্মগত অধিকারে অনাস্থাই আমাদের সমাজকে এক রকম কোনঠাসা করে রেখেছে, একে গজাতে দিচ্ছে না। এখন বাঙ্গলা শিখবার ভয়ে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হলে চলবে না। বুক ঠুঁকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে এখন জোর গলায় বলতে হবে— আমি বাঙ্গালী আর এই বাঙ্গলা সাহিত্যই আমার সাহিত্য।[৪১]

নুরুন্নেসা তাই মনেপ্রাণে তাঁর পরিচিত জল মাটি হাওয়ার সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। তাই এই পরাধীন ভূখণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে যখন প্রয়োজন ছিল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের তখন এদেশের পরাধীন মানুষ হিন্দু মুসলমান হয়ে যুযুধান দুপক্ষে বিভাজিত ছিল। নুরুন্নেসা বলছেন—

> স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য সকলেই কামনা করিয়া থাকেন, এই আন্দোলন সকলের মনেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মোসলমানেরা এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করিলে বর্তমান মুক্তি সাধনার তপ্ত কটাহে হিন্দু মুসলমানের সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মিভূত হইবে।[৪২]

সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাহিত্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'আমাদের কাজ' প্রবন্ধে সমাজ প্রগতিতে সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে নূরুন্নেসা লিখছেন—

> সমাজের উন্নতি করতে হ'লে তার প্রথম সোপান হচ্ছে— সাহিত্যের সাধনা।[৪৩]

পরিশেষে বলতে হয় নুরুন্নেসা তাঁর জীবনের সূচনালগ্নে যে সীমাবদ্ধতার শিকার হয়েছিলেন পরিবারের পর্দা ও অবগুণ্ঠনের কারণে, জীবনে সেইটুকু নিয়ে তিনি আক্ষেপ করে কালাতিপাত করেননি। শৈশবের সীমাবদ্ধতাকে তিনি পূরণ করে নিয়েছিলেন পরবর্তী জীবনের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা দিয়ে। যার মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এক গভীর সমাজ চিন্তা ও জীবনবোধ। যার ছায়া আমরা দেখতে পাই তাঁর বহুবিধ রচনার নানাবিধ বক্তব্যের মধ্যে।

মামলুকুল ফতেমা খানম

ফতেমা খানম একদিকে যেমন ছিলেন রোকেয়ার নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা; অন্যদিকে একজন সুলেখক। যদিও তাঁর যতটা সম্মান প্রাপ্য ছিল তা তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পাননি। মৃত্যুর সাত বছর পর বুলবুল পাবলিশিং হাউসের পক্ষ থেকে তাঁর সাতটি গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয় *সপ্তর্ষি* নামে। এছাড়া তাঁর বেশ কিছু লেখা কিছু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। জীবনের বিচিত্র গতিপথে পরিবার ও সমাজ থেকে যা সঞ্চয় করেছিলেন তাকেই সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলেছিলেন ফতেমা খানম।

তাঁর বাবা রইসউদ্দীন আহমেদ উদার মনস্ক মানুষ ছিলেন। ফলে পরিবার থেকে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর ইংরেজি শিক্ষার জন্য বাড়িতে মেম শিক্ষিকা রেখেছিলেন বাবা। শিখেছিলেন ঘোড়ায় চড়া। যদিও এই মুক্ত আবহাওয়া আকস্মিকভাবেই স্তব্ধ হয়ে যায় পীর পরিবারে বিয়ের পর—

> শ্বশুরকূল শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। গল্পের বই হাতে দেখলেই গঞ্জনার অবধি থাকত না। লুকিয়ে লুকিয়ে মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিম পড়তেন। .. ... অনেক সময় বিদ্রুপের ভয়ে তিনি উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে জলচৌকিতে বসে এক হাঁটুর উপর খাতা রেখে অন্য হাঁটুর আড়ালে সেটাকে ঢেকে পেন্সিলের সাহায্যে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁর গল্পের মুসাবিদা করতেন। তাঁর প্রথম বয়সের পান্ডুলিপি সবই পেন্সিলে লেখা।[৪৪]

ফতেমা খানমের স্বামী পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু পীর শ্বশুর মারা যাওয়ার পর স্বামী চিকিৎসা ছেড়ে পীর হয়ে গেলে তিনি শ্বশুরালয় ত্যাগ করেন। সন্তানদের নিয়ে ঢাকার পৈতৃক ভিটায় চলে আসেন। শুরু হয় তাঁর জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। চরম দারিদ্র্য, সহায় সম্বলহীন জীবন। তারই মধ্যে চলে সাহিত্য সাধনা।

যদিও এই কঠিন সময়ে এক ঝলক খুশীর হাওয়া বয়ে আনতেন তরুণ প্রজন্মের লেখকরা। কথা সাহিত্যিক আবুল ফজল(১৯০৩-১৯৮৩), কবি আবদুল কাদির(১৯০৬-১৯৮৪), কবি মোতাহার হোসেন(১৯০৭-১৯৭৫), কবি ও প্রাবন্ধিক দিদারুল আলম(১৯০৩/০৫-১৯২৯) এঁরা দেখা করতে আসতেন ফতেমা খানমের সাথে। আবুল

ফজল সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ সাহিত্যিকরা তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন।[৪৫] শিক্ষার প্রতি, সাহিত্য সাধনার প্রতি তাঁর অফুরন্ত আগ্রহ ছিল। 'অদম্য স্নেহ' ছিল তরুণ লেখকদের প্রতি। আবুল ফজল লিখছেন—

> মুসলমান সমাজে যাঁরাই এক-আধটু সাহিত্য (সাধনা) করেছেন তাঁদের প্রতি ফাতেমা খানমের একটা অদম্য স্নেহ ছিল। মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে এই জন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না।[৪৬]

নারী শিক্ষার জন্য ফতেমা খানমের আগ্রহ চোখে পড়ে ভাগ্নী আনোয়ারা বাহার চৌধুরী(১৯১৯-১৯৮৭)র শিক্ষার প্রশ্নে। আনোয়ারাকে শিক্ষিত করার জন্য ফতেমা খানম নিজে পেইন্টিং শিখেছেন। কোচিং ক্লাসে ভর্তী হয়েছেন। এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার কথাও ভেবেছিলেন।[৪৭] আনোয়ারাকে লেখা-পড়া শেখানোর জন্য নিজের সন্তানদের থেকে বেশি উদ্বিগ্ন থাকতেন তিনি। আবুল ফজল লিখছেন—

> মেয়েদের লেখা পড়া সম্বন্ধে এত বেশি তাঁর আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁর ছেলেদের লেখা পড়া সম্বন্ধে যত না চিন্তা করতেন তার অনেক বেশি ভাবতেন নিজের মাতৃহারা ভাগ্নিটির লেখাপড়ার কথা। এই ভাগ্নিটিই বেগম আনোয়ারা চৌধুরী বি.এ., বি.টি.।[৪৮]

তরুণ সাহিত্যিকদের তাঁর অসীম স্নেহের সন্ধান আমরা আগেই পেয়েছি। তার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর 'দিদারুলের সাহিত্য-প্রতিভা'(মাসিক সঞ্চয়'', ফাল্গুন-চোইত্র ১৩৩৬) প্রবন্ধটি থেকে। *সম্মিলনী, যুগের আলো* পত্রিকা দুটির সম্পাদক দিদারুল আলম অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে শোকাকুলা ফতেমা খানম লেখেন প্রবন্ধটি। দিদারুল আলম সম্পর্কে তিনি লিখছেন—

> .. যুগের আলোতে লেখা দেওয়া নিয়েই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তার সেই সরল শিশুর মত মধুর মাতৃ-সম্বোধন জীবনের শেষ অবধি ভুলতে পারব কিনা জানিনা।[৪৯]

নবজাগরণের চিন্তা উপহার দিয়েছিল নৈর্ব্যক্তিক মাতৃত্বের চিন্তা। উপরের উদ্ধৃতির মাধ্যমে সেই চিন্তার মূর্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ফতেমা খানমের মধ্যে।

'দিদারুলের সাহিত্য-প্রতিভা' (*মাসিক সঞ্চয়* , ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৬) প্রবন্ধে তাঁর অসম্প্রদায়িক মননের চিত্রটি ধরা পড়ে। ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় যখন ক্ষতবিক্ষত মানুষের মানবতা সেই সময় দিদারুল হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্টায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা করেছিলেন। এ বিষয়টি ফতেমা খানম গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন—

> সে সময়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ রাঙা হয়ে উঠেছিল। এবং সেই রক্তারক্তির বিচিত্র ভীষণ চিত্র, বাংলার প্রতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র সমূহের বক্ষে জ্বলন্ত অগ্নি-রেখায় চিত্রিত হয়ে, নারীহৃদয়ের শান্ত নির্বিকার সুকোমল মাতৃত্ব পর্যন্ত মাধুর্য নিশ্চিহ্নে দগ্ধ করে তুলেছিল। ঠিক সেই সময়ে শুধু একমাত্র এই তরুণ সম্পাদকের কচিবুকের মিলন কামনা, তার পত্রিকাপৃষ্ঠে, শান্ত শ্যামলিমার স্নিগ্ধ মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। কারুর বিরুদ্ধে এতটুকু নিন্দা, এতটুকু অভিযোগ সে করেনি। অন্ধ গোঁড়ামিমত্ত নিরর্থক কলহপ্রিয় এই দুটি জাতিকে, দৃঢ় অনবচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধার আশায় সে শুধু অক্লান্ত আগ্রহে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে।[৫০]

লক্ষণীয়, দাঙ্গায় লিপ্ত জনসাধারণকে ফতেমা খানম 'অন্ধ', 'গোঁড়ামিমত্ত' এবং 'নিরর্থক কলহপ্রিয়' বলে উল্লেখ করছেন। এ থেকে ধর্মীয় অন্ধতামুক্ত মানবতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসার নিদর্শন মেলে।

ফজিলতুন্নেসা(১৮৯৯-১৯৭৭) গণিত এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পর ফতেমা খানম একদিকে খুব অবাক হয়েছিলেন। আবার খুব খুশিও হয়েছিলেন। তাই তাঁর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ফজিলতুন্নেসা এসেছিলেন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। আবুল ফজলও তাঁর সাথে এসেছিলেন। তাঁকে ফতেমা খানম নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিলেন।[৫১] (তবে 'ফাতেমা খানম' প্রবন্ধে আবুল ফজল বলছেন ফজিলতুন্নেসা আসতে পারেন নি) এতো শুধু খাওয়ানো নয়। একটি মুসলিম মেয়ে কতরকমের বাধা বিপত্তির সাথে লড়াই করে এমন স্থান অর্জন করতে পারল তার প্রতি সম্মান। একজন সংগ্রামী নারী হিসেবে আর একজন সংগ্রামী নারীকে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দান।

রোকেয়া যেমন করে শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪), সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯) এঁদেরকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন।

রোকেয়া ফতেমা খানমের একটি গল্প পত্রিকাতে পড়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে শিক্ষকতা করার জন্য। সেই আহ্বানে সন্তান ও ভাগ্নী আনোয়ারাকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালে আনোয়ারাকে ভর্তীর ব্যবস্থা করেন।[৫২] আমরা আগেই দেখেছি নিজের সন্তানের থেকেও মাতৃহীনা ভাগ্নীর জন্য তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না।

স্বামীর ঘরে বন্দিনী জীবনের যে অধ্যায়কে তিনি যাপন করে এসেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন নারী জীবনের দুর্দশাকে। অনুভব করেছিলেন শিক্ষার আলো, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে না উঠলে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক মুক্তি নেই। পর্দার অছিলায় মুসলিম মহিলাদের বন্দী করে মুসলিম সমাজ যে প্রতিদিন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তা তিনি অনুভব করেছেন। তাই তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে লেখা প্রবন্ধে তার প্রতিবিধানের জন্য লিখছেন—

> একজনকে পায়ের তলায় চেপে পিষে ছোটো করে রাখতে গেলে আর একজনও সম্পূর্ণ সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নত হয়ে পড়তে হয়। আমাদের হয়েছেও তাই। নারীকে চেপে পিষে রাখতে গিয়ে সমস্ত পুরুষ সমাজেরই মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।[৫৩]

পর্দা প্রথার যে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই; তা যে পুরুষের গড়া তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন— আমির শ্রেণীর মধ্যেই এই সব পর্দার বাড়াবাড়ি। শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে পর্দার প্রয়োজন ফুরিয়েছে—

> এই যে আমিরী ফ্যাশন, এই যে প্রকৃতির স্বাধীন মুক্তরাজ্য থেকে নারীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে একান্ত নিজস্বরূপে ভোগ করার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা এ থেকেই বর্ত্তমানের এই দুর্ভেদ্য পর্দ্দার প্রথম জন্ম। .. .. তাই আজও সৈয়দ, শেখ ও উচ্চ বংশোদ্ভব পাঠান শ্রেণী যিনি যত বেশি বংশ মর্যাদার দাবী করেন, তাঁদের অন্তঃপুরে পর্দ্দার বন্ধন তত দৃঢ়তর দেখা যায়। আবার যত নিম্নদিকে

> অবতরন করা যায় পর্দ্দার বন্ধন ততই শিথিল হতে শিথিলতর বোধ হয়। অবশেষে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এর অস্তিত্ব একেবারে খুঁজেই পাওয়া যায় না।[৫৪]

অনৈতিক পর্দার বিরুদ্ধে তাঁর মনে ঘৃণার ভাব ছিল। পর্দার সাথে নারীর মর্যাদা ও আত্মসম্মানের যে কোনও সম্পর্ক নেই একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেই বোধ থেকেই পর্দার বিরুদ্ধে পুরুষতন্ত্রকে দায়ী করার সাহস তিনি দেখাতে পেরেছিলেন। যুক্তি করেছেন সমাজের মঙ্গল সাধনে পর্দার প্রয়োজন শুধু নারীর হবে কেন?

> আমাদের 'নায়েবে নবী' যাঁরা উপদেশ দেন— 'পর পুরুষের দিকে চাইলে, নারীর চক্ষু উত্তপ্ত সাড়াশী দিয়ে উৎপাটিত করা হবে'। 'মাথার কাপড় ফেলে দাঁড়ালে, মস্তিষ্কে জ্বলন্ত লৌহদণ্ড বিদ্ধ করা দেওয়া হবে'। 'মুখ খুলে দেখালে সমস্ত মুখ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্য পুরুষের তো এমনি নারীদের সঙ্গে সম্মানিত ও সংযত ব্যবহার করার শত শত বিধান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা আছে। তার একটিও তাঁরা দাঁতের ফাঁকে বের করেন না! তাদের উপর প্রযোজ্য শাস্ত্রবিধানগুলো যদি তাঁরা পালন করে যান তাহলে প্রকাশ্য হাটে বাজারে বিশ্বের সমস্ত নরনারী পাশাপাশি দাঁড়িয়েও যে পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলতে পারেন, একথা একটিবারও স্বীকার করেন না? পর্দ্দার প্রয়োজন কেন হয়? শুধু তাঁদের অন্যায় অত্যাচারের জন্য নয় কি?[৫৫]

মাতৃ মন্দির নামক মাসিক পত্রে ফতেমা খানমের লেখা 'মোসলেম মহিলার চিঠি' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন আবুল ফজল। এই প্রবন্ধে ফতেমা খানমের ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'তরুণের দায়িত্ব' প্রবন্ধের মত পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ দেখা যায় না। 'মোসলেম মহিলার চিঠি' প্রবন্ধে ফতেমা খানম লিখছেন—

> আমি আমার বিবেক নিয়োজিত পর্দাই মানি। এ পর্দা দৈনিক কাজ কর্মের অন্তরায় হয় না। এ পর্দা নয়, একটা অদৃষ্ট শক্তির অবরোধ নেশা। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, এটাকে জগতে সর্বযুগে সর্ববিঘ্নের মাঝখানে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ... এই জিনিসটি বাদ দিয়ে নারী উচ্চ শিক্ষিতা হতে পারে, জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। পুরুষের পার্শ্বে তার প্রতি কার্যে সাহায্য

> করতে পারে হয়ত বা সাহ্ সেকেন্দারের মতো দিগ্বিজয়ী আখ্যাও পেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত নারীত্বের সত্তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। আমার এও বিশ্বাস, ইওরোপ ও আমেরিকার নারী সমাজ আজ পৃথিবীকে একটা নতুন রকমের স্বর্গ ভূমি করে তুলতে পারত। যদি না তারা নারীত্বের বলি দিয়ে পুরুষত্বের অভিনয় করত। নারীর পাশে নারীত্বকে জাগিয়ে রাখতেই হবে এবং এই জাগিয়ে রাখার জন্য পর্দাকে একেবারে অস্বীকার করলে চলবে না। কেবল পর্দার পারিপার্শ্বিক কালিমাটুকু পরিস্কার করতে হবে।[৫৬]

আবুল ফজল ১৯৫৭ সালে লিখছেন- প্রায় ত্রিশ বছর আগে 'মাতৃ মন্দির' নামক মাসিক পত্রে ফাতেমা খানমের 'মোসলেম মহিলার চিঠি' নামে একটি লেখা বেরিয়েছিল।[৫৭] সেই হিসাবে এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় ১৯২৭ সাল নাগাদ হতে পারে। "জানানা মাহ্ফিল" থেকে জানা যাচ্ছে— তাঁর শেষ প্রবন্ধ 'তরুণের দায়িত্ব' প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৩০ সালে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ- 'শেষ অনুরোধ' প্রকাশিত হয়েছে। এই মাঝের সময়ে তিনি *মানসী, মর্মবানী, মাতৃ মন্দির, সওগাত,* সহ কয়েকটি পত্রিকায় লেখালিখি করেন।[৫৮] ১৯২৭ সালে তাঁর আরও একটি গল্প 'চামেলী'*(মাসিক সঞ্চয়,* মাঘ ১৩৩৬) প্রকাশিত হয়। সেখানে চামেলীর পুরুষালি ভাবের প্রতি তাঁর অপছন্দের মনোভাবটি ফুটে উঠেছে। তবে কি ফতেমা খানমের নারী স্বাধীনতা পর্দারক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও রক্ষণশীল মনোভাব কাজ করেছিল? গবেষকের তা মনে হয় না। সময়ের পরিবর্তনে চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়। তাই 'মোসলেম মহিলার চিঠি' ও 'তরুণের দায়িত্ব' প্রবন্ধের সময়কাল খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। হতে পারে নারী স্বাধীনতা, পর্দা রক্ষা নিয়ে তাঁর আগের যা ধারণা ছিল তার পরিবর্তন হয়েছিল। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় 'তরুণের দায়িত্ব' প্রবন্ধে। যেখানে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পর্দার বিরুদ্ধে, নারী স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করছেন। প্রশ্ন জাগে এই তিন বছরের মধ্যে কি এমন ঘটনা ফতেমা খানমের মানস জগতে এমন পরিবর্তন আনল! তবে কি রোকেয়ার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য এই পরিবর্তন আনল। কারণ ১৯২৭ সালেই কলকাতার মুসলিম ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। যদিও এ নিছকই গবেষকের অনুমান। তবে 'তরুণের দায়িত্ব' প্রবন্ধে রোকেয়ার চিন্তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়—

> আমাদের তরুণেরা তাই ছাত্র জীবনে যে উদ্যম নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সংসারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে উদ্যম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের জননী, ভগিনী, স্ত্রী সবাই অশিক্ষিত। .... কতবড় আশা, কতবড় মহৎ অনুষ্ঠানের আগ্রহ যে তাদের পুরুষদের হৃদয় মাঝেমাঝে সাড়া দেয়, অজ্ঞ নারী সমাজ তার কিছুই বোঝে না। তাই তারা উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে উপহাস করে, ...। দিনকয়েক তাদের মূর্খতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, অবশেষে ছেলেরাও একদিন সত্যি সত্যি সমস্ত অনুষ্ঠান ভেঙে দিয়ে দু'বেলা দুই মুঠি অন্নের সংস্থানে কোমর বেঁধে লেগে পড়ে।[৫৯]

রোকেয়ার 'স্ত্রী জাতির অবনতি'(*মতিচূর* ১ম খণ্ড, ১৯০৫) প্রবন্ধে ঠিক এমনই চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন—

> প্রথমতঃ উন্নতির পথে তাঁহারা(পুরুষ) দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন- আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন![৬০]

পর্দার এই নিরর্থক অবরোধ ভাঙার জন্য মুসলিম সমাজের এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা কতটা সচেতন ছিল এ বিষয়ে! শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে সামাজিকতার পাঠ হয়। মুসলিম সমাজ তার থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে। সেই কারণে ফাতেমা খানম শিক্ষার প্রসারকল্পে বেগম রোকেয়ার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে এই কাজে এসে মুসলিম সমাজের এমন দীনতা তাঁর কাছে আরও প্রকট হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এতখানি শূন্যতা নিয়েও তাকে পূরণের কোনও উদ্যোগ মুসলমান সমাজের নেই। আবুল ফজলকে লেখা চিঠিতে সেই বেদনাই ব্যক্ত করেছেন—

> নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতিতে মিসেস আর হোসেন বক্তব্য দেবেন। এ সমতিতে আমারও যেতে ইচ্ছা। .. .. .. অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজের নারী জাতির জন্য এই প্রবীনা মহিলাটি যা করছেন সমস্ত ভারতে তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালী মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙতে পারছেন না।[৬১]

পরিশেষে বলতে হয়, মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে জ্ঞানের যে আলোকবর্তিকাকে নবজাগৃতির ধারাবাহিক ইন্ধনে প্রজ্জ্বল করে রেখেছিলেন আলোকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীরা, ফতেমা খানম সেই অনন্যাদেরই অন্যতম।

মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেছা

মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেছার জীবন সম্পর্কে বর্তমান গবেষকের পক্ষে কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। *ভারত-মহিলা* তে ১৩১৯ সালে প্রকাশিত রাহাতুন্নেছার দুটি প্রবন্ধকে "বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক" গ্রন্থে সংকলিত করেছেন সুতপা ভট্টাচার্য[৬২]। তাতে অনেক লেখিকার লেখা ও তাঁদের জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু রাহাতুন্নেছা সম্পর্কে তিনিও আলোকপাত করেননি কিছু। তবে তাঁর প্রবন্ধ দুটি যেহেতু ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই কারণে এই অধ্যায়ে সেই প্রবন্ধ দুটি থেকে তাঁর নারীমুক্তির চেতনাকে খুঁজতে চাওয়া হয়েছে।

রাহাতুন্নেছা প্রাচীন ভারতের দুজন মহীয়সী নারী সম্পর্কে লিখেছেন- একজন ভারতী অন্যজন খনা। 'ভারতী' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন- হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধারে শংকরাচার্যের ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শংকরাচার্যের সাথে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র। তর্কযুদ্ধের বাজি ছিল যিনি হেরে যাবেন তিনি অপরের ধর্ম গ্রহণ করবেন। এই যুদ্ধে বিচারক ছিলেন মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী ভারতী। এই তর্কে মণ্ডন মিশ্র হেরে যান। কিন্তু স্বামীর প্রতি পক্ষপাত না করে শংকরাচার্যের গলার জয়মাল্য পরিয়ে দেন ভারতী। এখানেই তাঁর মহত্ব শেষ হয়ে যায় না। এবার তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন স্বয়ং ভারতী। ভারতী প্রশ্ন করছেন শংকরাচার্য উত্তর করছেন। ভারতীর বিশাল পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য দেখে শংকরাচার্য বিস্মিত। কিন্তু ভারতী তাঁকে হার মানাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে শংকরাচার্য রণে ভঙ্গ দেন। ভারতীর জয় হয়। কিন্তু এই চাতুরীর জয়ে সন্তুষ্ট নন মণ্ডন মিশ্র। তিনি শংকরাচার্যের ধর্মই গ্রহণ করে তাঁর অনুগামী হলেন। ভারতী ও সেই পথের পথিক হলেন। বিদ্বান ভারতীকে পেয়ে শংকরাচার্যের আনন্দের সীমা রইল না। হিন্দু ধর্ম পুনরুদ্ধারে ভারতীর মত নারীর

সহায়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতী সেই কর্ম সম্পাদন করে গেছেন। তাই ভারতীর এই ভূমিকার কথা বিবেচনা করে রাহাতুন্নেছা লিখছেন—

> হিন্দুধর্ম উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত শংকরাচার্য যতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিশ্চয়ই ভারতীর প্রাপ্য।[৬৩]

১৩১৯ সালের *ভারত-মহিলা* পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'খনা' নামক প্রবন্ধটি। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ খনার জীবনের কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন। খনার জ্যোতিষবিদ্যায় দক্ষতা দেখে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁকে দশরত্ন হিসাবে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। একজন নারী হিসেবে এত জ্ঞান তাঁর শ্বশুর বরাহ ও স্বামী মিহির সহ্য করতে পারেন নি। তাই তাঁর জিভ কেটে নিয়েছিল তারা। কিন্তু এখনও পৃথিবীর জ্যোতিষবিজ্ঞান খনাকে স্মরণ করে।

এই দুটি প্রবন্ধ থেকে রাহাতুন্নেছা আসলে দেখাতে চেয়েছেন প্রাচীন ভারতে নারীরা শিক্ষা সাধনায় কত উন্নত ছিল। তাঁর সময়ের নারীরা যেন এই সব মহীয়সী নারীর উত্তরাধিকারকে মনে রাখে। সমাজের চাপে তাঁদের সেই প্রতিভা নিষ্পেষিত হলেও সত্য চাপা থাকেনি। তিনি এটাও দেখাতে চেয়েছেন নারীদের প্রতি সামাজিক যে বঞ্চনা সেদিনও কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর সময়েও তাই।

এই প্রবন্ধ দুটির সূত্রে রাহাতুন্নেছার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবনাটি বোঝা যায়। সেই সময়ে অনেক মুসলিম বাঙালির মধ্যে অতীত গৌরবের কথা বলতে গিয়ে আরবের মুসলিম বীর চরিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার প্রবণতা দেখা গেছে। কিন্তু রাহাতুন্নেছা প্রাচীন ভারতের বীর নারীদের গুণপনা বর্ণনা করছেন। আর এঁদের গুণেই ভারতের গৌরব। একথা রাহাতুন্নেছা মনে করেন—

> অদ্যাপি ভারতবর্ষে জ্যোতিষের গৌরব লুপ্ত হয় নাই, পাশ্চাত্য জগৎ এখনও তাহার গুণকীর্তন করিতেছে। এই সমস্ত গৌরব-কীর্তি খনার কীর্তি-মন্দিরে রাশীকৃত হইতেছে।[৬৪]

আমরা দেখলাম বাঙালি মুসলিম নারীর যে পদযাত্রা উনিশ শতকের শেষ থেকে শুরু হয়েছিল তা নতুন করে প্রাণ পায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনে। একদিকে স্বদেশ কেন্দ্রিক ভাবনা জাগ্রত হয়। তেমনি ইংরেজের ধর্মীয় বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে মিলাবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও দেখা যায় তাঁদের লেখায়। নারীর নিজস্ব মুক্তির দাবিটি তো ছিলই। তবে স্বদেশী আন্দোলনে নারীর যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বোধের অনুভুতি নারীমুক্তি আন্দোলনে আরও গতি সঞ্চার করেছিল। তাই বিভিন্ন জায়গায় নারীরাই মেয়েদের জন্য স্কুল, কর্মশালা গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব মুক্তি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য। এইসব বাঙালি মুসলমান নারীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এবং তাঁরা আজ প্রায় বিস্মৃতির অতলে। তবুও তাঁরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি ভিত অন্তত গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। রোকেয়ার সাথে সাথে খায়েরুন্নেসা, মাসুদা রহমান, এম ফতেমা খানম, নুরুন্নেসা বিদ্যাবিনোদিনী, মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেছা প্রমুখরা নারীর নিজস্ব মুক্তি ও বিশ্বজগতের অগ্রগতির দিকে একটি দিক চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলেন। সেই পথ ধরে আগামী প্রজন্মের পথ চলা। এবং আবার নতুন করে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করা। সেই কাজটি করেছেন এঁদের ভাবী প্রজন্ম।

তথ্যসূত্র

১. 'শিক্ষাব্রতী খায়েরুন্নেসা',আখতার, শাহীন, ভৌমিক, মৌসুমী (সম্পা), *জানানা মহফিল* , স্ত্রী প্রকাশক, ১ম প্রকাশ- জানু ১৯৯৮, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃ- ৩৬, ৩৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬,৩৭।

৫. রফিক, আহমদ, *নারী প্রগতির চার অনন্যা* , কথা, কলকাতা ৭০০০৪৭, ১ম প্রকাশ-জানু ২০০৯, মূল্য- ৮০টাকা, পৃ- ৩৮।

৬. খায়রুন্নেসা, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' খায়েরুন্নেসা, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়',*নবনূর* , ৮ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৩১১, সম্পাদক- এমদাদ আলী, সৈয়দ; সংকলিত- ভট্টাচার্য, সুতপা(সংকলন ও সম্পা), *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক,* সাহিত্য অকাদেমি, ৫ম মুদ্রণ: ২০১৪, মূল্য- ১৫০টাকা।

৭. খায়েরুন্নেসা, প্রাগুক্ত, *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৭।

৮. খায়েরুন্নেসা, প্রাগুক্ত, *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৭।

৯. খায়েরুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', *নবনূর* , আশ্বিন, ১৩১২, সম্পাদক- এমদাদ আলী, সৈয়দ; *থির বিজুরি* , 'সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫-১৯১১', মাঘ ১৪১১, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, সম্পাদক- সাহা, অপূর্ব, মূল্য- ৫০টাকা, পৃ- ১২৪।

১০. খায়রুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', প্রাগুক্ত, *থির বিজুরি,* পৃ- ১২৫।

১১. খায়রুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', প্রাগুক্ত, *থির বিজুরি,* পৃ- ১২৫।

১২. খায়েরুন্নেসা, উদ্ধৃত, রফিক, আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯।

১৩. খায়েরুন্নেসা, উদ্ধৃত, রফিক, আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯।

১৪. তেজস্বিনী মিসেস এম রহমান, *জানানা মহফিল,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৩

১৫. জামান, সিদ্দিকা, উদ্ধৃত, *জানানা মহফিল,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৯।

১৬. রহমান, মাসুদা, 'সদনুষ্ঠান "কথা বনাম কাজ"', সংকলিত- *জানানা মহফিল,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫।

১৭. রহমান, মাসুদা, 'পর্দা বনাম প্রবঞ্চনা', *সওগাত* , ভাদ্র ১৩৩৬ সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৯-৭১।

১৮. রহমান, মাসুদা, 'বাড়বানল', *বিজলী*, ২ চৈত্র ১৩২৯, সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১-৫২।

১৯. রহমান, মাসুদা, 'বাড়বানল', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫২।

২০. রহমান, মাসুদা, 'বাড়বানল', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩।

২১. রহমান, মাসুদা, 'বাড়বানল', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫২।

২২. রহমান, মাসুদা, 'আমদের স্বরূপ', *ধূমকেতু* , ২১ আশ্বিন ১৩২৯, সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।

২৩. রহমান, মাসুদা, 'আমদের স্বরূপ', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।

২৪. রহমান, মাসুদা, 'আমদের স্বরূপ', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭।

২৫. রহমান, মাসুদা, ' শান্তি ও শক্তি', *ধূমকেতু* , ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৯, সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬।

২৬. রহমান, মাসুদা, ' শান্তি ও শক্তি', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬।

২৭. রহমান, মাসুদা, 'আমদের স্বরূপ', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩।

২৮. রহমান, মাসুদা, 'আমদের দাবী', *ধূমকেতু,* ২ আশ্বিন ১৩২৯, সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২।

২৯. রহমান, মাসুদা, 'আমদের দাবী', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬০।

৩০. রহমান, মাসুদা, 'আমদের দাবী', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২।

৩১. রহমান, মাসুদা, 'আমদের দাবী', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২।

৩২. রহমান, মাসুদা, 'মা ও মেয়ে', উদ্ধৃত- হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১*, প্রথম প্রকাশ- মে, ২০০৬, ২য় সং- জুন,২০১৪, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, মূল্য- ২০০টাকা, পৃ- ১২৯।

৩৩. রহমান, মাসুদা, 'আমদের দাবী', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬২।

৩৪. রহমান, মাসুদা, 'আমদের দাবী', সংকলিত- *জানানা মহফিল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩।

৩৫. খাতুন, নুরুন্নেসা, উৎসর্গ পত্র, 'স্বপ্নদ্রষ্টা' উপন্যাস, *নুরুন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী,* বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, সংস্করণ- ১৯৭০, মূল্য- ১৬টাকা।

৩৬. খাতুন, নুরুন্নেসা, প্রাগুক্ত।

৩৭. খাতুন, নুরুন্নেসা, প্রাগুক্ত।

৩৮. খাতুন, নুরুন্নেসা, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সংঘ সভানেত্রীর অভিভাষণ, *সওগাত,* মাঘ ১৩৩৩ সংকলিত- *জানানা মহ্ফিল,* প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৯-১১০।

৩৯. খাতুন, নুরুন্নেসা, 'স্বপ্নদ্রষ্টা', বানু, খাদিজা, 'মানবতাবাদী চেতনা ও সাহিত্যিক নুরুন্নেছা খাতুন', *পথিকৃৎ,* আগষ্ট ২০১৬, বাহান্ন বছর দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক- মানিক মুখোপাধ্যায়, দাম- তিরিশ টাকা, পৃ- ৬০-৬১,।

৪০. খাতুন, নুরুন্নেসা, 'আমাদের কাজ', *সওগাত,* ১৩৩৬, উদ্ধৃত- বানু, খাদিজা; প্রাগুক্ত, পৃ- ৬০।

৪১. খাতুন, নুরুন্নেসা, 'আমাদের কাজ', উদ্ধৃত- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ,*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* , পৃ- ৫৫৬।

৪২. খাতুন, নুরুন্নেসা, 'মুক্তি আন্দোলন', উদ্ধৃত- বানু, খাদিজা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬১।

৪৩. খাতুন, নূরুন্নেসা, 'আমাদের কাজ', উদ্ধৃত- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ,*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* , পৃ- ৫৫৬।

৪৪. চৌধুরী, সেলিনা, 'প্রকাশিকার নিবেদন', বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৪, উদ্ধৃত- *জানানা মহফিল,* প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫।

৪৫. আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, 'ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত, এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ', সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বেবী মওদুদ, "প্রথম আলো", প্রতিচিন্তা, ৮ জুন ২০১৭, protichinta.com

৪৬. ফজল আবুল, 'ফতেমা খানম', "সমকাল" ১৯৫৭, উদ্ধৃত-*জানানা মহফিল,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৬।

৪৭. ফজল আবুল, 'ফতেমা খানম', উদ্ধৃত-*জানানা মহফিল,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৬।

৪৮. ফজল আবুল, 'ফতেমা খানম', উদ্ধৃত-*জানানা মহফিল,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৬।

৪৯. খানম ফাতেমা, 'দিদারুলের সাহিত্য প্রতিভা', "মাসিক সঞ্চয়", ফাল্গুন - চৈত্র ১৩৩৬, উদ্ধৃত- *জানানা মহফিল,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৩।

৫০. খানম ফতেমা, দিদারুলের সাহিত্য প্রতিভা, পূর্বক্ত, পৃ- ৮৩।

৫১. আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, 'ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত, এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ', প্রথম আলো প্রাগুক্ত।

৫২. মওদুদ, বেবী, প্রথম আলো, প্রাগুক্ত।

৫৩. খানম ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', *শিখা* ১৯৩০, ইসলাম, মুস্তাফা, নূরউল (সম্পাদিত ও সংকলিত), *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১), ১ম প্রকাশ জুন ২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, মূল্য- দুই শত পঞ্চাশ টাকা। পৃ- ৪৯৭।

৫৪. খানম ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১), প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৯৩।

৫৫. খানম ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১), প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৯৪।

৫৬. আবুল, 'ফতেমা খানম', উদ্ধৃত- *জানানা মহফিল*, পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৯।

৫৭. আবুল, 'ফতেমা খানম', উদ্ধৃত- *জানানা মহফিল*, পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৮।

৫৮. 'ছোট গল্পকার এম ফতেমা খানম, জানানা মাহফিল, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৬।

৫৯. খানম ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৯৬।

৬০. রোকেয়া, 'স্ত্রী জাতির অবনতি', ঘোষ, অনিল(সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, কথা, কলকাতা ৭০০০৪৭, কথা সংস্করণ- ২০১৪, মূল্য- ৪০০টাকা, পৃ- ২৩।

৬১. ফজল আবুল, 'ফতেমা খানম', উদ্ধৃত- *জানানা মহফিল*, পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৭।

৬২. ভট্টাচার্য, সুতপা (সংকলন ও সম্পা), "বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক", সাহিত্য অকাদেমি, ৫ম মুদ্রণ: ২০১৪, মূল্য- ১৫০টাকা।

৬৩. রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ, 'ভারতী', *ভারত মহিলা* , ভাদ্র, ১৩১৯। সংকলিত- ভট্টাচার্য, সুতপা, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭১।

৬৪. 'খনা', ১৩১৯, *ভারত মহিলা* । সংকলিত- ভট্টাচার্য, সুতপা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭৩।

চতুর্থ অধ্যায়

রোকেয়া পরবর্তী বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে)

চতুর্থ অধ্যায়

রোকেয়া পরবর্তী বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলন (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে)

নবজাগৃতির চিন্তার প্রভাবে বিশ শতক থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজে কিছুটা অংশে হলেও এক অন্য রকম পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে রোকেয়া সহ অন্যান্য নারীদের মহৎ প্রচেষ্টা, লেখালিখি এবং অন্যদিকে মুসলিম সমজেরই ভিতরে আধুনিকতার চিন্তা নাড়া দিয়েছিল। তাঁরাই নিজেদের স্ত্রী, বোন, কন্যাকে শিক্ষিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই পর্বে আধুনিক চিন্তায় আলোকপ্রাপ্তা বহু মুসলমান মহিলাই মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা দাবি করেন। মুসলিম পুরুষদের বহুবিবাহ, তালাক প্রথার বিরোধিতা করেন তার সাথে পর্দা প্রথা, বাঁদী প্রথার বিরুদ্ধতা করেন। শুধু তাই নয় রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল মেয়েদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন করবেন। তারা জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবেন। এই পর্বে আমরা সেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন মুসলিম মেয়েদের দেখতে পাব। কেউ কেউ অনন্য নজির সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছেন। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন সহ রাজনৈতিক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়েছেন। রোকেয়ার পরবর্তী সময়ে তাঁর মহান কাজকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে নারীর মুক্তি ও সমাজ প্রগতির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁরা। রোকেয়া পরবর্তী সময়ে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা(১৯০৬-১৯৭৭), রাজিয়া খাতুন(১৯০৭-১৯৩৪), সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯), ফজিলতুন্নেসা(১৯০৫-১৯৭৫), শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪), জাহানারা ইমাম(১৯২৯-১৯৯৪), আছিয়া মজিদ এঁদের মত দৃঢ়চেতা যুক্তিবাদী মনীষার বলিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টায় রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত ধারাটি আরও শক্তিশালী খাতে প্রবাহিত হয়।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

সে যুগের চরম পর্দার অন্তরালে যখন মুসলিম রমণীদের ইহজগতের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ঐতিহ্যবাদের পদতলে আত্মাহুতি দিচ্ছিল সেই সময় মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা সেই অবগুণ্ঠনকে ছিন্ন করে অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বার বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হলেও সেই বিয়েকে অস্বীকার করে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং অবরোধ প্রথাকেও তিনি মানেননি। *সওগাত* সম্পাদক নাসিরুদ্দীন লিখছেন —

> ১৩৩৭ সালে হঠাৎ করে একদিন তিনি (মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা) ১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রীটে অবস্থিত সওগাত কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। সমাজের সেই অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে মুসলিম নারীরা যখন অবরোধের কঠোর প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলেন, সে সময় এই তরুণীকে দেখলাম আধুনিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে মুক্তভাবে চলাফেরা করতে। আশ্চর্যের বিষয় তার মাথায় চুলগুলি ছিল 'বব' কাট।[১]

সে যুগের অর্থে যা ছিল চরম দুঃসাহসিক কাজ। বাল্য বিবাহের এই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তিনি নিজের জীবনে যেমন প্রতিবাদ করেছেন তেমনি পরবর্তীকালে কলম ধরেছেন তিনি—

> সমাজের খামখেয়ালী প্রথামত প্রত্যেক কুমারীকে বিবাহ দিতেই হইবে। যে কুমারীর বিবাহ সে বিবাহ করিতে সম্মত কিনা বা সে বিবাহের উপযুক্ত কিনা, বা এখন বিবাহ হইলে ইহার ফল কি দাঁড়াইবে এসব দিকে সমাজের যেন দেখিবার কিছুই নাই। নারীসমাজের মূর্খতা ও অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ তা বলাই বাহুল্য। ফলে নারীর কত না দুর্গতি।[২]

এই দুর্গতির থেকে মুক্তির পথ শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পথ। কিন্তু সে পথে মুসলিম মেয়েদের যাতায়াতে সমাজের প্রতি পদে বাধা। সেই বাধা মূলত অহেতুক পর্দা প্রথা থেকে। আর সেই পশ্চাৎপদতার জন্য 'বিশেষভাবে' পুরুষ সমাজকেই দায়ী করেছেন মাহমুদা খাতুন—

> মুসলিম নারী যে শিক্ষায় এতদূর পশ্চাদপদ ইহা বাস্তবিক দুঃখের বিষয়। ইহার একটি বৃহৎ কারণ অহেতুকী পর্দা। এই কুসংস্কার নারী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে এবং নারী জাতির প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্য ইহাও অপর এক বৃহৎ কারণ; আর ইহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সেজন্য পুরুষেরাই বিশেষভাবে দায়ী।[৩]

কিন্তু এই বন্দীদশা থেকে মুক্তির কোনও আকাঙ্ক্ষাই মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত হয়নি। ধর্মীয় চিন্তার মৌতাতে, পরলোকের পুন্যার্জনের আগ্রহে ধর্মীয় সমস্ত বিধানকে মেনে নেওয়া হত। জীবন সম্পর্কে মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে উন্নত ও আধুনিক ধারণা ছিল না। অন্দরমহলের বাইরের বৃহৎ জগতের মাধুর্য সম্পর্কে তিনি সজাগ হতে বলছেন—

> কেবলমাত্র খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই যে জীবন ধারণের আসল উদ্দেশ্য নহে, ইহাতেই যে জীবনের সফলতা আসে না, ইহা অপেক্ষাও যে জীবনের বৃহৎ কর্ত্তব্য আছে, ইহা তাহাদের(মুসলিম অন্তঃপুরিকাদের) বোধগম্য নহে।[৪]

মাহমুদা খাতুন নারীর জন্য পর্দা, অবরোধ, বাল্য বিবাহ, শিক্ষাহীনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে যেমন কলম ধরেছেন তেমনি তৎকালীন সামাজিক বিষয়গুলি নিয়েও লিখেছেন। সামাজিক বিষয়ের উন্নতিতে যে শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহণ করবে তা নয়। মেয়েদেরও এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বাংলার বৃহৎ কৃষক সমাজের যে নিদারুণ দুর্দশা তা মোচনের জন্য শিক্ষিত ভদ্র জনসাধারণের যে ঔদাসীন্য তাকে সমালোচনা করছেন —

> পল্লীই যে দেশের প্রাণ, হিন্দু ও মুসলমানের তিনভাগ লোক পল্লীতেই বাস করে। তাহার মধ্যে মুসলমানই অধিক। এই শ্রেণীর লোকেরাই দেশের অন্ন যোগাইয়া থাকে। যাহারা পৌষে ভাত যোগাইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মরণের দ্বারে গিয়া পৌঁছায়, তাহাদের দিকে সুধীজনের দৃষ্টি পড়ে না।[৫]

এই কাজে ভদ্র সমাজ অপারগ বলে মাহমুদা মেয়েদেরকেই এগিয়ে আসতে বলেছেন কৃষকদের উন্নতির জন্য। তাদের যতটুকু সাধ্য ততটা করবার আবেদন করেছেন। ডোবা ভরাট, বন জঙ্গল সাফ করার মত কাজ করা তখনকার দিনে কৃষক

শ্রমজীবী পরিবারের মেয়েদের ছাড়া অন্য মেয়েদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলছেন—

> যিনি যতটা পারেন, বাড়ীতে মক্তব খুলিয়া দুইদশজন বালিকাকে শিক্ষা দান করা বোধ হয় কাহার পক্ষে তেমন কষ্টকর হইবে না। তাহাতে অন্ততঃ কিছু আলো ছড়াইয়া পড়িবে। ইহারই ভিতর দিয়া তাহাদের কুসংস্কারগুলি দূর করিতে পারা যায়।[৬]

মাহমুদা খাতুনের 'সাহিত্য ও আর্ট' প্রবন্ধ থেকে তাঁর সাহিত্য ও আর্ট সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন সাহিত্যের সাথে নীতি আদর্শের সম্পর্ক আছে। শিল্পের জন্যই শিল্প এই চিন্তাকে তিনি বিরোধিতা করেছেন। শুধুমাত্র সৌন্দর্য ও রস সৃষ্টি আর্টের উদ্দ্যেশ্য হতে পারে না। তিনি লিখছেন —

> আমরা যদি মনে করি আর্ট জিনিষটা কেবল মাত্র সৌন্দর্য্য ও রস সৃষ্টি করার জন্যই তাহা হইলে আমরা ভুল করিব, কারণ নীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা যাহাই করি না কেন, তাহাতে অমঙ্গলের আশা আছে। নীতির অপব্যবহারে সৌন্দর্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।[৭]

অর্থাৎ মাহমুদা মনে করেছেন আর্ট অবশ্যই সামাজিক নীতি ভিত্তিক হওয়া উচিৎ। তবে এও মনে করেন আর্টের যেহেতু বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আছে তাই তা শুধু নীতি সর্বস্ব হওয়া উচিৎ না —

> তাই বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি না যে সাহিত্যক্ষেত্র নীতি বাক্য হউক, তাহা হইবে না, হইতে পারে না।[৮]

সাহিত্যে দেখা যায় মেয়েরা স্বামী সংসার ছেড়ে দেশের কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে— এ বিষয়কে তিনি এই প্রবন্ধে নীতি বহির্ভূত মনে করছেন। মনে হয় মেয়েদের অনেক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সংসার প্রতিপালন প্রধান কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। অনেকে মেয়েদের বহির্মুখী স্বভাবকে সাহিত্যের বিষয় নির্বাচিত করলেও তা সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। মাহমুদা খাতুনও স্বীকার করতে পারেননি। যদিও তিনি নিজে বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করে স্বামীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর এমন

উক্তি গবেষককে বিস্মিত না করে পারেনি। সেক্ষেত্রে তাঁর আপোষহীন বিদ্রোহী জীবন যাপন বর্তমান গবেষকের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

ফজিলতুন্নেসা

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনকে বিলেতে যাওয়ার সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ১৯২৮ সালে ফজিলতুন্নেসা বলেছিলেন- 'কত অপমান সহ্য করে আমি এম এ পর্যন্ত পাশ করেছি, তা আপনি হয়তো শুনে থাকবেন। ... ... আমার সংকল্প ছাড়া অন্য কোন সম্বল নেই'।[৯] এই সংকল্পেই ফজিলতুন্নেসা অনন্য। তিনিই সে যুগের একমাত্র মুসলিম মহিলা যিনি নিজেই নিজের জীবন গড়েছেন। নিজস্ব সংকল্পে ভর দিয়ে একটু একটু করে নিজেকে রচনা করেছিলেন তিনি। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় অসামান্য ফল, বিলেত যাওয়া, বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হওয়া, ঢাকা শহরের ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল হওয়া এ সবই তাঁর সংকল্পের জোরে। কলকাতা কেন্দ্রীক মুসলমান সমাজে মেয়েদের শিক্ষার একটা স্বীকৃতি দান শুরু হলেও ঢাকায় মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখনও উপলব্ধি হয়নি। কিন্তু নিজে অন্তত বন্দিনী হয়ে থাকবেন না তা তিনি নিজে স্থির করে রেখেছিলেন। তিনি যখন ১৯২৩ সালে বেথুন কলেজে বি এ পড়তে যান তখন একমাত্র মুসলিম ছাত্রী তিনি, হোস্টেলের একমাত্র মুসলিম বোর্ডার তিনি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের একমাত্র মুসলিম ছাত্রী তিনি। তিনি যখন বোরখা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন তখন তাঁকে ইঁট-পাটকেল সহ্য করতে হত প্রায়ই। *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* বইয়ে *সওগাত* সম্পাদক নাসিরুদ্দিন লিখছেন —

> তখন ঢাকা শহরের মুসলমান সমাজের মনোভাব নারীজাতি সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। কোনও মুসলমান মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছেলেদের সাথে একত্রে ক্লাসে বসে লেখাপড়া করবে একথা তাদের কল্পনার অতীত ছিল। ফজিলতুন্নেসা যখন বোরখা ছাড়া শাড়ি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন তখন তাঁর প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হত; কিন্তু তিনি বিচলিত না হয়ে নিজের কৃতিত্বে স্কলারশিপ পেয়ে এবং কঠোর পরিশ্রম করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন।[১০]

কিন্তু জীবন ও সমাজ সম্পর্কে ফজিলতুন্নেসার ধারণা ছিল ব্যতিক্রমী। এই ব্যতিক্রমধর্মীতাই হয়তো তাঁকে ভিন্ন পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করেছে। যেমন সমাজ সম্পর্কে বলেছেন- জগৎ পরিবর্তনশীল। সে যুগে মুসলিম সমাজের একজন নারীর পক্ষে এমন মৌলিক ধারণা বেশ বিরল। জগৎ যখন পরিবর্তনশীল তখন তার ধ্যান ধারণা, রীতি নীতি মূল্যবোধ কোনটাই স্থায়ী ও স্থানু নয়। অতএব নবীন সভ্যতার নতুন চিন্তার অভিঘাতে আধুনিক নারী সমাজকে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান তিনি—

> জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই বিংশ শতাব্দীর ঝড়ো হাওয়া বহুকাল সুপ্ত মুসলিম নারীর প্রাণেও বেশ কিছু কম্পন জাগিয়ে তুলেছে। তারা একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ও জগতের অন্যান্য নারীর দিকে চেয়ে দেখেছে; এবং তাদের তুলনায় নিজেদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন দেখে বিশেষভাবে লজ্জিত হয়ে পড়ছে। নারীত্ব ভুলে গিয়ে, নিজের আমিত্ব ভুলে গিয়ে শুধু ভোগ্য বস্তু হয়ে থাকা আর নারী সহ্য করবে না। নারী এতকাল নিজেকে মোহ-আবরণে ঢেকে রেখে এই বিচিত্র পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে- কিন্তু আজ অনুতপ্ত নারী প্রাণ সেই কুৎসিৎ বিলাসের ফাঁসি ছিন্ন করে বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে চাচ্ছে।[১১]

ভারতবর্ষ মুসলমানের দেশ কিনা এবং এদেশীয় ভাষা তার ভাষা কিনা এ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। কিন্তু ফজিলতুন্নেসার চিন্তা জগতে ধর্ম, ভাষা নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠনের যে ধারণা সমাজকে দোলা দিচ্ছিল তাকে তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলছেন— ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা গড়ে ওঠেনা। একটি জাতি গড়ে ওঠে 'সমদেশিকতার' ভিত্তির উপর। তার সাথে ভারতীয় মুসলমানের আরব, তুরস্ক পারস্যের দিকে চেয়ে এদেশের নীতি নির্ধারণকে ঠিক চোখে দেখেননি ফজিলতুন্নেসা। তিনি লিখছেন—

> তাদের (মুসলমান শিশুদের) ভাল ক'রে বুঝাতে হবে যে, তাদের মাতৃভূমি আরব, পারস্য, তুরস্ক বা মিসর নয়। তাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, এবং তারা ভারতবাসী! জাতীয়ত্ব গড়ে ওঠে 'সমধর্ম্মে'র ভিত্তির উপর নয়, 'সমদেশিকতা'র ভিত্তির উপর। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি ইউরোপের

> জাতিসমূহ এবং আমেরিকাবাসী সকলেই খ্রীষ্টান। কিন্তু সে জন্য ফরাসী দেশীয় কোন খৃষ্টানই আপনাকে জাতিতে জার্ম্মান বা ইংরেজ ব'লে পরিচিত করতে প্রয়াসী হবে না। ... . সেই রকম, ভারতবর্ষের মুসলমানও ভারতবাসী, অন্য পরিচয়ে তাদের গর্ব্ব করবার কিছু তো নেই-ই, বরং লজ্জার বিষয়ই আছে। তাদের আরও শিখাতে হবে যে, ভারতের যে-প্রদেশে তারা জন্মেছে, তার ভাষাই তাদের মাতৃভাষা, তার পরিচ্ছদই তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ এবং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ভারতবাসী মাত্রই তার আপনার জন।[১২]

ফজিলতুন্নেসার ধর্ম সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়। তাঁর মতে ধর্ম প্রত্যেকের নিজস্ব চর্যার বিষয়। তাই জাতীয় জীবনে এর প্রভাব থাকা সমীচীন নয়। এবং পরধর্ম মত সহিষ্ণুতা ও উদার শিক্ষা গ্রহণই অন্যকে এই বিষয়ের চর্চা করাতে পারে।[১৩]

মেয়েদের সংগ্রামের মূল হাতিয়ার আধুনিক শিক্ষা। যদিও সে শিক্ষাও সে কালের সমাজে যথাযথ ছিল না। একদিকে প্রাচীন চিন্তার দৃঢ় শৃঙ্খল আরেকদিকে আধুনিক চিন্তার মুক্ত হাওয়ার মাঝে এদেশের নারীকে ঐতিহ্যবাদ ও কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। মুসলিম সমাজে এই প্রবণতা ছিল আরও প্রবল। ফজিলতুন্নেসা তাই তরুণদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

> শিক্ষা হিসেবে আমাদের দেশ জগতের অন্য সব দেশের তুলনায় কত পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। নারী শিক্ষার আয়োজন আবার এরই মধ্যে আরও কত অসম্পূর্ণ। তার মাঝেও আমাদের সম্প্রদায়ের এই অসম্পূর্ণতা অনেক বেশী।[১৪]

কারণ মুসলিম সমাজের পর্দা ও অবরোধ মুসলিম নারীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বহু যুগের মিথ্যা মর্যাদাবোধ পুরুষতন্ত্রের প্রভাব থেকে মুসলিম নারীর চিন্তাকে মুক্ত না করতে পারলে মুসলিম সমাজের অর্ধেক অংশ যে সম্পূর্ণ সমাজকে নিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাবে এই সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন ফজিলতুন্নেসা। তাই অন্তঃপুর থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তিনি। মুক্তি চেয়েছেন পর্দা প্রথা

থেকে। নারী পুরুষের সেবাদাসী নয়, সহযোগী। এই উপলব্ধির মধ্যে যে আত্মসম্মান রয়েছে, সে আত্মসম্মানবোধ থেকে মুসলিম নারী চির বঞ্চিত। সে শুধু অন্তঃপুরের দাসী। পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী। এর বাইরে তার যে অস্তিত্ব আছে সে সম্বন্ধে মুসলিম সমাজ নীরব। ফজিলতুন্নেসা লিখছেন—

> যেখানে স্নেহ নাই, মমতা নাই, সম্মান নাই, আছে কেবল পরাধীনতা, অন্যায় অবিচার, আধুনিক শিক্ষা সেখানে স্বাধীনতা ও পূর্ণ অধিকার জোর করে আদায় করবার সাহস দিয়েছে। নারীকে আজ প্রাণ খুলে বলতে শিখিয়েছে 'স্বাধীনতা চাই, আত্মার মুক্তি চাই'। নারীকে আজ বলতে শিখিয়েছে 'আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করব। আমরা জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করব, প্রতি গৃহে মঙ্গলদ্বীপ জ্বালিয়ে জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করব। আমরা স্নেহে, মমতায়, দয়ায়, সেবায় ঘরে ঘরে শান্তিবারি সিঞ্চন করব। আমরা কুসংস্কার পদদলিত করে জগতের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হব।[১৫]

সমাজ সম্পর্কে, শিক্ষা সম্পর্কে ফজিলতুন্নেসা যে অনন্য ধারণা পোষণ করতেন তাকেই জীবনে ধারণ করে নিজের মধ্যে সেই সংকল্পকে স্থির করেছিলেন। যে সংকল্পের মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যযুগীয় অন্ধ সমাজের যাবতীয় পশ্চাদপদতাকে অতিক্রম করার স্পর্ধা অর্জন করেছিলেন। যে স্পর্ধার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছেন। তাঁর লেখা গুটিকয় প্রবন্ধে তারই আভাস পাওয়া যায়।

শামসুন নাহার মাহমুদ

শামসুন নাহারের জন্ম ১৯০৮ সাল। সেই সময় মুসলিম সমাজের অন্দরমহল স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে একটু একটু প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদিও সমাজপতিদের সাথেও লড়তে হচ্ছে। লড়তে হচ্ছে সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত অবরোধ ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে। যদিও শামসুন নাহারের পরিবারে লেখাপড়ার চল ছিল। তাঁর পিতামহ ও তাঁর ভাইয়েরা সবাই শিক্ষিত ছিলেন। কথিত আছে এই কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রপিতামহীকে 'রত্নগর্ভা' উপাধি দিয়েছিলেন। তবে শামসুন নাহার পরিবারের প্রথম মেয়ে যিনি স্কুলে গিয়েছিলেন। তাঁর

মাতামহ আব্দুল আজিজ নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছিলেন 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী'। অথচ অবরোধ ও পর্দার সংস্কার এতটাই গভীর যে এমন একটি পরিবারে জন্মেও ষষ্ঠ শ্রেণীর পরে শামসুন নাহারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয় নিয়ে ছোটো থেকেই তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন রচনায় তা প্রকাশ পেয়েছে। *নজরুলকে যেমন দেখেছি* গ্রন্থে শামসুন নাহার লিখছেন—

> ন'বছর বয়সে ফরমান জারি হলো স্কুল ছাড়তে হবে। সেই থেকে বাড়ি বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করি। বছরের পর বছর কাটে। চোখের সামনে সহপাঠী হিন্দু, ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চান মেয়েরা অবাধে চলাফেরা করে, ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে যায় ম্যাট্রিক পাশ করে কেউ কেউ পড়তে যায় কলকাতা বেথুন কলেজে, ডায়োসিসন কলেজে। মাঝে মাঝে তারা চিঠিপত্র দেয়, তাতে থাকে নতুন দুনিয়ার ইঙ্গিত। আমাদের পাশের বাড়ি বৌদ্ধ পরিবারের মেয়ে, স্কুলে আমার চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রী, 'দিদি' জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী(পরে *বিলেত দেশটা মাটির* প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা জ্যোতির্মালা দেবী) চট্টগ্রাম, কলকাতা ও রেঙ্গুনে পড়াশুনা করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত পাড়ি দিলেন। মনে হয় আমরা অন্ধকারের জীব, আর ওরা আলোর দেশের বাসিন্দা। দিনের পর দিন মনের মধ্যে গুমরাতে থাকে বিদ্রোহ।[১৬]

শামসুন নাহারের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *পুন্যময়ীর* ভূমিকায় এই ক্ষোভ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহী মনকে শান্ত করতে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। সেখানে ছিল পর্দা প্রথার চরম বাড়াবাড়ি। ছাত্রী ও শিক্ষক কেউ কারুর মুখ দেখতে পেতেন না। মাঝে থাকত পর্দা। পর্দার নীচ থেকে খাতা বিনিময় করে চলত পড়াশুনা। এই প্রসঙ্গে মাতামহ মাস্টার মশাইকে যুক্তি দিয়েছিলেন—

> কিছু মনে করবেন না, সমাজের মন রক্ষা না করে চললে যে বিয়ে হবে না। তারই জন্য এই ব্যবস্থা।[১৭]

এই পদ্ধতিতে পড়াশুনা করেও শামসুন নাহার কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর কলেজে ভর্তী হওয়ার জন্য শামসুনের নতুন লড়াই শুরু হল। ইতিমধ্যে মাতামহও মারা গেছেন। অভিভাবকহীন মায়ের ক্ষেত্রেও সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

মেয়েকে কলেজে ভর্তী করা কঠিন কাজ। তাই মা মেয়েকে কলেজে ভর্তী করার অনুমতি দিতে পারছেন না। ওদিকে শামসুন নাহার কলেজে ভর্তী হওয়ার জন্য হাঙ্গার স্ট্রাইক ডেকে বসেছেন। পরিবার এই লড়াইয়ের সম্মান জানিয়ে কলেজে ভর্তী করলেন। কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসামান্য রেজাল্ট করলেন শামসুন নাহার। এরই সাথে সাথে একজন উদার আধুনিক চিন্তার পাত্রের খোঁজ চলল, যিনি শামসুনের উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই শর্তে ডাক্তার ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ শামসুন নাহারকে বিবাহ করলেন। এই বিবাহ শামসুন নাহারের জীবনে আধুনিক জীবনের মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। এইভাবে শিক্ষাজীবনের একের পর এক সোপান অতিক্রম করেন তিনি। ১৯২৮ সালে আই এ পরীক্ষায় পাশ করেন। বি এ পাশ করেন ১৯৩২ সালে। এই কৃতিত্বে রোকেয়া সম্বর্ধিত করেন তাঁকে। ৩২ বছর আগে রোকেয়া মেয়েদের যে স্বনির্ভর করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাস্তবায়ন দেখতে পান তাঁরই হাতে গড়া শামসুন নাহারের মধ্যে। রোকেয়া সেদিন বক্তৃতায় বলেছিলেন—

> আমার সেই বত্রিশ বৎসর পূর্বের মতিচূরে কল্পিত লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টারের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে- আমার এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? অনেকেই আরব্ধ কাজের সমাপ্তি নিজের জীবনে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। যে বাদশাহ্ কুতুবমিনার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আমার মিনারের সাফল্য আজন আমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম।[১৭*]

বি এ পাশের পর লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দিলেও পড়াশুনা থেমে থাকেনি। অধ্যাপনার সাথে সাথে এম এ পড়ার কাজটিও সম্পন্ন করেন। শামসুন নাহারের জীবনে পড়াশুনা যেমন একটি প্রেরণা দায়ক অধ্যায় তেমনি তাঁর জীবনে বিচিত্র কর্মকাণ্ড গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটা দিকচিহ্ন রেখে গেছে। একদিকে রাজনৈতিক সামাজিক কাজ অন্যদিকে লেখালিখি পত্রিকা সম্পাদনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি নজরুল, রোকেয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এগিয়ে গেছেন তাঁর অভীষ্ঠ লক্ষ্যে। তাই শামসুন নাহারের রচনায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পাই। একদিকে রাজনৈতিক সামাজিক

প্রবন্ধ লিখছেন। লিখছেন নারীর অধিকার নিয়ে। অন্যদিকে নজরুল, রোকেয়া সহ মুসলমান সমাজের প্রতিভাশালী মনীষাদের জীবনী রচনা করেছেন। আবার লিখছেন শিশুর বিকাশের জন্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী রচনা। তুলে ধরেছেন নিজের ছাত্রী জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনি।

শামসুন নাহারের প্রথম প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ *পুন্যময়ী* (১৯২৫)। এই গ্রন্থে তাপসী রাবিয়া, নবী কন্যা ফাতেমা, মাতা আয়েশা, জননী খোদায়জা, সাধ্বী হাজেরা, পতিব্রতা রহিমা, দেবী সায়রা ও পুন্যমতী রহিমা এই আটজন মহীয়সী মুসলিম নারীর জীবন কাহিনী লিখেছেন। তিনি লিখছেন— দশ বছর বয়সে মাইনর পাশ করার পর স্কুল শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় *পুন্যময়ী* রচনায় হাত দিয়েছিলেন।[১৮] এঁদের সম্বন্ধে পাঠ করে নিজে এক মানসিক জোর সেই বয়সেই অর্জন করেছিলেন।

সে যুগের অদ্বিতীয় মনীষা রোকেয়াকে দেখেছেন অনেক কাছ থেকে। বড় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রোকেয়ার সাহচর্যে এগিয়ে গেছেন। *বুলবুল* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে *রোকেয়া জীবনী* প্রকাশিত হয়েছে। রোকেয়ার কর্মজীবনের সেই সীমাহীন প্রচেষ্টা ধরা পড়েছে সে লেখায়। এই গ্রন্থের শেষের দিকে শামসুন নাহার তাঁর মা সম্বন্ধে লিখেছেন। তাঁর মায়ের আধুনিক মনন শৈশব থেকেই চারিত হয়েছিল শামসুন নাহারের মধ্যে। তিনি বিশ্বের বড় বড় মানুষদের জীবন কাহিনী শোনাতেন। তাঁদের জীবনের মহত্বগুলো শৈশবেই মুদ্রিত করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন সন্তানদের মনে। রোকেয়ার মৃত্যুর পর আঞ্জুমানে খাওয়াতীন ইসলামের দায়িত্ব তুলে নেন অনেকাংশে।[১৯]

শামসুন নাহারের তৃতীয় জীবনী গ্রন্থ *বেগম মহল* (১৯৩৮) পাঠান-মুঘল বিদুষী রমনীদের জীবন কাহিনী। মুঘল-পাঠান রমণীর জীবনী হলেও তা আসলে নারী মুক্তি আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। একদিকে মুসলিম নারীদের কাছে যেমন মুসলমান রমনীর বলিষ্ঠতা তার নিজস্ব শক্তি সম্বন্ধে বার্তা দিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে মুসলমান সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন তার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে।

শামসুন নাহারের পড়াশুনা সহ অনেক দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলামের সেদিনের অনেক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী ছিলেন শামসুন নাহারও। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন স্মৃতিকথাধর্মী রচনা—*নজরুলকে যেমন দেখেছি*(১৯৫৮)। এই রচনার সূত্রে সেদিনের মেয়েদের অবস্থান, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের চিত্রটি ধরা পড়ে।

শামসুন নাহার ও তাঁর দাদা হবিবুল্লাহ বাহার(১৯০৬ - ১৯৬৬)এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত *বুলবুল* সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বহু লেখা সম্পাদনার সাথে সাথে তার সম্প্রদায় সম্প্রীতির ভাবনার দিকটি ধরা পড়ে। একাধিক ভাতৃঘাতি দাঙ্গার বিরুদ্ধে *বুলবুল* এর অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথ এক দৃঢ় আশা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন—

> আত্মবিচ্ছেদ ও ভাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী কোথাও ধ্বনিত হতে পারলে একে আমি শুভলক্ষণ মনে করি। ... . এই দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের নির্বোধ জড়ত্বে যে বেদনার সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে তোমাদের পত্রে তারই লক্ষণ সূচীত।[২০]

নারীর নিজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য লিখেছেন প্রবন্ধ। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে। শামসুন নাহারের প্রথম প্রবন্ধ 'নারী জাগরণী' ১৩৩৩ সালে বার্ষিক *সওগাত* এ প্রকাশিত হয়। সেই সময় নারীর অবস্থা নিয়ে লিখছেন—

> বাংলার মুসলমান নারীর স্কন্ধে অবরোধ ও অশিক্ষার যে বিপুল জগদ্দল শিলা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারই গুরু ভারে বঙ্গ নারী গৃহকোণে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে। ঘনঘোর পর্দার আবরণ ভেদ করিয়া সুপ্তিমগ্নামোসলেম নারীর কানে এখনও জাগরণের সুর প্রবেশ করে নাই; কর্ণে প্রবেশ করিলেও অজ্ঞতার কৃষ্ণ আবরণ ছিন্ন করিয়া তাহাদের মর্ম স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবরোধের বিষময় ফলে আজ তাঁহারাও গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত।[২১]

আর এর কারণ সামাজিক কু-প্রথা। যার সাথে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। অবরোধ প্রথার ফলে শুধু যে যে নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাই নয়। বিপুল স্বাস্থ্য সম্পদ লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে শুধু নারীরাই নয় বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পথটি পিছিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। 'ইরানে নারী জাগরণ'(*সওগাত*, ১৩৩৪, শ্রাবণ) প্রবন্ধে তিনি নারীর এই পশ্চাদপদতার কারণ হিসাবে পুরুষ সমাজকে দায়ী করেরছেন তিনি। শাসক হিসাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ঘরের কোণে আটকে রাখতে চেয়েছে নারীকে। শামসুন নাহার বলছেন—

> যুগে যুগে সব কালে পুরুষ চাহিয়াছে নারীকে পেছনে রাখিতে- সোনার শিকলে বাঁধিয়া নারীর গতি রোধ করিতে। পুরুষ তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনা লইয়া দিগ্বিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর নারী অন্ধ অন্তঃপুরের মূর্খতা ও কুসংস্কারের জটিল কুটিল বেষ্টনীর মধ্যেই ঘুরিয়া মরিয়াছে।[২২]

এই কারণেই মেয়েদের অগ্রগতি স্তব্ধ এবং পুরুষ এগিয়ে চলেছে। তিনি ইরানে মেয়েদের অগ্রগতির সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেন যে মুসলমান শাসিত দেশ হলেও মেয়েদের সামগ্রিক সে দেশের পুরুষের থেকে ভাল। তিনি লিখছেন—

> পারস্যের মহিলা প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে অনেক উন্নত। এই মহা জাগরণের যুগে তাঁরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, শক্তির দিক দিয়া, প্রতিভার দিক দিয়া, নারী মোটেই ছোট নয়। নারী যদি পুরুষের সঙ্গে সমান পদবিক্ষেপে চলিতে না পারে— তা তার শক্তি খর্ব বলিয়া নয়, তার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল বলিয়া নয়—বরং সুযোগের অভাবই তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।[২৩]

এবং সুযোগ পেলে মেয়েরা যে পুরুষকেও ছাপিয়ে যেতে পারে ইরানের মেয়েদের অগ্রগতি তা প্রমাণ করে বলে শামসুন নাহার বলছেন। এত বাধা সত্বেও ভারতবর্ষের কতিময় মুসলিম মহিলা উচ্চ শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন প্রাণপণে। তার মধ্যে ফজিলতুন্নেসা, জমিলা সিরাজুদ্দীন ছিলেন অগ্রগণ্য। জমিলা সিরাজুদ্দীন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি পাওয়ার পর 'কুমারী জমিলা সিরাজুদ্দীন' পি.এইচ.ডি' (*সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) একটি প্রবন্ধ লেখেন শামসুন নাহার।

মুসলমান সমাজের শত বাধার প্রাচীর টপকে একজন নারীর এই সাফল্য তাঁকে খুবই উৎফুল্ল করেছিল সন্দেহ নেই। মুসলিম সমাজও যাতে একজন নারীর এই সাফল্যে গর্ব অনুভব করে তার জন্য সমাজের কাছে আবেদন রেখেছেন—

> সম্প্রতি খবর আসিয়াছে মিস জমিলা এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি.এইচ.ডি উপাধি পাইয়াছেন। মুসলমান সমাজে পি.এইচ.ডি'র সংখ্যাই মুষ্টিমেয়, এ অবস্থায় একজন বন্দিনী নারীকে এই উচ্চ উপাধি লাভ করিতে দেখিয়া অনেকেই হয়তো স্তম্ভিত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হই নাই মোটেও। যে সমাজে এক সময় শত শত বিদুষী জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সে সমাজে ফজিলাতুন্নিসা বা সিরাজুদ্দীনের জন্মত অসম্ভব নয়ই, বরং খুবই স্বাভাবিক। তবে তার জন্য চাই সুযোগ, চাই শিক্ষা, চাই সাধনা।[২৪]

সেই সময়ে বিশ্বের কতিপয় সফল ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিজের অধ্যবসায় ও কঠিন পরিশ্রমে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন মাদাম কুরি(১৮৬৭-১৯৩৪)। মাদাম কুরির জীবন ছিল তাই খুবই অনুপ্রেরণার। এবং তা যদি নারী সমাজ অনুভব করে সেই সংগ্রামের পথে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে তাই মাদাম কুরির জীবন নিয়ে লিখেছিলেন- 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী বৈজ্ঞানিক'(*সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)।

১৯৩৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন বিষয়ে 'আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন' (*বুলবুল*, বৈশাখ ১৩৪৩) শীর্ষক একটি প্রতিবেদনধর্মী রচনা প্রকাশিত হয় তাঁর। বিশ্বের অগ্রণী নারী সমাজের সাথে ভারতের নারীদের এই যোগসূত্র বিশেষভাবে তাঁকে আপ্লুত করেছিল। তিনি লিখছেন—

> বিশ্বনারী ও ভারত নারীর মধ্যে এবার রচিত হইল এক অপূর্ব মধুর মমতা ও দরদের সম্পর্ক। প্রগতির পথে ভারতনারী এই দিক দিয়া ভারতের পুরুষকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন, ইহা লক্ষ করিবার বিষয়।[২৫]

তাঁর এই প্রতিবেদনটি পাঠ করলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেরও সেই সময়ের নারীমুক্তি আন্দোলনের একটা রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। সম্মেলনে প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়গুলি দেখলে তা বোঝা যায়। শামসুন নাহার লিখছেন-

> গ্রাম সংস্কারে বালিকাদের শিক্ষা পদ্ধতি, মেয়েদের সমাজসেবা, শিশু পালন, চলচ্চিত্র, স্কুলের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নারীর আইনগত অধিকার, নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার, মাতৃমঙ্গল, নারী ও শিশু ক্রয় বিক্রয়, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়া সম্মিলনে আলোচনা হয়।[২৬]

এই সম্মেলনে উপস্থিত রুমানিয়ার প্রতিনিধি প্রিন্সেস কান্তাকুজেন ভারতীয় মহিলাদের কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এবং বলেছিলেন সুযোগ পেলে ভারতীয় মেয়েরা ইউরোপের যে কোনও উন্নত সভ্য জাতির মেয়েদের সাথে পাল্লা দিতে পারেন।[২৭] এই ঘটনা তৎকালীন নারী সমাজকে উদ্দীপ্ত করেছিল নিশ্চিৎ।

১৯৩৫ সাল নাগাদ ভারতবর্ষে নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও বেশ কিছু সমস্যা থেকে যায়। একই বছরে ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রদেশগুলিতে নির্বাচনের জন্য 'হ্যামন্ড কমিটি' গঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলার মেয়েদের হয়ে মতামত প্রদানের জন্য এন সি সেন ও শামসুন নাহার প্রতিনিধি হিসাবে যান কমিটির কাছে। সেই ভাবনা সমৃদ্ধ রচনা- 'বাংলা কাউন্সিলে মহিলা সিট ও হ্যামন্ড কমিটি'(বর্ষবাণী, তৃতীয় বর্ষ, ১৩৪২) ও 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার'(*সওগাত*, মহিলা সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪২)।

'বাংলা কাউন্সিলে মহিলা সিট ও হ্যামন্ড কমিটি' প্রবন্ধে বাংলার নারীরা ভোটদানের ব্যাপারে কতটা বঞ্চিত হয়েছিলেন তা জানা যায়। শুধুমাত্র কলকাতা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি শহর কেন্দ্রীক অঞ্চলগুলির মেয়েরা ভোট দিতে পারার স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিল। অন্যান্য মফঃস্বল কিম্বা গ্রামীন এলাকার মেয়েরা ভোটদানের অধিকার পায়নি। তাই শামসুন নাহার লিখছেন—

> ভোটাধিকার যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হওয়া উচিত, ইহাই আমাদের মত। সুতরাং প্রথম হইতে সমগ্র বঙ্গদেশকে বাদ দিয়া শুধু কলিকাতা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে মহিলা নির্বাচন কেন্দ্রকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাবেরই আমরা বিরোধী ছিলাম।[২৮]

শুধু তাই নয়। মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশগুলিতে লিখতে পড়তে পারা মেয়েরা ভোটাধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু বাংলা সহ আরও দু-তিনটি প্রদেশের জন্য ভোট দানের ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক পাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার' প্রবন্ধে শামসুন নাহার লিখছেন—

> বাংলার মেয়েরা কিন্তু এই ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকল সমাজে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী অনেক মেয়ের চেয়ে বেশি উন্নত, অথচ ম্যাট্রিক পরীক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করিবার সুযোগ তাঁহাদের হয় নাই। এই শ্রেণীর মহিলাদের এমনও কেহ কেহ আছেন— স্ত্রী শিক্ষা ও নারী প্রগতি আন্দোলন যাঁহাদের জীবনের ব্রত। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুসারে ইহারা নিজ শিক্ষার গুণে ভোট দিবার অধিকার পাইলেন না।[২৯]

এই যে অব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। এবং এদেশের প্রত্যেকটি নারীর দেশের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রদানের গুরুত্বের কথা বলেছেন—

> দেশের শাসনযন্ত্র আগাগোড়া সমস্তই ওলট পালট হইয়া গেল-কত কত জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হইল; অথচ অত বড় বড় মস্তিষ্ক বর্তমান থাকিতে এবং শত শত প্রকার নির্বাচন পদ্ধতি তাঁহাদের জানা থাকিতে বঙ্গ নারীর জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই হইয়া দাঁড়াইল অসম্ভব। ... . দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রত্যেকটি নারী যেদিন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইবেন সেদিন এদেশের ইতিহাসে বাস্তবেই এক নূতন যুগের সূচনা হইবে।[৩০]

শামসুন নাহারের লেখায় এই প্রত্যয় ব্যক্ত হয়— বাংলার মুসলিম সমাজের নারীরা চিরদিন এই-পর্দার অবরোধে বন্দী থাকবে না। নারীমুক্তি আন্দোলনে আরও নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে আরও বহু যোদ্ধার অংশগ্রহণ তিনি প্রত্যাশা করেন। বিস্তৃত মানব সমাজের মহাসাগরে মুসলিম সমাজ নিছক গোষ্পদ হয়ে নিজের সংস্কারে আটকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না- এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। একদিন সেও এই সমাজে মৈত্রীভাবে মিলিত হয়ে

আধুনিক চিন্তা আদর্শ ও জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার অন্দরমহলের দরজা খুলে দেবে। জগতের আলো হাওয়ার স্বাভাবিক যাতায়াতে মুসলিম নারীরাও সজীব হবেন— জ্ঞানে, চিন্তায়, যুক্তিতে।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরী

রাজিয়ার পড়াশুনা শুরু হয় ছোটোবেলায় বাড়ির মসজিদের ইমামের কাছে। তাঁর মামা তাঁকে বাংলা, উর্দু, ফার্সি, ইংরেজি শেখান। ছোটোবেলা থেকেই রাজিয়ার লেখালিখি শুরু হয় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। যদিও *সওগাত* পত্রিকায় তাঁর কিছু গদ্য প্রকাশিত হয়। রাজিয়ার যুগে আলোকপ্রাপ্তা নারী সমাজের যে মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ছিল পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষেত্রেও তা ভিন্ন ছিল না। পর্দা প্রথার অবসান ও নারীর চিন্তা ও ভাবগত স্বাধীনতাই তাঁর লেখার বিষয়বস্তু। যদিও লেখিকা হিসাবে রাজিয়া বাংলা সাহিত্য আকাশে ছিলেন ক্ষণস্থায়ী। ফলে অল্প পরিসরে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে সে সময়ের নারী মনের আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনেও তার প্রভাব থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁর মেয়ে রাবেয়া খাতুন চৌধুরী বলছেন —

> আম্মা ইংরাজী, বাংলা, ফারসি তিনটে ভাষা জানতেন। বিয়ের পর আম্মা যখন শুয়াগাজির গ্রামের বাড়িতে আসেন, তখন উনি লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন। রান্নাবান্না খুব ভাল পারতেন না। ... ... গ্রামের মেয়েদের আমার মা লেখাপড়া, সেলাই মানে— গ্রামের মেয়েরা ওনার উপর নির্ভরশীল ছিল, যে কোনও ব্যপারে আম্মার পরামর্শ নিত, যেটা আমাদের জমিদার বাড়িতে দুর্লভ ছিল। আম্মা জমিদার বাড়ির নিয়মটাই পালটে দিয়েছিলেন। জমিদার বাড়ির শ্রেণীবিভাগটা।[৩১]

তাঁর রচনা তাঁর এই ব্যক্তিত্বময় নারীসত্তার নিদর্শন দেয়। নারীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি নারীর চিন্তাগত ও ভাবগত স্বাধীনতার কথা বলেছেন —

> স্বাধীনতার অর্থ রাস্তায় নাচিয়া বেড়ানো নয়, আমরা চাই প্রকৃত মুক্তি, যা মনকে উন্নত, মহান, পবিত্র, স্নিগ্ধ ও দৃঢ় করে; নিজের ধর্ম ও সত্যের সহিত

> পরিচিত করে; অন্তর্জগত ও বহির্জগতের বিভিন্ন তথ্য আমাদের মনোগোচর করিয়া দেয়।[৩২]

এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি একমাত্র সম্ভব শিক্ষার্জনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই চিন্তার অন্ধতা দূর করে আলোকপ্রাপ্তি সম্ভব। যা অন্তর্জগত ও বহির্জগতের তথ্য মনোগোচর করতে পারে। কিন্তু মুসলিম সমাজের অন্দরমহল সে শিক্ষা থকে বঞ্চিত, পর্দানসীন বলে। নারী পুরুষের সেবাদাসী। এটাই সমাজের বিধান। 'সতীত্ব'এর মিথ্যে মহত্ত্ব দিয়ে ক্রীতদাস নারীকে মহিমান্বিত করার এই সামাজিক রীতি পুরুষতন্ত্রেরই তৈরি। রাজিয়া খাতুন বলছেন —

> এই সতী শব্দটা একটা প্রহেলিকা। ইহা নারীদের প্রতি সর্বস্থানে এবং যখন তখন প্রয়োগ করা হয়— কিন্তু পুরুষের প্রতি প্রয়োগ করার মত ইহার প্রতিশব্দ, বাংলা বা এমন সভ্য ইংরাজী ভাষা তাহাতেও নাই। 'সতীত্ব' chastity এসব বুলি একমাত্র নারীর জন্যই একচেটিয়াভাবে তৈরী হইয়াছে।[৩৩]

অথচ এই মিথ্যা গৌরবে নারীর বৈবাহিক জীবন সম্পন্ন হয়ে চলেছে। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে পুরুষের মন জুগিয়ে তার মনোরঞ্জন করে তার সম্পর্কের স্থায়ীত্ব নির্ধারিত হয়ে চলেছে। সে বন্ধনের যাবতীয় দায়িত্ব নারীর। পুরুষের সেখানে কোনও দায়িত্বই নেই। তাই সে বহুগামীতার চর্চা করার অধিকার পেয়ে চলেছে সমাজে। আর বেচারী নারী সতীত্বের মিথ্যা গৌরবে গৃহবন্দী জীবন যাপন করে চলেছে। এক্ষেত্রে রাজিয়া এই সম্পর্কের মহিমা খুঁজে পাননি। বলেছেন এ আসলে সমঝোতার ভিত্তিতে দাসীবৃত্তি শুধু নয় এ হল গণিকাবৃত্তি—

> আমরা বারাঙ্গনাদিগকে ঘৃণা করি; কিন্তু ঘরে ঘরে গণিকাবৃত্তি চলিতেছে, সেদিকে লক্ষ্য করি না। স্বামী ভালবাসে না, তবু তাকে রূপ যৌবন ও বেশভূষার আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে না, তবুও নিত্য নব সাজে সজ্জিত হইয়া তাহার মন ভুলাইতে হইবে। ইহাকে শুদ্ধ ভাষায় 'পাতিব্রত্য' বলিতে চাও বল, কিন্তু আমার মতে তাহা ঠিক উলটো।

> স্বামী যদি ভালোবাসে তবে স্ত্রীও মনোরঞ্জন করিবে- তাই বলে গণিকা সাজিবে কেন?[৩৪]

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানীর চিন্তার মত এমন ধরণের চিন্তা শুধু সেই যুগে নয়, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতেও বলিষ্ঠ চিন্তা হিসাবে দাবি রাখে।

সুফিয়া কামাল

একজন মুসলিম নারী হিসেবে সুফিয়া কামাল অন্তঃপুরের অন্ধকার দেখেছেন অনেক গভীরে। একবিংশ শতকে জন্মগ্রহণের সূত্রে তৎকালীন নানান সমাজ সংস্কার আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, শ্রমিক বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন তিনি। সংস্পর্শে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১), নজরুল(১৮৯৯-১৯৭৬), মহাত্মা গান্ধী(১৮৬৯-১৯৪৮), বেগম রোকেয়ার মতন মহান মণীষীর। সেই সময়ে তাঁর জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই তাঁর আত্মচরিত *একালে আমাদের কাল* [৩৫] (১৯৮৮) গ্রন্থে। এছাড়া ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে লেখা তাঁর বিভিন্ন গদ্য রচনা চিঠিপত্রে সেই সময়ের সামাজিক আন্দোলন এবং নারীর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

আমি মাত্র সেকালে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, দেশীয় প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার যতটুকু জানতে পেরেছি তাই লিখে রাখব - কবি সিকান্দার আবু জাফরের(১৯১৯ – ১৯৭৫) অনুরোধে নিজের জীবন কথা লিখতে বসে সুফিয়া কামাল একথা লিখছেন।[৩৬] শায়েস্তাবাদে মাতামহের আদরে লালিত পালিত হয়েছেন পিতার স্নেহ বঞ্চিত সুফিয়া। মাতামহের মহল ছিল পুরোপুরি মোগলাই আদব কায়দা, হালচাল। মামারা ব্যারিস্টার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের বড়কর্তা। কিন্তু কেউই বেশিদিন গোলাম হয়ে চাকরি করতে পারেননি। কেউ ছয় মাস কেউ বড়ো জোর দু বছর চাকরি করে বাড়ীতে আয়েশ করেছেন অথবা লাইব্রেরী খুলেছেন। একদিকে এই অভিজাত মেজাজ অন্যদিকে এক অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে সুফিয়ার বেড়ে ওঠা। সুফিয়া লিখছেন—

> মক্তব-মসজিদ-লঙ্গরখানা, স্কুল-পাঠাগার, হিন্দু কর্মচারীদের পূজা-পার্বন অনুষ্ঠান- উৎসব আনন্দ ছড়ানো একটি পরিবেশ। ছোটোবেলায় এসব আনন্দ-উৎসবে শরীক হতে বাধা ছিল না। বারো মাসে তের পার্বন লেগেই থাকতো।

> তখনকার জমিদারেরা শাসন করতেন কড়া হাতে আবার পালন করতেন উদার মন নিয়ে। ঈদে-বকরীদে সারা রাজ্যের প্রজারা এসে নামাজের পর জড়ো হয়ে জমিদারের সাথে কোলাকুলি করত। মামারা ঘেমে যেন বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। তবুও গলা মেলাবার পালা ক্ষান্ত হতনা। সবাই খেতে বসত। একসাথে হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে।[৩৭]

অসাম্প্রদায়িক মননের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের সাথে একাত্মতার পাঠ তাঁর শৈশবেই জন্ম গড়ে উঠেছিল। সারা জীবনব্যাপী মানুষের প্রতি এই অনুভূতি আমরা অনুভব করতে পারি। এই জীবন কাহিনীর অনেকাংশ জুড়েই আছে মানুষের জন্য তাঁর অন্তরের গভীর সহমর্মীতার প্রতিচ্ছবি ।

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধেও সুফিয়ার মন তৈরি হয়েছিল শৈশবেই। অন্যান্য জমিদারদের মত জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য সুফিয়ার মাতামহ কিম্বা মামাদের ইংরেজের সাথে দহরম মহরমের সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। সুফিয়া কামাল লিখছেন—

> ইংরেজ শাসনকালে বড় বড় মুসলিম পরিবারের নওয়াব আমীররা যে কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন ইতিহাসে সেকথা লেখা আছে। তাই লাখেরাজ শায়েস্তাবাদ পরগণার জমিদারদের থেকেও খাজনা আদায় করে নিতে ইংরেজ সরকার দেরী করেনি। কিন্তু তবুও নদী পার হয়ে শায়েস্তাবাদে কোনও ইংরেজ কর্মচারীর ঢুকবার অধিকার ছিলনা। আমরা ছোটবেলায় তা দেখেছি। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট যেই আসুক আগে লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ে তবে আসতে পারত।[৩৮]

সুফিয়া কামালের সময় ছিল একদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম জনসাধারণের নবজাগরণের আলোতে জেগে ওঠা এবং রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লবের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি। এই সময়ের আঁচে তিনি তাপিত যে হয়েছিলেন তা উল্লেখ করেছেন—

> আমরা জন্মেছিলাম পৃথিবীর এক আশ্চর্যময় রূপায়নের কালে। প্রথম মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম রেনেসাঁর পুনরুত্থান, রাশিয়ান বিপ্লব, বিজ্ঞান

> জগতের নতুন নতুন আবিস্কার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবরূপ সূচনা, এসবের শুরু থেকে যে অভাবের মধ্যে শৈশব কেটেছে তারই আদর্শ আমাদের মনে ছাপ রেখেছে সুগভীর করে।[৩৯]

১৯১১ সালে জন্ম নেওয়া সুফিয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন না দেখলেও তার আঁচ অন্দর মহলে কিছুটা যে পড়েছিল তা জানিয়েছেন। বিলাতি দ্রব্য বয়কট হয়েছিল। এমনকি তাঁর নানা সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যদের নিরাপত্তা দিলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে ইংরেজ তাঁকে তলব করে। কিন্তু সে ডাকে সাড়া না দিয়ে বাড়িতেই চরকা বসান তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ এরই মাঝে নতুন করে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে। সেদিন সুফিয়া সবটা না বুঝতে পারলেও তাঁর শিশুমনে একটা অন্যরকম আবেগ অনুভুত হত—

> নিত্য-নতুন অতিথি আসা-যাওয়ায় নিত্য-নতুন বাইরের খবরও কিছুটা অন্দরমহলেগিয়ে পৌঁছাত। নতুন দুনিয়ার খবর কানে আসত। প্রথম মহা যুদ্ধের শেষে, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ণ জোয়ার। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বপ্ন দেশ স্বাধীন করা। নিজের অধিকার বুঝে নেওয়া। তখন শৈশব কাটেনি। তবুও কিসের একটা আবেগ মনকে দোলা দিত।[৪০]

এই শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এর সাথে সাক্ষাৎ তাঁদের রচনার মাধ্যমে। রোকেয়া(১৮৮০-১৯৩১), সারা তাইফুর, মোতাহেরা বানুর লেখা পড়ে শৈশব থেকে লেখার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সুফিয়ার। পরবর্তীকালে একদিকে কবি ও অন্যদিকে সমাজসেবী হয়ে এঁদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করেছিলেন সুফিয়া।

বাল্যবিবাহের সাক্ষী ছিলেন সুফিয়াও। মাত্র বার বছর বয়সে ১৯২৩ সালে মামাত ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। কলেজ ছাত্র নেহাল হোসেন ছিলেন উদার মনস্ক, নারী শিক্ষার সমর্থক। তাঁর সাহচর্যে সুফিয়ার সাহিত্য সাধনা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বৃদ্ধি পায়। যদিও এই সাহায্যের জন্য পরিবার থেকে নেহাল হোসেনকে অনেক পারিবারিক গঞ্জনা শুনতে হয়।[৪১] এই সময়ের ঘটনা নিয়ে সুফিয়া লিখছেন—

> বারো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেল। তখনও কি আত্ম প্রকাশের সাধ্য ছিল? শায়েস্তাবাদ ছেড়ে বরিশাল এলাম। বরিশালে অশ্বিনী বাবুর ভাইয়ের ছেলে 'তরুণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করলেন। লেখা চাই। আমার স্বামী সে পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। তখন তাঁর মনে হল আমিওত লিখি। ২/৩টা লেখা নিয়ে সম্পাদককে দেখাতে একটি গল্প কবিতা মনোনীত করলেন[৪২]

সুফিয়ার প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ' প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেই লেখার প্রশংসা করে আরও লেখার তাগাদা আসল। কিন্তু সেই লেখা বড় মামা দেখতে পেয়ে যার পর নাই রেগে গেলেন। বরিশালের পাট চুকিয়ে সুফিয়াকে ফিরে যেতে হল শায়েস্তাবাদে। মামা ছয় মাসের জন্য কলকাতা গেলে সুফিয়া ফিরে গেলেন বরিশালে। সাহিত্য সাধনা, সামাজিক কাজ চলতে লাগল আবারও।

> সুকুমার দত্তের স্ত্রী বি-এ পাশ করে বরিশাল এলেন— মাতৃমঙ্গল, শিশুসদন, সমিতি করলেন। বরিশাল বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে সভা হত, বোরখা পরে বন্ধ ঘোড়ার গাড়ী করে সাবিত্রী দিদির সাথে যেতাম। কী হাস্যকর সে যাত্রা। তবুও কী অসীম তৃপ্তি লাভ করতাম অসহায়া-অশিক্ষিতা মায়েদের শিশুদের সাথে। আরও হিন্দু মহিলারা ছিলেন। আমার তখনও কৈশোর কাটেনি। বন্ধু স্থানীয় ছেলেরা হাসত বলত, ওদের (সাবিত্রীদিরও তখন ছেলেমেয়ে হয়নি) নিজেদেরই ছেলেমেয়ে নেই, ওরা আবার শিশু মঙ্গল করে। আমরা জেদ করে আরও বেশী করে উৎসাহ দেখাতাম।[৪৩]

কৈশোর অবস্থা থেকেই এইভাবে তাঁর সামাজিক কাজে হাতেখড়ি হয়। স্বদেশী আন্দোলনে গান্ধীজীর ডাকে চরকা কাটায় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। গান্ধিজী বরিশালে এলে তাঁকে দেখতে যাওয়ার ব্যাকুলতা নিরসন হয় হিন্দু বউয়ের মত কাপড় পরে সিঁদুর রাঙিয়ে। এই বেশে বাইরে বেরুতে কেউ বুঝতে পারেনি আমীর মুসলমান ঘরের বিবাহিত নারীর প্রকাশ্যে বেরুবার কথা। গান্ধীজীকে নিজ হাতে চরকা কেটে কাপড় উপহার দেওয়ার সেদিনের সেই স্মৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন সুফিয়া—

> দেখলাম সেই সময় গান্ধী মহাত্মাকে। নিজের হাতের কাটা সুতা তাঁর হাতে দিতে পেরে সেদিন কী যে আনন্দ ও গৌরব বোধ করেছিলাম। সেই দিনের সে সব স্মৃতি অক্ষয় সম্পদ আমার।[৪৪]

রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই সুফিয়ার চোখ দিয়ে। তাঁর সাথে সুফিয়ার মনের যোগাযোগ ছিল গভীরে। তাঁর জন্মদিনে সুফিয়া একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার প্রত্যুত্তরে রবি ঠাকুর আরও একটি কবিতা সাথে জোড়াসাঁকো যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সুফিয়া গেলেন একদিন জোড়াসাঁকোতে। কবিগুরুর সাথে সেদিনের সেই মোলাকাতের খুশীভরা মুহূর্তের বর্ণনা করছেন সুফিয়া—

> সাদর আমন্ত্রণ জানালেন কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যেতে। গেলাম একদিন বোরখা পরে। সে মূর্তি দেখে তিনিও বলেছিলেন, তুমি এত ছোট, এত কচি, ভেবেছিলাম বেশ ভারিক্কি কোন মহিলা হবে তুমি। আর যখন শুনলেন বরিশালে আমার বাড়ী তখন বলেছিলেন, 'তুমি আমার বেয়াইয়ের দেশের মানুষ। তোমার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক আর মধুর মিষ্টি তুমি।'
>
> লজ্জায় আমার যে কি অবস্থা হয়েছিল। তিনি ছিলেন সুরসিক সুন্দর মনের মানুষ।[৪৫]

তারপর কতবার তাঁর বাড়ীতে গিয়েছেন। তাঁর নিজের অভিনয় করা নাটক দেখতে সুফিয়াকে ডেকেছেন। নিজে হাতে নাম লিখে তাঁর *গোরা* বইখানা তাঁকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর বাড়ীতেই দেখা হয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে। মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে।

নজরুল এবং সুফিয়ার সম্পর্ক ছিল ভাই বোনের। সেই সময় অনেক মুসলিম মেয়ের উন্নতির জন্য নজরুল অনুপ্রেরণার আলোকশিখা হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তেমনি এক ভূমিকা নিয়ে নজরুল এসেছিলেন সুফিয়ার জীবনে।

> হঠাৎ এক দুপুরে প্রাণোচ্ছ্বাসের প্লাবন ছড়িয়ে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। বাসায় তখন আমার মা ও আমি ছাড়া কেউ ছিলনা। আর তাঁর 'সুফিয়া' ডাক শুনে আমরা ত হতভম্ব। কোনদিন বাইরের কোন পুরুষের সাথে দেখা করিনি। কিন্তু এঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারি? কী আনন্দে কী লজ্জায় বুক কাঁপা অবস্থায় তার সামনে আসতেই তিনি বল্লেন—

> আরে। এই তুমি। আমিত ভেবেছিলাম কী জানি এক মস্ত বড় লেখিকা। এ ত দেখি একটা পুতুল। তোমাকে আমি লুফব। কী ভয়ানক। আমি ত ভয়ে পিছিয়ে এলাম। নেবেন নাকি কোলেই তুলে। কী হাসি আর কী মমতা ভরা কণ্ঠে লেখার তারিফ করলেন।[৪৬]

সুফিয়ার জীবনে নজরুলের যেমন ভূমিকা ছিল তেমনি সুফিয়া এই দাদার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল। একবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে নজরুল দুস্কৃতিদের হাতে আহত হয়েছিলেন। সেই খবর সুফিয়া পেয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগে *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনকে ১৯২৭ সালের ৪ জুলাই প্রতিকারের ব্যবস্থা করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—

> আমার স্বামী এখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, নয়তো ওঁকে দিয়ে কাজীর খোঁজ নেওয়াতুম। আপনাকে শুধু এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়াতে পারি, আপনি ওকে দেখবেন। ওর মা হয়ে, বোন হয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। হতভাগাটাকে পথ থেকে এনে স্নেহ দিয়ে ওকে বাঁধুন। .... যদি ধরে বেঁধে কলকাতা আনতে পারেন তবেই রক্ষা। নয়তো ওর লজ্জা আমাদের লজ্জা, মোসলেম সমাজের লজ্জা, মুসলমান সাহিত্যসেবীদের লজ্জা।[৪৭]

সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দীনে(১৮৮৮-১৯৯৪)র সাথে সুফিয়ার সম্পর্ক ছিল নিতান্তই প্রীতির। মুসলমান মেয়েদের লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে *সওগাত* 'মহিলা সংখ্যা'য় লেখিকাদের ছবি সহ লেখা ছাপা হয়েছিল। মুসলিম সমাজের পক্ষে তা ছিল একপ্রকার যুদ্ধই। সেই যুদ্ধে তাঁর অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন সুফিয়া। সেদিন প্রথম যে মুসলিম মহিলার আলোকচিত্র তোলা হয়েছিল তিনি সুফিয়া।[৪৮] সুফিয়ার জীবনে নাসিরুদ্দীনের বিস্তর ভূমিকা সম্পর্কে লিখছেন—

> নাসিরউদ্দীন সাহেব আমার সুখে-দুঃখে বিপদে-শোকে অগ্রজের ভূমিকা পালন করে সদাসতর্ক স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যসাধনায় আমাকে নিয়োগ রেখেছেন। একথা আমি কখনও ভুলব না।[৪৯]

রোকেয়ার সাথে তাঁর শৈশব থেকেই পরিচয়। শৈশবে কলকাতায় গিয়ে রোকেয়ার সাথে প্রথম দেখা। সেই সময়েই রোকেয়া সুফিয়াকে চেয়েছিলেন তাঁর স্কুলের ছাত্রী হিসাবে। সুফিয়াও পড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু মায়ের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু

পরবর্তীকালে রোকেয়ার অনুগামী হয়ে নারীমুক্তির আদর্শে সামাজিক কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন সারাজীবন। *একালে আমাদের কাল* গ্রন্থে রোকেয়ার জীবন ও কর্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে লিখেছেন। রোকেয়ার সাথে তাঁর যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধেও লিখেছেন। সারা ভারতের নারীদের নিজস্ব অধিকার রক্ষার তাগিদে, তাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া উইমেন্স এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। রোকেয়া, শামসুন নাহার মাহমুদ এবং তিনি প্রথমে এই সংঘের সদস্য ছিলেন। পরে আরও মহিলাকে সেখানে যুক্ত করেছিলেন তাঁরা।[৫০]

সুফিয়া যখন কবি হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেই সময় রোকেয়া তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব পালনের জন্য—

> আমাকে ডাকতেন 'ফুলকবি' বলে। তা ফুলকবি হয়েও সমাজের কাজ করতে হবে। এইটা উনি আমাকে বলেছিলেন। তোর লেখার ভিতর দিয়ে তুই সমাজকে জাগিয়ে তোল। এই কথাটা উনি আমাকে বলেছিলেন। আমার চোখে পানি আসছে। এত সুন্দর করে কথাটা বলেছিলেন।[৫১]

আবার শামসুন নাহার ১৯২৮ সালে আই এ পাশ করলে(*একালে আমাদের কাল* এ সুফিয়া বলছেন ম্যাট্রিক পাশ করলে) এবং ১৯২৯ সালে সুফিয়া একা এরোপ্লেনে করে আকাশ পরিক্রমা করলে রোকেয়া তাঁদের সম্বর্ধনা দেন। সম্বর্ধনা দেন মিসেস রেশাদকে। মা হয়ে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় ছেলেকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সুফিয়া লিখছেন-

> নাহার ম্যাট্রিক পাশ করে এল, আর সেই সময় আমি প্রথমে এরোপ্লেনে চড়লাম। এরোপ্লেন চড়লাম বলে উনি আমাকে আর নাহারকে আর মিসেস রেশাদকে সম্বর্ধনা দিলেন একসাথে। ছেলেরাত চাইবেই যে তারা একটা বীরত্বসূচক কাজ করবে, কিন্তু মা যে ছেড়ে দিয়েছে ছেলেকে প্রথম এরোপ্লেন উড়তে এজন্য মিসেস রেশাদকে সম্বর্ধনা দিলেন। আর নাহারকে সম্বর্ধনা দিলেন এই জন্যে যে, এত বাধাবিপত্তির ভিতরে, পর্দার মধ্যে থেকে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আর আমাকে বললেন, 'ফুলকবি' তুইত এখন আসমানে উঠতে শিখেছিস, তোকে ত একটা মালা দিতে হয়, এই বলে আমার গলায় একটা মালা দিলেন।[৫২]

উল্লেখ্য একা পাইলটের সাথে একজন স্ত্রীলোকের বিমান চড়ার এই ঘটনার পর পরিবারে এবং সমাজে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। সেই ঝড় ঝাপটা থেকে স্বামী নেহাল হোসেন(১৯০৭-১৯৩২) সুফিয়াকে সামলে রেখেছিলেন। এবং রোকেয়ার সম্বর্ধনায় নিন্দা মন্দ কিছুটা স্তিমিত হয়। কিন্তু কিছুদিন বাদে নেহাল হোসেন মারা যান। ১৯৩২ সালে নেহাল হোসেনের মারা যাওয়ার পর পরিবার ও সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাঁর থেকে। লক্ষ্মীর প্রতিমা অপয়া অলক্ষ্মীতে রুপান্তরিত হয়। প্রতিনিয়ত তাঁকে নির্যাতন সইতে হত। নেহাল হোসেন এবং সুফিয়া দুজনেই নবাব পরিবারের সন্তান। অথচ বাড়ির মেয়ে হিসাবে সুরক্ষিত হলেন না। বধু হিসাবে স্বামীর মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেন নবাব পরিবারে।[৫৩] এই সময়ে লেখা তাঁর চিঠি পত্রে একজন বিধবার সামাজিক অবস্থান ফুটে উঠেছে। আবুল ফজল, মাহবুব-উল-আলমকে লেখা চিঠিতে সুফিয়ার নিদারুণ অসহায়তা ধরা পড়ে। ১৯৩৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর আবুল ফজলকে চিঠিতে লিখছেন—

> চারদিকের নিষ্পেষণে আমি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছি, আমাদের সমাজে বিধবার অবস্থা আপনাকে কি বলতে হবে নতুন করে? বিধির বিধানের উপর মানুষের বিধান বড় ভয়ানক। আমি কিছুই করতে পারছিনা।[৫৪]

তার কিছুদিন পর ২০ সেপ্টেম্বরে মাহবুব-উল-আলমের কাছে সুফিয়া লিখছেন-

> বেঁচে থাকার ইচ্ছে মোটেই নেই দাদু— অতি সত্য কথা। এ মুহূর্তে মরণ এলে আমি মরে যেতাম।[৫৫]

যদিও এই নিদারুণ অবস্থায় পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করেননি তিনি। যথেষ্ট কারণ ছিল, মা, ভাই, সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার। কিন্তু সম্মান খোয়াতে রাজি হননি তিনি। নিদারুণ পরিশ্রম করেছেন। সামান্য মাইনেতে কলকাতা করপোরেশনে চাকরি করেছেন। সেদিন তাঁর উপর যেমন দূর্ব্যবহার হয়েছিল তেমনি সহৃদয় কিছু মানুষ তাঁর মত ব্যক্তিত্বকে সুস্থ রাখতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করেছেন সুফিয়া। আবার এই দুর্বহ পরিস্থিতির মধ্যেই কত অভিজ্ঞতা তাঁর—

> ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ যে কী সর্পিল সংঘাত সংগ্রামময় জীবনধারা বয়ে চলেছিলাম দুঃস্বপ্নের মত। আবার ওরই মধ্য দিয়ে এসেছে স্নেহ, প্রেম, মমতা, ভালবাসা, সান্ত্বনা, কত হারানোর ব্যথা, কত পাওয়ার আনন্দ, বিচিত্র মানুষের মন ও জীবন।[৫৬]

এই বিপর্যস্ত জীবনে এসেছেন কামালউদ্দীন আহমদ। ১৯৩৯ সালে তাঁর বিড়ম্বিত জীবনকে সজীব করে তুলেছেন কামাল উদ্দীন আহমদ খান। অসুস্থ সুফিয়াকে না দেখেই বিবাহ করেছিলেন। তার পর থেকে আজীবন তাঁর সংগ্রামী জীবনের অংশীদার হয়েছেন। মহত্তর জীবন বোধ দুজন দুজনকে মহত্তর জীবনের দিকে চালিত করেছে। যদিও সেই দুঃসহ পরিস্থিতির মাঝেও মানুষের প্রতি দেশের প্রতি সচেতন দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছেন সুফিয়া। এই সচেতন দৃষ্টিই তাঁকে নিত্য নতুন সংগ্রামে প্রাণিত করেছে—

> আবার সচেতন দৃষ্টি মেলে দেখলাম মারী মড়ক মন্বন্তর। যুদ্ধ-সংগ্রাম, মানুষের স্বাধীনতার প্রাণপণ প্রচেষ্টা, প্রতিটি মানুষ যোগ দেয় কর্মে, আত্মমর্যাদায় বাঁচতে চেয়ে। তাই দেখলাম, এল দুকূলপ্লাবী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্লাবন। নেতাজীর সংগ্রাম 'দিল্লী চলো।' স্লোগানে মুখরিত ভারত। এল যুদ্ধ। জাপানের হিংসাত্মক সংগ্রামে কত প্রাণাহুতির চিত্র। কত মানুষের নির্যাতন, অপমান, অত্যাচার, ধ্বংসলীলা। এল 'পাকিস্তান' আন্দোলন। কী বিরাট বিপুল প্রাণবন্ত সে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবী।[৫৭]

দেশের এই উপদ্রুত পরিস্থিতিতে মানুষ নানা ভাবেই বিপন্ন হয়েছেন। সেই বিপন্ন সময়ে সুফিয়া কামাল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৪৬ এ কলকাতায় দাঙ্গার সময় দাঙ্গা দমনের জন্য ও দাঙ্গাপীড়িত মানুষদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। নিজের মেয়ে ও মরিয়ম মনসুরের মেয়ে জাকিয়া মনসুরকে নিয়ে কলকাতা লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ সেন্টারে শরণার্থী শিবির পরিচালনা করেন।[৫৮] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। সেই সময়ে তাঁর কবিতা 'প্রতিকারে' তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৯৪৭ সালে *সওগাত* 'মহিলা সংখ্যা' *সাপ্তাহিক বেগম* এ রূপান্তরিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৪৭ এর ২০ জুলাই যখন এই পত্রিকা বেরুচ্ছে তখন স্বাধীনতা, মুসলিম রাষ্ট্র গঠন সবই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তারই প্রতিফলন পাওয়া যায়—

> মুসলিম সমাজ আজ এক কঠোর দায়িত্ব গ্রহণের সম্মুখীন। অর্জিত স্বাধীনতা, সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে হলে কেবল পুরুষেরই নয়, মুসলিম নারীকেও এগিয়ে আসতে হবে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে।[৫৯]

নারীমুক্তি আন্দোলনে নিয়োজিত যোদ্ধা সুফিয়া তো চাইবেনই নতুন রাষ্ট্রে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্‌কালে সেই আশাই ব্যক্ত হয়েছে সম্পাদয়কীয়তে লেখা সুফিয়ার কলমে। দেশভাগের পর স্বাধীন দেশে সুফিয়া কামালের জীবন সংগ্রাম ও রচনা একই প্রবহমানতা নিয়ে নতুন এক দিগন্তের দিকে যাত্রা করে। তা পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব।

আছিয়া মজিদ

আছিয়া মজিদ সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। মূলতঃ মহম্মদ নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত *সওগাত* পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ থেকে তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু ধারণা করা যায়। তাঁর প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে নারী শিক্ষার বিজয় যাত্রার আভাস মেলে। ধর্মীয় অন্ধতা ও পর্দার অবরোধ থেকে ক্রমে মুক্ত হয়ে মুসলিম সমাজের নারীরা যে আধুনিক চিন্তায় কতটা শিক্ষিত হচ্ছিল তার একটা ধারণা পাই আছিয়া মজিদের লেখা থেকে।

প্রথমত, তাঁর নামের সাথে বি এ কথাটি থেকে বোঝা যায় তিনি স্নাতক হয়ে গেছেন ১৯৩৩ সালেই। এই শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে পরিবার পরিজন ও সমাজের সাথে কতটা লড়াই করতে হয়েছে তার সন্ধান করতে না পারলেও সেই সংগ্রামের কাহিনি অনুধাবন করা যায়। অন্তত *সওগাত* যুগে তাই সম্ভব ছিল। যদিও তাঁর লেখা যতটা পাওয়া যায়, তাতে শিক্ষার্জনের জন্য সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, পর্দা, অবরোধ প্রসঙ্গে কোনও কথার উল্লেখ নেই। প্রায়োগিক দিক নিয়েই আলোচনা বেশি। অর্থাৎ নারীর শিক্ষা কেমন হওয়া উচিৎ, তার পাঠ্য কেমন হওয়া উচিৎ, তাদের জন্য বিষয় নির্বাচন কেমন হওয়া দরকার এসব নিয়েই আলোচনা। বিরুদ্ধ পরিবেশ যতটুকু আলোচিত হয়েছে তাতে শিক্ষাঙ্গনে নারী পুরুষের অসাম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন।

> মেয়েদের শিক্ষা বর্ত্তমানে একটি বিরাট সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুরুষদের জন্য মোটামুটি ধরণের শিক্ষাপ্রণালী

> আবিস্কার করিতে সমর্থ হইলেও নারীদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক।[৬০]

লক্ষ্য করার মত বিষয় হল, অন্যান্য মুসলিম লেখিকারা যখন পর্দা আর অবরোধের সামনে নারীর শিক্ষার অধিকার বিষয়েই আলোচনা করছেন এবং সেটুকু অধিকারকেই নারী জীবনের মহার্ঘ্য প্রাপ্তি বলে উল্লেখ করছেন তখন আছিয়া মজিদ লিখছেন শিক্ষাঙ্গনে নারী পুরুষ সাম্যের কথা। নারী শিক্ষা যেমন তেমন করে সম্ভব নয়—

> বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিতে হইবে ভবিষ্যতের সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে নারী কোন কাজের উপযুক্তা। এইসঙ্গে নারীর বিশেষ বিশেষ গুণ সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে এবং তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৬১]

আছিয়া মজিদ নারীর পূর্ণ বিকাশে শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন। নারীর বিকাশে শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, শারীরিক বিকাশকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।—

> মোটকথা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতিও যাহাতে ঘটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি সেইভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।[৬২]

লক্ষণীয় বিষয় আছিয়া মজিদ নারীর জীবনকে শুধু গৃহকোণে আটকে রাখার কথা যেমন ভাবেননি। তেমনি শুধু মাত্র নারী শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাকে আরও পরিকল্পিত ভাবে রূপ দেওয়ার কথা বলেছেন। খুবই নগণ্য সংখ্যক মহিলা যেহেতু উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে যেতে পারত তাই সেই দিক বিবেচনা করে মেয়েদের জন্য দু-ধরণের শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলেছেন—

> বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ জন বালিকা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং মাত্র অল্প সংখ্যক মেয়ে উচ্চশিক্ষা ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। সুতরাং মেয়েদের জন্য দুই ধরণের পাঠ্যতালিকার প্রয়োজন।[৬৩]

এইভাবে নারী সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখেছেন তিনি। তার ভিত্তিতেই উপলব্ধি করেছেন নারীর বহুমুখী সম্ভাবনাকে। নারী শুধু ঘর সংসারের কাজেই নয় সমাজের প্রতিটি কর্মপ্রবাহে সে তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে। তিনি বলছেন— বর্তমানে

রাজনৈতিক আন্দোলনে, সমাজ সংস্কারের কাজে নারীর প্রয়োজন অনুভুত হচ্ছে। তাই তাকে শুধু সংসারের কাজ আর সন্তান উৎপাদনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।[৬৪] এভাবেই সংসারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সার্থক বিচরণের মধ্য দিয়ে নারী পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হতে পারে—

> নারী-স্বাধীনতা সার্থক হইয়া উঠিবে তখনই যখন নারী তাহার নারীত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিবার অধিকার পাইবে। নারীর এই ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনের দাবী বা অধিকার মাতৃত্ব অপেক্ষা গরীয়াণ এবং মহত্তর।[৬৫]

সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে মাতৃত্ব অপেক্ষা একজন নারীর ব্যক্তিত্বকে এমন উচ্চ আসনে বসাতে সেদিন কম মানুষই পেরেছিলেন। আছিয়া মজিদ সেই কম সংখ্যক মানুষদের মধ্যে অন্যতম।

আশ্চর্যের বিষয় আছিয়া মজিদের বস্তুনিষ্ঠতা! তাঁর পড়াশুনা তাঁর বেড়ে ওঠা, কাজ কোথায় কিভাবে সেই সংক্রান্ত তথ্য না পেলেও বিস্মিত হতে হয় তাঁর তথ্যনিষ্ঠতায়। মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গী আমরা দেখেছি। কিন্তু সার্বিক শিক্ষা পরিকল্পনায় তাঁর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সেখানে ভাষা সম্পর্কে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষন পদ্ধতি কি হবে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করছেন। ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ আবশ্যক। ছাত্রদের শিক্ষকের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত করানো শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। সিলেবাসও হওয়া উচিত তার ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের উপযোগী। তার জন্য শিক্ষককেও হতে হবে জীবন্ত। তিনি লিখছেন —

> চাই জীবন্ত শিক্ষক, যিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়তল স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাইতে পারিবেন। মোটকথা, শিক্ষা পুঁথিগত না হইয়া ব্যক্তিগত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক এমন শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইবেন যাহা জীবন পথের সন্ধান বলিয়া দেয়— আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে পারে, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে।[৬৬]

এমন শিক্ষক হবেন যিনি ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু মন জগিয়ে দেবেন। যার ফলে তার পর্যবেক্ষণ শক্তি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়বে। যার ফলে ভবিষ্যতে ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি অমূল্য মূল্যায়ন করেছেন। ইংরেজ সরকার তার নিজের সুবিধার জন্য নিজস্ব ভাষা ভারতবাসীর শিক্ষা সহ সমস্ত ক্ষেত্রে চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় স্তরে শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন প্রয়োজন বলে আছিয়া মজিদ মনে করছেন—

> বিদেশী গবর্ণমেণ্ট পরদেশী ভাষার সাহায্যে বিজাতীয় দৃষ্টি আমাদের উপর আরোপ করিয়াছেন বটে, কিন্ত ইহা আমাদের মনঃপুত হইতে পারে না। জাতীয় জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে এই শিক্ষাকে ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় কলাবিদ্যা এবং ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হইবে।[৬৭]

এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ রাজের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিরোধের অবস্থানটি বোঝা যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ভারতীয় সঙ্গীত চিত্রকলা, কারুশিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই বিষয়গুলি নতুন করে শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন শিক্ষালয় স্থাপনের কথা বলেছেন—

> ভারতীয় কলাবিদ্যা এবং চারুশিল্পও আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে স্থান পায় নাই। সঙ্গীত ও চারুশিল্প কিন্তু জাতীয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যাক্তিরূপে পরিগণিত। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারত নিজও কলা-বিদ্যার অধিকারী, কিন্তু কালের প্রভাবে ইহা বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে।.. ... এই সমস্ত শিক্ষার জন্য আরও নূতন নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাহা হইলে লোকে বাস্তবিকই ভারতীয় সঙ্গীত এবং কলাবিদ্যার কদর করিতে শিখিবে।[৬৮]

তবে তিনি ভারতীয় দর্শন সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় আধুনিক দর্শনের প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল তা এই প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যায়। ভারতের বিশাল ব্যপ্ত সংস্কৃতিকে আরও

বিকশিত করতে গেলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন হওয়া আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন—

> ভারতের বিশাল কৃষ্টিকে বিকশিত করিতে হইলে ইউরোপীয় কৃষ্টিসমূহের সহিত বৈদিক, পুরাণিক, ইসলামিক এবং বৌদ্ধ কৃষ্টিসমূহও আলোচনা করিতে হইবে।[৬৯]

তা হলে এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হবে। এই কথার প্রসঙ্গে আছিয়া মজিদের অসয়াম্প্রদায়িক চেতনার নাড়টিও ধরতে পারা যায়।

আছিয়া মজিদের বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৩৪২ সালে *সওগাত* মহিলা সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবযুগের শিশু' প্রবন্ধ থেকে। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাসে বিগত যৌবন এক সমাজের পরে নতুন এক সমাজের আগমন ঘটে। ইতিহাসের এই বস্তুনিষ্ঠ ধারণা তাঁর লেখায় আছে। এবং তাঁর এই দুটি প্রবন্ধে কোথাও একবারও তিনি ঈশ্বরের উল্লেখও করেন নি যা— বেশ বিস্ময়কর। তিনি 'নবযুগের শিশু' প্রবন্ধে লিখছেন সন্তান প্রতিপালনে অতীতের সামন্তী যুগের হুকুম দেওয়া খবরদারী আর চলবে না। কারণ নবযুগ গণতান্ত্রিক চেতনার যুগ। অতএব—

> ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার যুগে ছেলেদের স্বাধীন ভাবে গড়িয়া উঠিবারই সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।[৭০]

অর্থাৎ নবজাগরণের ব্যক্তির মুক্তির যে বার্তা তা তাঁর লেখায় ধ্বনিত হচ্ছে।

শিশুর শিক্ষা শৈশব থেকেই। তাই শুরুতেই তাকে নিয়মানুবর্তী হওয়ার শিক্ষা দিতে বলেছেন আছিয়া মজিদ। এই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলেছেন। বলেছেন—

> প্রাকৃতিক নিয়ম কানুনের অবাধ্য হওয়ার উপায় নেই। যখন বড় বড় ভূমিকম্প বা মহাপ্লাবন দেশকে দেশ পয়মাল করিয়া দেয় প্রকৃতি তখন মানুষের কোনও তোয়াক্কা রাখে না। মানুষের এই সীমাবদ্ধতার দিক অর্থাৎ তাহাকে যে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানিয়াই চলিতে হইবে, এ শিক্ষার বীজ শৈশবকাল হইতেই শিশুর হৃদয়ে উপ্ত হওয়া দরকার।[৭১]

এখানে লক্ষণীয় এই যে মুসলিম সমাজের একজন নারী বিধাতার নির্মিত নিয়মের কোনও উল্লেখ করছেন না। ভূমিকম্প, মহাপ্লাবনকেও তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম বলে উল্লেখ করছেন। তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তীকালেও এমন বস্তুনিষ্ঠতা বিরল। সম্ভবত প্রবল বস্তুনিষ্ঠতা তাঁকে অনেক বেশি সমাজনিষ্ঠও করেছে। সমাজের নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি খোঁজ করতেন এবং সেই সম্পর্কে তাঁর অভিমতও তিনি ব্যক্ত করতেন। সন্তানের শিক্ষা প্রসঙ্গে অভিভাবকদের ভূমিকা কি হবে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর মানবতার শত্রু ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনীর সম্পর্কে তাঁর বিরাগ ব্যক্ত করেছেন—

> কর্তা স্থানীয় মা কিম্বা বাবা যেন ছোটো-খাটো এক একজন মুসোলিনী, যিনি অঙ্গুলি হেলনে সন্তানরূপী ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে কলের মত পরিচালনা করিতেছে।[৭২]

ফলে সামগ্রিকভাবে দেখলে আছিয়া মজিদ তাঁর যুগের এক অগ্রগণ্য চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখা আরও সংগ্রহ করতে পারলে অবশ্যই তাঁর সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা যেত। তবে এই দুখানি প্রবন্ধ থেকে আমরা তাঁকে যেভাবে পাই তাতে তাঁকে নারীমুক্তি আন্দোলনে শুধু নয় সমাজের সমস্ত স্তরেই একজন সচেতন ব্যক্তিত্ব বলেই মনে হয়।

জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমামের *অন্যজীবন* (১৯৮৫)[৭৩] সেই সময়ের কথা বলে— যে সময়ে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম সমাজের অনেকটাই আলোকিত হয়েছে। সেই আলো তখন অন্দরমহলের কুসংস্কারকে ধাক্কা দিচ্ছে। রোকেয়ার(১৮৮০-১৯৩২) সময়ের মত, বাড়ির গুরুজনদের থেকে লুকিয়ে কাউকে কাউকে পড়তে হলেও সবাইকে পড়তে হচ্ছে না। প্রাচীনপন্থী গুরুজনদের সাথে সরাসরি বিরোধিতা করে অন্য গুরুজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন মেয়েদের। জাহানারা ইমামেরই জীবনের বিভিন্ন দিক এই *অন্যজীবন*। তাই শিক্ষার পাশাপাশি জাহানারা ইমামের দেখা সেই সময়ের রাজনৈতিক সামাজিক নানা ঘটনা যেমন- স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কমিউনিষ্ট আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় তাঁর লেখায় প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে।

নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব

অন্যজীবন এর শুরু হচ্ছে প্রসূতি মাকে যত্ন আত্তির ব্যাপার নিয়ে পুরাতন আর নতুনের দ্বন্দ্বে। জড়ুর মাকে সন্তান হওয়ার পর ধোঁয়াভরা হাওয়া বাতাসহীন গরম আঁতুড় ঘরে কাটান এবং গুরুপাক খাদ্য খাওয়ার পুরাতনী রেওয়াজের সাথে ডাক্তারদের পরামর্শ মত স্বাস্থ্যকর খাওয়া থাকার ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব।

এরপর আমরা নতুন দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাচ্ছি ঘরের বউদের বাইরে যাওয়ার প্রসঙ্গে। জড়ুর বাবার বড়দাদা রেঙ্গুনে কাজ করতেন। সেখানে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি- তাঁর দাদাজান(ঠাকুরদাদা)-এর কঠোর আদেশে। বাবার মেজদাদাও প্রথমে তাঁর কর্মস্থলে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারেননি। পরে খাওয়া দাওয়া অসুস্থতার দোহাই পেড়ে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু জড়ুর মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। কারণ মেজচাচীর ক্ষেত্রে ঘেরা গরুর গাড়িতে করে মেজচাচার কর্মস্থলে যাওয়া যেত। কিন্তু মাকে বাবার কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য শুধু গরুর গাড়ি নয়— বাস ও ট্রেন ও দরকার। তাতে তো মায়ের পর্দা রক্ষা হয় না। মাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবাকে দাদাজানের সাথে রীতিমত 'ফাইট করতে হয়ে ছিল' [৭৪]। শেষ পর্যন্ত বোরখায় আবৃত হয়ে সেখানে যাওয়া যাবে— এই রফা হল।

পর্দার বিবরণ আমরা রোকেয়ার *অবরোধ বাসিনী*তে পড়েছি। তার এতকাল পরেও পর্দার কড়াকড়ি কম ছিল না। আত্মীয়ের বাড়িতে মেয়েদের যেতে হলে কঠোর পর্দা মেনে গরুর গাড়িতে করে যেতে হত। কিন্তু গরুর গাড়ি যখন নদীর পাড় থেকে নদীখাতে নামত তখন বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। কিন্তু মহিলাদের গাড়ি থেকে নামার উপায় ছিল না। জাহানারা ইমাম লিখছেন—

> উঁচু পাড় দিয়ে গরুরগাড়ি পার করা রীতিমত বিপজ্জনক এবং সেই সঙ্গে আমাদের জন্য তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় ব্যাপার ছিল। মহিলারা তো গাড়ি থেকে নামবেন না! না, তাঁদের অনিচ্ছা নয়, নামবার বিধানই ছিল না। নামলে বেপর্দা হয়ে যাবেন। অতএব তাঁরা দৃঢ় মুষ্ঠিতে ছইয়ের বাতা ধরে উচ্চস্বরে নানারকম দোয়াদরুদ পড়তে থাকতেন। যদিও পরপুরুষের কানে তাঁদের

> কণ্ঠস্বর যাওয়া নিষেধ, তবু সে নিদান-সময়ে সেকথা তারা মানতে পারতেন না- মনেও থাকত না নিশ্চয়।[৭৫]

বিয়ে ঠিক হওয়ার পর মেয়েদের 'মাইয়াখানা'র কথা বলেছিলেন রোকেয়া[৭৬] সেই ঘরবন্দী অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় 'অন্য জীবন'এ। জাহানার ইমাম বিবরণ দিচ্ছেন-

> কুমুবুবুকে দু'তিন সপ্তাহ আগেই দাদীর কোঠার দোতালার কোনের ঘরটায় বন্দী করা হয়েছে। দু'তিন সপ্তাহ আগে কথাটা আন্দাজে বলছি, আল্লাই জানে কতদিন আগে থেকে তাঁকে ঘরবন্দী করা হয়েছিল। বিয়ের কনেকে সেকালে বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে থেকে সর্বক্ষণ ঘরে থাকতে হত- ঘরেই খাওয়া, ঘরেই শোয়া ঘরেই সব। কনের নিকট মহিলা-আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো সে ঘরে ঢোকা নিষেধ। ... ... দিনের বেলা কুমু বুবু সারা গা-মাথা শাড়িতে ঢেকে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে থাকত। নড়াচড়া নিষেধ।[৭৭]

মেয়েদের অলংকার পরা নিয়ে বাড়ির মহিলাদের সাথে জড়ুর বাবার দ্বন্দ্ব। কান নাকে একাধিক ছিদ্র করে বিভিন্ন রকম অলংকারে সজ্জিত করান মেয়েদের— এসব অপছন্দের ছিল জড়ুর আব্বার।[৭৮] তিনি মেয়েকে সাহেবী আদব কায়দায় বড় করতে চেয়েছিলেন। তার সাথে রোকেয়ার মত তিনিও হয়তো মনে করতেন অলংকার দাসত্বের নিদর্শন।

শিক্ষা নিয়ে জড়ুর দাদাজানের সাথে বাবার দ্বন্দ্ব চলেছে বরাবর। কখনও বাবার নিজের শিক্ষা নিয়ে কখনও জড়ুর মা তার নিজের ও তার ভাই বোনদের নিয়ে। দাদাজান ছিলেন আরবি, উর্দু, ফারসিতে ব্যুৎপন্ন আলেম। পুরনো মুসলিম চিন্তার ধারা মেনেই তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হননি। কিন্তু সন্তানদের বেলায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি না দিয়ে পারেন নি। কিন্তু যেহেতু ম্যাট্রিক পাশ করলেই চাকরি তাই বেশিদূর পড়ার কি যুক্তি তিনি বুঝতে পারেন না। তাই তাঁর ছোটোছেলে, জড়ুর বাবার স্কুল পেরিয়ে কলেজে পড়তে যাওয়া সময় নষ্টের কাজ ছিল। কিন্তু আব্বা ছিলেন- 'the rebel in the family'. তিনি নিষেধের দু দুটো গন্ডী পার হয়ে পরিবারের প্রথম গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন।

মেয়েদের পড়াশুনা নিয়ে জড়ুর দাদাজান ছিলেন একেবারে প্রাচীনপন্থী। মেয়েদের বাংলা শেখা ছিল গুনাহর কাজ। কোরান শরীফের মানে না বুঝে শুধু পড়া শিখতে হত। কিন্তু বাবা এর বিপরীতে গিয়ে মাকে বাংলা শিখাচ্ছিলেন। কিন্তু দাদাজানের কানে এই খবরটা পৌঁছানোয় তাতে বাদ সাধল। দাদাজানের থেকে কড়া বার্তা আসে পড়া বন্ধের। সেই চিঠির জন্য হোক আর মায়ের অনাগ্রহের জন্য হোক আর যেই কারণেই হোক মায়ের পুঁথিগত বিদ্যা সেখানেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাবা মাকে মুখে মুখে পড়ানোর কাজ কখনও বন্ধ করেননি। এবং বাবা তাঁর চার মেয়ের পড়াশুনা কোনও অবস্থায় বন্ধ করতে দেননি। জাহানারা লিখছেন —

> স্ত্রীকে 'শিক্ষিত' করার পরিকল্পনা আব্বাজান কাজে লাগাতে পারেন নি, কিন্তু নিজের চারটে মেয়েকে শিক্ষিত করার ব্যাপারে যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন, তা থেকে কেউ তাঁকে নড়াতে পারেনি। পিতা নন, ভাই নন, পাড়া প্রতিবেশীরাও নন।[৭৯]

সেদিনের মেয়েরা যে কত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যেত তা আমরা শামসুন নাহার মাহমুদের জীবনের ঘটনায় জেনেছি। জড়ু ন' বছরে বড়ো না হলেও বারো বছরে বড়ো হয়ে গেল। তাই তার ফ্রক পরা, বাইরে বেরুনো, সাইকেল চালানো সবই বন্ধ। শাড়ী পরা বাধ্যতামূলক হল।[৮০] বোধ হয় তখনকার দিনের প্রতিটি মুসলমান মেয়ের জন্য এটাই রীতি ছিল।

একসময় মা ও দিদার একটি দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটে। এইসময়ে নানা লেখায় আমরা দেখেছি মেয়েরা বাইরের পুরুষের সামনে বের হত না। ছোটো বড় সবার সামনে পর্দা করতে হত। জড়ুর মা নানি তাই করতেন। কিন্তু বাবার অনেকদিন থেকেই বাড়ির চাকর খানসামাদের সামনে পর্দা করতে বারণ করেছেন। কারণ তারা বাড়ির সদস্যের মত হয়ে গেছেন। কিন্তু মা নানি কিছুতেই সংকোচ ও পুরনো সংস্কার কাটাতে পারছিলেন না। কিন্তু অবশেষে একটি দিন এল যেদিন মা বাবুর্চির সামনে ও নানি আব্বার সামনে বের হলেন। জাহানারা লিখছেন—

> সেইদিন আমাদের বাড়িতে একটা নতুন যুগের সূচনা হল।[৮১]

জড়ুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার এক পুরনো তরঙ্গ আবার নতুনভাবে এসে ধাক্কা দিতে থাকে। এত্ত বড় মেয়ের এখন বিয়ের সময় হতেছে। সে দেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা! মেজচাচা আব্বাকে কড়া চিঠি লিখে জানতে চাইলেন মেয়েকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে দিয়ে কেন এমন বেশরীয়তী কাজ করছেন তিনি। চিঠির বিষয় এমন ছিল—

> শুনিলাম তুমি শ্রীমতি জাহানারাকে ম্যাট্রিক ক্লাসের বইপত্র কিনিয়া দিয়াছ। আমার ময়তে ইহা অত্যন্ত বেশরিয়তী কাজ হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে অধিক লেখাপড়া শিখাইলে তাহারা বেহায়া ও বেপর্দা হইয়া যায়, ধর্মে কর্মে তাদের মতি বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমতি জাহানারার বিবাহের বয়স হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিবাহ দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।[৮২]

বাবা তাঁর বড় দাদার তিরস্কারে কর্ণপাত করলেন না। অগত্যা মেজচাচা জড়ুরই সমবয়সী নিজের মেয়ে কড়ুর সাথে সৈয়দ বংশে বিবাহ দিলেন।

এই যুগে শিক্ষিত মহলে রোকেয়া সম্পর্কে অনুভুতি কি ছিল তা সম্পর্কে জাহানারা ইমাম লিখছেন। সমবয়সী কড়ুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে অথচ তার বিয়ে তো হচ্ছেই না উপরন্তু সবার সামনে এমন বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা ছিল চরম গুনাহের কাজ। পাড়া প্রতিবেশী এবং বিশেষ করে নানীর দিক থেকে তিরস্কারের অন্ত রইল না। কিন্তু নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে সে। জাহানারা লিখছেন—

> নানী যতই বকাঝকা করুন না কেন, আমার গায়েই লাগে না- কারণ আমি জেনেছি যে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে না দিলে সত্যিই কোন পাপ হয় না। আমার মা'র সময়ে লেখাপড়া শেখা গুনার কাজ বলে গণ্য ছিল, অথচ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সারা জীবনের সাধনায় সেটা মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। এখন বহু মুসলিম মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, বিলেত যাচ্ছে, উকিল ব্যারিস্টার হচ্ছে, শিক্ষক হচ্ছে, ডাক্তার হচ্ছে।[৮৩]

আমরা এই উক্তি থেকে দেখতে পাচ্ছি রোকেয়ার সেই কর্মপ্রচেষ্টা একটু হলেও ঘুম ভাঙাতে পেরেছিল সেদিনের মুসলিম সমাজকে। জাহানারা ইমামের বাবা সৈয়দ আবদুল আলীর জীবনে এই সময়ের প্রভাব পড়েছিল। আবার তাঁর সংস্পর্শে প্রথমে তাঁর মা পরে

সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এবং সেই সময়ের বলিষ্ঠ নারীদের কর্মকান্ড জাহানারা ইমামের নিজস্ব মুক্তির পথটিও বিকশিত করতেও সাহায্য করেছে। বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের জীবন ক্লাস সিক্সেই পড়াশুনা শেষ করতে চাওয়া মেয়েটির জীবনের মোড়ই ঘুরিয়ে দিল। জুড়ু সেদিন থেকে জাহানারা ইমাম হওয়ার লক্ষে যোগ দিল।[৮৪] এই প্রসঙ্গে জাহানারা ইমাম শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া হোসেন, সরোজিনী নাইডু(১৮৭৯ – ১৯৪৯)দের জীবন সংগ্রামকে আত্মস্থ করার কথা উল্লেখ করেছেন।[৮৫]

তার সাথে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাপ জাহানারা ইমামকে তাঁর বয়সী আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের জীবন থেকে অন্য দিকে চালিত করেছে। তিনি কৈশোর থেকেই মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, নেতাজী(১৮৯৭), দেশবন্ধু(১৮৭০ – ১৯২৫), সূর্যসেন (১৮৯৪ – ১৯৩৪), ক্ষুদিরাম(১৮৮৯ – ১৯০৮), প্রীতিলতা(১৯১১ – ১৯৩২), কল্পনা(১৯১৩ - ১৯৯৫), বিনয়(১৯০৮- ১৯৩০) বাদল(১৯১২ - ১৯৩০) দীনেশ(১৯১১ – ১৯৩১) সহ আরও বিপ্লবীদের জীবন সম্পর্কে জেনেছেন। দেশ দশের ভালো মন্দের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছেন যখন তখন তাঁর বয়সী মেয়েরা এসব থেকে বহু যোজন দূরে।[৮৬]

শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে আরও একটি বিষয় জড়ু চিনতে শিখেছে— তা কূপমণ্ডুকতা। মিথ্যা বংশ মর্যাদার গর্বে নিজেকে কারুর থেকে উচ্চভাবা— এর অসারতা জড়ু ধরতে পেরেছে। এ নিয়ে নানীর সাথে তর্ক করে সে।[৮৭]

বাবার আশ্রয় সাহায্যে জড়ু নজির সৃষ্টি করে কলেজে ভর্তী হল। কলেজে বন্ধুত্ব হল অঞ্জলী দাশগুপ্তের সাথে। এরপর জাহানারার জীবনে এক অন্য রকম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। বাবার সাথে তার দ্বন্দ্ব! অঞ্জলী কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী। অঞ্জলী তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন তাঁদের সংগঠনের পত্রিকা। সেটা পড়ে জাহানারার ভালোই লাগে। কিন্তু সে পত্রিকা দেখে আব্বা ভীষণ রেগে যান। কিন্তু জাহানারা কিছুতেই ভেবে পান না বাবা তো রাজভক্ত অফিসার নন। তবে কেন এত ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। জাহানারা বাবাকে কিছু বললেন না। শুধু অশান্তি এড়াতে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে কমিউনিজম সম্পর্কে জানার

আগ্রহ মিটিয়ে নিতে সচেষ্ট হলেন। অঞ্জলীর সাথে এর পর থেকে বন্ধুত্ব আরও গভীর হল।

অন্যদিকে অঞ্জলীও সম্মুখীন আর এক চরম বিরোধী পরিস্থিতির। শরীফের সাথে জাহানারার সম্পর্ক মধুর হওয়ার সাথে সাথে শরীফের বন্ধু সুজিত ও অঞ্জলীরও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। শরীফ ও জাহানারার সম্পর্ক দুই বাড়ি থেকে মেনে নেওয়ায় তারাও বাড়িতে জানিয়ে এই সম্পর্ককে বিয়ের দিকে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সুজিতের উচ্চবিত্ত বাড়িতে ইঞ্জিনিয়ার ছেলে সম্পর্কে অনেক আশা। অনেক ধনী বাড়িতে থেকে ইঞ্জিনিয়ার ছেলের বউ আনবে। তাই তাদের অমত নিম্নবিত্ত পরিবারের অঞ্জলীকে তাদের পছন্দ নয়। কিন্তু ছেলে বেঁকে বসলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সম্মত হন। কিন্তু শর্ত হল অঞ্জলীকে রাজনীতি ছাড়তে হবে। ভীষণ আনন্দের সাথে সুজিত এই শর্তেই বিয়ের প্রস্তাব পাড়েন অঞ্জলীর কাছে। কিন্তু অঞ্জলীর ভাবনা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। —

> অঞ্জলী সব শুনল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'সুজিত আমি রাজনীতি ছাড়তে পারব না। তোমার ঘরে যাওয়া আমার আর হ'ল না'।[৮৮]

ফাইনাল পরীক্ষার পর আর অঞ্জলীকে দেখতে পাননি জাহানারা। অনেক খোঁজ করার পর জানতে পারেন অঞ্জলী তাঁর সহযোদ্ধাকে বিয়ে করেছেন। তাঁর টিবি হয়েছে। নিশ্চিত বিলাসিতার জীবন ছেড়ে আদর্শকে বরণ কজন করতে পারে! অঞ্জলীর প্রতি এই শ্রদ্ধা বোধ বন্ধুত্ব থেকে অনেক গভীরে নিয়ে গেছে জাহানারার মননকে।

সম্প্রীতি

মুসলিম পরিবার হলেও মধুসূদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম কীর্তন শুনতে বাধা নেই। রেকর্ড শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেত জড়ু—

> এই পালা শুনেও আমার গায়ে কাঁটা দিত। সত্যিই বিশ্বাস করতাম, শুদ্ধ চিত্তে একাগ্র মনে ঈশ্বরকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন, ভক্তের বিপদ-ভঞ্জনে এগিয়ে আসেন।[৮৯]

এই ভাবনাই দেখতে পাই কমলা ঝরিয়া(১৯০৬ – ১৯৭৯)র কীর্তন শোনার প্রসঙ্গে। একটি মুসলমান পরিবারে সবাই মিলে কীর্তন গান শুনছেন— এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এক প্রেরণাদায়ক ব্যাপার। বাবা রেকর্ড গুলো কিনে এনে দিতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় অন্য ধর্মের প্রতি সুরের প্রতি এই শ্রদ্ধা ভালোলাগা সঞ্চারিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর ভয়ংকরভাবে পড়েছিল। কিন্তু জাহানারা ইমামের পরিবার ঠিক সাধারণ পরিবার নয়। বাবা ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ছাড়াও সরকারি রেশন মিলত। কিন্তু তাতেও মাকে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হত। সংসার খরচের জন্য অনেক পুরনো ব্যয় ছাঁটাই করতে হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়ে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা অনুমান করে নেওয়া যায়। জাহানারা ইমাম লিখছেন— রংপুরের বাসায় সেইসময় ভিখারীদের তখন ভিড় লেগে থাকত।[৯০]

খাতুনিয়া লাইব্রেরি

'খাতুনিয়া লাইব্রেরী' নামে মহিলাদের জন্য রংপুরে একটি বিখ্যাত লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী খেরাজ আলী। 'খাতুনিয়া' লাইব্রেরি যাঁর নামে তাঁর নাম ছিল— শহিদুন্নেসা। তিনি ছিলেন জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমামের মা। অনেক কম বয়সেই শহিদুন্নেসা মারা যান। তাঁর ব্যক্তিগত বইয়ের স্টক ছিল বেশ কয়েকটি আলমারি ভর্তী। তিনি বাড়ির সমস্ত কাজ সামলে অবসর সময়ে বই পড়তেন এবং পাড়ার মেয়েদের লেখাপড়া ও সেলাই শিখাতেন। শহিদুন্নেসার মৃত্যুর পর শরীফের বাবা, মোহাম্মদ আলী আলমারি সহ সমস্ত বই তুলে দেন খেরাজ আলি সাহেবের হাতে। তিনি অতি যত্নে এই লাইব্রেরি রক্ষা করছেন। মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বাড়াবার জন্য তাদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন।[৯১]

এই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী সাহেবের ভূমিকা দেখে আমরা সেই সময়ের শিক্ষাব্রতী মানুষদের বুঝতে পারব। তিনি স্ত্রী শহিদুন্নেসার মৃত্যুর পর তাঁর বই সেই অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার জন্য তুলে দিলেন। শুধু তাই নয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চার সন্তানের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি। এমনকি শহরের এই নামকরা উকিল প্র্যাকটিসও কমিয়ে দিলেন। যতটুকু না হলে সংসার চলে না, ততটুকুর জন্য ওকালতি করতেন। বাকি সময় ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা সহ অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেন।[৯২]

নব জাগৃতির চিন্তা এই মূল্যবোধের কাঠামো দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। তাই আমরা দেখতে পেয়েছি জাহানারার বাবার সেই বিদ্রোহী মনোভাব। সত্যের প্রতি অটল ভক্তি। দুজনের পরিবারের এই মূল্যবোধ দুজনকেই তাই আন্তরিকতার সূত্রে বেঁধেছে।

জাহানারা ইমামের অন্যজীবন প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৮৫ সালে। তার কিছুকাল আগে গ্রন্থটি লিখেছেন। সেই সময়ে তিনি স্বাধীন দেশের একজন বীর যোদ্ধা। ঘরে বাইরের লড়াই তাঁকে দেশের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সম্মান দিয়েছে। অথচ তাঁর শৈশবের সামাজিক পরিস্থিতিতে একজন মেয়ের এমন অবস্থান হতে পারে তা ছিল কল্পনার। শৈশব কৈশোরের সে জীবন ছিল সত্যিই অন্য জীবন। সেখানে ছিল অশিক্ষা-কুসংস্কারের অন্ধকার। মেয়ে হিসেবে প্রতি পদক্ষেপে নিষেধের বেড়া টপকানো কঠিন ছিল। শুধু বাবা ছিলেন পাশে তাই নিষেধগুলো টপকাতে অসুবিধা হয়নি। একজন মুসলিম মেয়ে হিসেবে এই বাধাগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক বেশি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় তা আমরা দেখেছি। যখন কলেজে ভর্তী হয়েছেন তখন আত্মীয় পরিজন বাবার বন্ধুবর্গের থেকেও এই বাধা এসেছে অনেক। এই বাধা যে মুসলমান মেয়দের জন্য তখনও অনেক ছিল তা সেই সময় কলেজে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা দেখলে বোঝা যায়। জাহানারা ইমাম লিখছেন তাঁর সময়ে সমস্ত ক্লাস মিলিয়ে মাত্র তিন জন মুসলমান ছাত্রী পড়তেন। যখন কলেজে পড়েছেন তখন কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী অঞ্জলীর পথে চলতে চেয়েও পারেননি। বাবার শাসন, প্রাকবিবাহ পর্বের অবস্থান সমস্ত কিছু ভেবেছিলেন হয়তো। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামি চেতনা তাঁকে যে মানসিক দৃঢ়তা দিয়েছে তা আগে

কখনও দেয়নি বোধ হয়। তাই আপশোষ করেছেন। নিজে যা ভালো বুঝেছেন গ্রহণ করতে পারেননি। যে রাজনৈতিক মতাদর্শ জীবনে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তা তিনি গ্রহণ পারেন নি তখন। ১৯৮৫ সালের মানসিক দৃঢ়তার কাছে সেদিনের জীবন ছিল তাই অন্যজীবন। তবে এই অন্যজীবনের অপূরিত আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক হওয়ার তাগিদে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬) গ্রন্থ পড়লে বুঝতে পারা যায়।

১৯৪৭ এর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নানা সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন সেই সময়ের মানুষ। স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লবের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক সমাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, একাধিক ভাতৃঘাতী দাঙ্গা, স্বতন্ত্র দেশ গঠনের আন্দোলন এই সময়ের বুকে স্বাক্ষর রেখেছে। এই সময়ের অভিঘাত বাঙালি মুসলিম নারীদের রচনায় ধরা পড়েছে। তার সাথে আছে তার নিজস্ব দাবি। অবরোধের অন্ধকার ভেদ করে ঘরের বাইরে আসার আকুতি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দাবি। ভোটাধিকার প্রাপ্তির দাবি। মানুষ হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার দাবি। রোকেয়া যে যাত্রাপথ রচনা করে দিয়েছিলেন সেই যাত্রাপথ ধরে এগিয়েছেন তারা। আবার যেখানে তা রুদ্ধ হতে বসেছে সেখানে নতুন করে সে পথ রচনা করেছেন তাঁরা। দেশভাগের পর এই নারীদের অনেকেরই ঠিকানা হয়েছে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান। সেখানে হয়তো আমরা কারুর কারুর ক্ষেত্রে জীবনের শুরুর দিকের সংগ্রামী তেজ দেখতে পাইনি সত্য।[৯৩] কিন্তু অনেকেই শাসকের বিরুদ্ধে সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রভূত সংগ্রামী তেজে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। দেশের দুর্দিনে এক উৎসারিত আলোর উৎস হয়ে পথ দেখিয়েছেন আমৃত্য যোদ্ধা হয়ে।

তথ্যসূত্র:-

১. নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* উদ্ধৃত আখতার, শাহীন, ভৌমিক মৌসুমী(সম্পা) *জানানা মহ্‌ফিল* পৃ- ১৭৩, স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, ১ম প্রকাশ জানু ১৯৯৮, মূল্য-

২. সিদ্দিকা খাতুন, মাহমুদা, 'বর্তমানে নারীর কর্ত্তব্য', উদ্ধৃত হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী*, প্রগতিশীল প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১১, পৃ-১৪০, মূল্য-২০০টাকা।

৩. প্রাগুক্ত, 'পল্লীর প্রতি নারীর কর্তব্য' প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্‌ফিল*, পৃ- ১৭৯ ।

৪. প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৭৯।

৫. প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৭৯।

৬. প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৭৯।

৭. প্রাগুক্ত, 'সাহিত্য ও আর্ট' উৎস প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৭৭।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭৭।

৯. নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, উদ্ধৃত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৬০।

১০. নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত *জানানা মহ্‌ফিল* পৃ- ১৬০।

১১. ফজিলতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর মুক্তি', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৬, উৎস প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৬৭- ১৬৮।

১২. ফজিলতুন্নেসা, প্রাগুক্ত,*জানানা মহ্‌ফিল* পৃ- ১৬৫।

১৩. ফজিলতুন্নেসা, প্রাগুক্ত, *জানানা মহ্‌ফিল* পৃ- ১৬৫।

১৪. ফজিলতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', উৎস প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৬২।

১৫. ফজিলতুন্নেসা, 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ', *শিখা সমগ্র*,(১৯২৭-১৯৩১).... ... পৃ- ২৬৬।

১৬. মাহমুদ, শামসুন নাহার, *নজরুলকে যেমন দেখেছি*, উদ্ধৃত প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ২০৫-২০৬।

১৭. পারভীন, শাহিদা, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১২, মূল্য- ২০০ টাকা, পৃ- ২৮।

১৭* মাহমুদ, শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী*, সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ- জুন ২০১০, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ১০০/- টাকা, পৃ- ৬৫।

১৮. পারভীন, শাহিদা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১

১৯. মাহমুদ, শামসুন নাহর, *রোকেয়া জীবনী*, উদ্ধৃত পারভীন শাহিদা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

২০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ২০৭।

২১. পারভীন, শাহিদা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫।

২২. মাহমুদ, শামসুন নাহার, 'ইরানে নারী জাগরণ', উদ্ধৃত পারভিন, শাহিদা প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৮।

২৩. প্রাগুক্ত, 'ইরানে নারী জাগরণ', পারভীন, শাহিদা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৯।

২৪. প্রাগুক্ত, 'ইরানে নারী জাগরণ' পৃ- ৫৯।

২৫. পারভীন, শাহিদা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬০।

২৬. মাহমুদ, শামসুন নাহার, 'আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন' *বুলবুল* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩, উদ্ধৃত প্রাগুক্ত পারভীন, শাহিদা, পৃ- ৬০।

২৭. প্রাগুক্ত, 'আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন', পৃ- ৬০।

২৮. মাহমুদ, শামসুন নাহার, 'বাংলা কাউন্সিলে মহিলা সিট ও হ্যামন্ড কমিটি' সচিত্র *বর্ষবাণী* ৩য় বর্ষ ১৩৪২, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত পারভীন, শাহিদা, পৃ- ৬৪।

২৯. মাহমুদ, শামসুন নাহার, 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার', *সওগাত* মহিলা সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪২, পৃ- ৪৭১।

৩০. প্রাগুক্ত, 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার' পৃ- ৪৭২।

৩১. খাতুন, রাবেয়া, উদ্ধৃত প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৮৮।

৩২. চৌধুরানী, রাজিয়া খাতুন, 'সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান, *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৪, উৎস, প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৮৮।

৩৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৮৯।

৩৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত *জানানা মহ্‌ফিল* , পৃ- ১৯০।

৩৫. কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল, নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল* , সম্পা- গুপ্ত, শ্যামলী, সাত্তার, আবদুস, রায়, গৌতম; পুনশ্চ, কলকাতা-৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, দাম- ২৭০টাকা।

৩৬. কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল,নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, গ্রন্থকর্তৃর নিবেদন।

৩৭. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮-১৯।

৩৮. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ-.৩৬।

৩৯. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৩৯।

৪০. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৪১।

৪১. জাহাঙ্গীর, সেলিম, *সুফিয়া কামাল*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ- ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ- ৩২।

৪২. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৪২।

৪৩. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৪২।

৪৪. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৪২।

৪৫. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ-৫৪।

৪৬. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৫৪।

৪৭. কামাল, সুফিয়া নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদকে লেখা চিঠি, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* , প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত*নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৮৭-৪৮৮।

৪৮. জাহাঙ্গীর, সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৭।

৪৯. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, *একালে আমাদের কাল* ,পৃ- ৫৪।

৫০. কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল,* https://artsbdnews24.com>archives.

৫১. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ- ৪৮।

৫২. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত পৃ-৫০।

৫৩. জাহাঙ্গীর, সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১।

৫৪. কামাল, সুফিয়া, ফজল, আবুলকে লেখা চিঠি, উদ্ধৃত প্রাগুক্ত *নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল*, পৃ-৪৯৪।

৫৫. উল-আলম মাহ্‌বুব, 'ফেলে আসা দিন সুফুর চিঠি' প্রাগুক্ত *নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল*, পৃ-৪৯১।

৫৬. কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল,* প্রাগুক্ত পৃ-৫৬

৫৭. কামাল, সুফিয়া,প্রাগুক্ত পৃ-৫৫।

৫৮. জাহাঙ্গীর, সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৮।

৫৯. জাহাঙ্গীর, সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৩।

৬০. মজিদ, আছিয়া, 'শিক্ষা' , *সওগাত* মহিলা সংখ্যা, ১০ম বর্ষ কার্তিক ১৩৪০, পৃ- ১২।

৬১. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২।

৬২. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩।

৬৩. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩।

৬৪. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩-১৪।

৬৫. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪।

৬৬. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০।

৬৭. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯।

৬৮. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১।

৬৯. মজিদ, আছিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১।

৭০. মজিদ, আছিয়া, 'নবযুগের শিশু', *সওগাত* , মহিলা সংখ্যা কার্তিক ১৩৪২, পৃ-৪০৭-৪০৮।

৭১. মজিদ, আছিয়া, 'নবযুগের শিশু' প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৮।

৭২. মজিদ, আছিয়া, 'নবযুগের শিশু', প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৯।

৭৩. ইমাম, জাহানারা, *অন্যজীবন*, চারুলিপি, ১ম প্রকাশ ফেব্রু ১৯৮৭, ৪র্থ মুদ্রণ মার্চ ২০১৭, দাম-২০০টাকা।

৭৪. ইমাম, জাহানারা, *অন্যজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

৭৫. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮।

৭৬. রোকেয়া, *অবরোধ বাসিনী*, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঘোষ, অনিল(সম্পা), কথা, কলকাতা, ২০১৪, মূল্য- ৪০০টাকা, পৃ- ৪২২-৪২৩।

৭৭. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬।

৭৮. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪২-৪৩।

৭৯. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৮।

৮০. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬১।

৮১. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭১।

৮২. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮২।

৮৩. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৭।

৮৪. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫-৫৬।

৮৫. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৭।

৮৬. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৭।

৮৭. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৯।

৮৮. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১।

৮৯. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭।

৯০. ইমাম, জাহানারা , প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৩।

৯১. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৫।

৯২. ইমাম, জাহানারা , প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০।

৯৩. শামসুন নাহারকে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে গুলি চলার পরেও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় নি। সূত্র-খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৫৮০টাকা, পৃ-২৫২ আমাদের ফজিলতুন্নেসা এই সময়েই ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল থাকাকালীন সেখানে ছাত্রীরা শহীদ বেদি নির্মান করতে চাইলে তিনি বাধা দেন। সূত্র- *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান,* বাংলা একাডেমী ঢাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন:
বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়

বাঙালি মুসলিম নারীর পদযাত্রায় ১৯৫২ সাল এক অন্যতম পদচিহ্ন। কারণ 'বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, বুলেটের ভীতি উপেক্ষা করে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষায় রাজপথ পরিক্রমা করেছে সে। ঘরের অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে রণক্ষেত্রে। মাতৃভাষার জন্য স্বামীর 'তালাক'ও তার কাছে তুচ্ছ। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারীর ভূমিকা থাকলেও এমন সর্বব্যাপক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন থেকে মুসলমান নারীর জয়যাত্রার সূচনা। জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কটকালে নারীর এ ভূমিকা সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে শুধু নারী নয়, মানুষের মর্যাদা দিয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন অগণিত মুসলিম নারী। কিন্তু আজ তাঁরা বিস্মৃতির অতলে। এই আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও লেখাপত্র বিশেষ পাওয়া যায় না। যতটুকু লেখা পাওয়া যায় তার সংখ্যা খুব স্বল্প। রওশন আরা বাচ্চু (১৯৩২-২০১৯), জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমদ (১৯৩২-২০২০), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সনজিদা খাতুন (১৯৩৩), বেগম হবিবর রহমান ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। লিখেছেন ভাষা আন্দোলনে তাঁদের নিজেদের ভূমিকার কথাও। গবেষক, এই পর্বে এঁদের রচনাকে ভিত্তি করে বাঙালি মুসলিম নারীর সেদিনের গতিপথকে ধরতে চেয়েছে।

মাতৃভাষার দাবিতে দৃপ্ত বাঙালি

'জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা'র লড়াইয়ে হল দেশভাগ। মুসলিম মানসে স্বপ্নের ভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আনন্দ সঞ্চারিত হল। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেই স্বপ্নের ভূমি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে থাকে। বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে না হলেও শিক্ষিত মহলে ত বটেই। ১৯৪৭ এই গুঞ্জন শোনা গেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তারই ফলশ্রুতিতে ৪৭-এর নভেম্বরে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বাংলা বর্জিত হল। পাকিস্তানের

সিংহভাগ নাগরিকের প্রতি এই বঞ্চনায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ওই বছর ১১ নভেম্বর বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে পুর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।[১] বাংলা ভাষা রক্ষার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় তমুদ্দিন মজলিশ। ১৯৪৮ সালের ২মার্চ, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে গঠিত হয় দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ। এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। ওই বছর ১১ মার্চ পুর্ব পাকিস্তান জুড়ে হরতাল পালিত হয়। ১৯৪৯এ প্রতিবাদ চলতে থাকে আরবি হরফে বাংলা লেখার ফরমানের বিরুদ্ধে।

১৯৪৭ থেকে বয়ে আনা ক্ষোভ ১৯৫২তে বিস্ফোরিত হয়। বাঙালিকে মরনপণ সংগ্রামে প্রাণিত করে। ৫২র ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষা করার। শাসকের এ ঔধ্বত্যে নিরীহ বাঙালির সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। অভিভাবক, অধ্যাপকদের নির্দেশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রছাত্রীরা মুখোমুখি হল পুলিশের। ১৪৪ধারা ভঙ্গ হল। গুলি চলল। নিহত হলেন আবদুল বরকত(১৯২৭-১৯৫২), আবদুল জব্বার(১৯১৯-১৯৫২), আবদুস সালাম(১৯২৫-১৯৫২), রফিক উদ্দিন(১৯২৭-১৯৫২)। ছাত্রছাত্রীর আন্দোলন পরিণত হল গণআন্দোলনে। বাংলা ভাষা রক্ষার দাবিতে জনসাধারণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানেও চলে গুলি। শহীদ হন অগণিত ভাষাসৈনিক। আসলে প্রাণের চেয়ে বড়ো ‘বাপ দাদার জবানের মান’। তাই দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলনে শাসক পিছু হটল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান শাসক বাংলার মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল।

ভাষার এই দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সূচনা লগ্ন থেকেই মুসলিম নারীর যোগসুত্র ছিল। ১৯৫২ এবং তার পর থেকে ছিল তার যুগান্তকারী ভূমিকা।

ভাষা সৈনিক সুফিয়া আহমদ

সুফিয়া আহমদ তাঁর ‘ভাষার জন্য আবেগ বাঁধ মানেনি’ (১৯৯৭)[২] প্রবন্ধে ভাষা সংগ্রামে সেদিন তাঁর অংশগ্রহণ কেমন ছিল সে সম্পর্কে লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর লেখা থেকে নারীমুক্তির তৎকালীন প্রেক্ষাপটটিও পরিস্ফুট হয়। তাঁর উক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়—

পেশায় বিচারপতি তাঁর বাবা ইব্রাহিম ছিলেন মনেপ্রাণে মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত। পিতার সেই চেতনা মেয়ে সুফিয়ার মধ্যে শৈশব থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে তাই তাঁর আবেগ আর বাঁধ মানেনি। ছাত্রাবস্থাতেই ৫২র লড়াইয়ে দিয়েছিলেন নেতৃত্বকারী ভূমিকা। সুফিয়া আহমদ লিখছেন—

> তখন এই চেতনা দানা বেঁধেছিল যে, বাঙ্গালির ভাষা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার এ চক্রান্ত রুখতে হবে। তখন একজন ছেলে না মেয়ে এ ভাবনা ছিল তুচ্ছ.[৩]

মুসলিম সমাজে তখনও মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা ছিল পশ্চাদপৎ। খুবই অল্প সংখ্যক মেয়েরা শিক্ষার আঙিনায় এসেছে। অধিকাংশ ছাত্রীকে ছাত্রী হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতে হত যাতে বাইরের সাথে তার কোন সংযোগ না থাকে। এমনকি যে মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশ করেছে তাদের কাছেও এ বিষয়টি সহজ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে ছেলে-মেয়ে একসাথে মিছিলে বেরুনো এবং পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা মুসলিম মানস জগতে গুণগত পরিবর্তন আনে। সুফিয়া আহমদ লিখছেন—

> সে সময় মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ছেলে সহপাঠীদের প্রক্টরের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতো। সেই রক্ষণশীল পরিবেশে থেকেও শিক্ষকদের স্নেহদৃষ্টিকে সম্বল করে ছাত্র ছাত্রীরা এতো বড়ো একটা আন্দোলন করতে পেরেছিল। আমি মনে করি এটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক একটি ঘটনা।[৪]

বৈপ্লবিক ঘটনা তো বটে। ঐরকম একটি প্রতিকূল পরিস্থিতে মুসলিম মহিলারা রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করেছে। বিরুদ্ধতা শুধু বাইরের নয়। নারীর নিজস্ব মননের, দীর্ঘদিনের সংস্কার। সামাজিক পরিস্থিতি তার মনের পিছুটান ও সংশয় দূর করে দেয়। এই কারণে সুফিয়া আহমদ ভাষা আন্দোলন থেকে প্রকৃত নারী জাগরণের সূচনা বলে মনে করেন—

> আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন রাস্তায় মেয়েদের খুব একটা দেখা যেত না। রিকশায় চলাফেরা করার সময় হুড কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দেওয়া হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রীর সঙ্গে একজন ছাত্রের কথা বলতে হলে প্রক্টরের অনুমতি নিতে হত। এমন রক্ষণশীল পরিবেশে শুরু হয়

> ভাষা সংগ্রাম। তবে তখন আর ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিভেদ থাকে নি। ছাত্রছাত্রী সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাষা রক্ষার আন্দোলনে। সে-ই মেয়েদের স্বতঃস্ফুর্তভাবে বাইরে আসা। তারাও ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশের কাজ করতে থাকে। মূলত প্রকৃত নারী জাগরণ শুরু হয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে।[৫]

সুফিয়া আহমদ লিখছেন, সেদিনের সর্বাত্মক ভাষা আন্দোলনের চেতনা সম্পর্কে। ১৯৫১ সালের নভেম্বরে সুফিয়া আহমেদ সহ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তুরস্কে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররাও ছিল। সেখানে বাংলা গান গাওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি হয় পাকিস্তান কতৃপক্ষের থেকে। এর প্রতিবাদে বাঙালিদের অসহযোগ শুরু হল। তারা একদিন অনুষ্ঠানে যোগদান বন্ধ রাখল। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা এদের বিছানা ভিজিয়ে জব্দ করতে চাইছিল উল্টে তারাই হার মানল। বাংলা গান গাইতে দিতে বাধ্য হল কতৃপক্ষ।[৬]

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি ও রওশন আরা বাচ্চু

ভাষা আন্দোলনে ছাত্রাবস্থায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আর একজন বীরাঙ্গনা রওশন আরা বাচ্চু। তাঁর 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'(২০০৩)[৭] প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে তিনি সেই আন্দোলনে মেয়েদের গৌরবময় ভূমিকাকে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সেদিন ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সাধারণ মানুষের অবদানকেও স্মরণ করেছেন।

তাঁর উক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়– তিনি ১৯৪৯ সাল থেকেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এই সফরের সময় তিনি কার্জন হলে বক্তৃতা দিতে এলে ছাত্ররা তাঁর কাছে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর উপর বৈষম্য ও বেকারত্বের চিত্র তুলে ধরেন। এবং ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সহ পূর্ব পাকিস্তানের দাবিসম্বলিত মেমোরেন্ডাম পেশ করে। এই কর্মসূচিতে রওশন আরা বাচ্চু উপস্থিত ছিলেন তিনি লিখছেন–

> ভলান্টিয়ার হিসেবে আমি সেদিনের কর্মসূচি রাণা লিয়াকত আলির হাতে দেওয়ার সময় শুনলাম তিনি লিয়াকত আলিকে বলছেন, ল্যাংগুয়েজ কা বারে মে কুছ বোল দিজিয়ে। কিন্তু লিয়াকত আলি গম্ভীর ও নিরুত্তর।[৮]

এই নিরুত্তর ও নির্লিপ্তভাব আসলে বাঙালি জনগণের কণ্ঠ রোধ করার কৌশল মাত্র। সেটা স্পষ্ট হয় ১৯৫২ সালে। ওই বছর ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দিন(১৮৯৪-১৯৬৪) ঘোষণা দিলেন— বাংলা ভাষা চলবে না। সেটেল্ড ফ্যাক্ট। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সভা করে। এবং শোভাযাত্রা করে ঢাকার প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিল নবাবপুর পর্যন্ত যায়।

এই মিছিলে ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় – ছাত্রীরা এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ছিল না। প্রাবন্ধিক লিখছেন—

> আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কার্জন হল পার হয়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে কার্জন হলের ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতাম এবং সেখান থেকে হলে ফিরতাম।[৯]

আসলে মেয়েরা বিশেষত মুসলিম মেয়েরা এভাবে ছেলেদের সাথে মিছিলে রাস্তায় হাঁটবে – মুসলিম সমাজের কাছে তা ছিল অপরাধের। এমনকি ছেলে সহপাঠীদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে নিষাধাজ্ঞার কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু রাজনীতি সচেতন ছাত্রীরা এই নিষেধাজ্ঞা মানতেন না। গোপন সভাতেও যোগ দিতেন তাঁরা। সুফিয়া খান, খুলনার সুফিয়া আলী, বেবী আপা, সুরাইয়া হাকিম, সুরাইয়া ডলি, খুলনার নাদেরা ও আমি এবং পরবর্তী সময়ে রোকেয়া আপা সেসব সভায় যোগ দিয়ে মতামত ব্যক্ত করতাম[১০]— বলছেন রওশন আরা বাচ্চু। এই সভায় উপস্থিত না থাকতে পারলেও অন্য ছাত্রীদের সভার সিদ্ধান্ত অবগত করান হত। ছাত্রীদের ছিল মুলত পোস্টার লেখার দায়িত্ব। ৪ ফেব্রুয়ারি, হরতাল, ১২, ১৩, ১৪ কালো পতাকা দিবস পালন করে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রীদের কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়। শুধুমাত্র পোস্টার লেখার মধ্যেই তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকেনা।

এবার তাঁদের ভূমিকা সংগঠকের। ভাষা আন্দোলনে নিজেরা অংশগ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকতে পারছেননা। ভাষা চেতনাকে অনুভব করানো চাই অন্য ছাত্রীর মধ্যে। তাই অন্যান্য ছাত্রীদের এই আন্দোলনে সামিল করানোর জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরা। ২১ফেব্রুয়ারির কাকভোরে রওশান আরা বাচ্চু, 'রোকেয়া আপা', 'বোরখা শামসুন'রা বেরিয়ে পড়েন বালিকা বিদ্যালয়গুলির উদ্দেশ্যে। যাতে ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ থাকে চোখে পড়ার মত। প্রাবন্ধিকের এই রচনায় একথা উঠে আসে—

> আমরা পায়ে হেঁটে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রীদের সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আমতলায় এলাম। পথশ্রমে ক্লান্ত আমরা একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছি। মনে আছে রোকেয়া আপা একটু মোটা মানুষ। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে পায়ের রগ বুঝি ছিঁড়ে গেছে'। সেদিন সব কথা বলার মত মানসিক অবস্থা ছিলনা। বোরখা শামসুন কাছেই ছিল। ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলাম।[১১]

এই ছিল সেদিনের বাংলার প্রতিবাদের চরিত্র। মাতৃভাষার সম্মানের কাছে কোনো ক্লান্তিই যথেষ্ট নয়। দূর দূরান্ত থেকে আগত পথ-শ্রান্ত আন্দোলনকারীরা রাজনৈতিক আলোচনায় তপ্ত হয়ে ওঠে পরক্ষণেই।[১২]

পুলিশের মুখোমুখি— মুসলিম মেয়েদের এবারের অবস্থান। ২০ ফেব্রুয়ারি বিতর্ক শুরু হয়, পরের দিন শান্তিপূর্ণ মিছিল না ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ? মুসলিম নারী কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিপক্ষে। সে সম্মুখ সমরে অধিকার বুঝে নিতে চায়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষেই তার অবস্থান। কে আগে পুলিশের মুখোমুখি হবে তার প্রতিযোগিতা শুরু হল। পুলিশ রাইফেল হাতে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে। এর আগে এমন কোনও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন এ মেয়েরা হয়নি। তবুও সে ভীত নয়। প্রাণের চেয়ে মাতৃভাষা বড়। এমনকি, ছাত্রদের গ্রেফতার এড়াবার জন্য ছাত্রীরা প্রতিটি দলের অগ্রভাগের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়।

বাঁধভাঙা তরঙ্গের মত ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিয়ে আইন অমান্যে যোগ দিল। আপসহীন ইস্পাত-কঠিন শপথে উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের আটকায় কে![১৩] লেখক তাঁর সেদিনের সংগ্রামকে বর্ণনা করছেন—

> সফিয়া আপা, হালিমা ও আমি গেটের কাছে আসি এবং সব ছাত্রী যাতে মিছিলে যোগ দিতে পারে সে সুযোগ সৃষ্টির সাহায্য করি। সফিয়া আপা যান লাঠির ওপর দিয়ে, হালিমা লাঠির নিচ দিয়ে। দুটোর কোনোটাই আমার মনঃপূত হলো না। সেজন্য আমি ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে লাঠির কর্ডন সরিয়ে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং কর্ডন ভেদ করে তৃতীয় দলের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিই।[১৪]

স্বাধীন দেশে ধর্ম রক্ষার(!) বান্দারা নিজ ধর্মের মানুষদের উপরেই লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করল। বাদ গেল না নারী ও শিশু। এসব সহ্য করেই মিছিল এগুতে থাকে। যথেচ্ছভাবে গ্রেফতার করা হয় ছাত্র ছাত্রী নির্বিশেষে। মুসলিম পরিবারের ছাত্রীর জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। গুরুতর আহত হন রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া আহমেদ। তবুও এগিয়ে চলল মিছিল।

এমনই ছিল সংগ্রামী চেতনার মূর্ত প্রকাশ। মুসলিম নারীর এই চেতনার কাছে অভিভাবক, শিক্ষকের অনুশাসন হার মেনেছে। হার মেনেছে কেরিয়ার গড়ার হাতছানি—

> সিলেটের কুলাউড়ার ছালেহা বেগম ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালীন স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য তখন সেখানকার ডিসি ডি কে পাওয়ারের আদেশে তাকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। তার পক্ষে আর পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি।[১৫]

এইভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার ও মহিলাদের সংগঠিত করার কারণে লাঞ্ছনা, কারাবাস মাথা পেতে নিয়েছে সে। খুলনার স্কুল ছাত্রী হামিদা খাতুন, আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃ যোবেদা খাতুন(১৯০১-১৯৮৬) প্রমুখ তার উজ্জ্বল উদাহরণ।[১৬]

এখানেই তার ভূমিকা থমকে থাকে না। ভাষার মর্যাদাকে হেয় করে স্বামীর ঘর করা, ভাষা সৈনিক নারীর কাছে চরম অবমাননাকর। ‘স্বামীর সাথে জন্ম জন্মান্তরের

বন্ধন' এ মিথ ভেঙ্গে ফেলে সে। নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম(১৯২৩-১৯৬৭) হলেন তার পথপ্রদর্শক—

> তিনি শহীদদের রক্তশপথে নারায়ণগঞ্জবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উজ্জীবিত করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে কারাগারে পাঠান হয়। বন্ড দিয়ে কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভে অস্বীকৃতি জানালে তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। মমতাজ বেগমের সাজান সংসার চুরমার হয়ে যায়।[১৭]

মর্যাদাহীন সংসার তার কাছে কাম্য ছিল না। কারণ সেদিন ভাষা সত্যিকারেই প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছিল নারীকে। তাই এই আন্দোলন মুসলিম নারীকে অনন্য চারিত্রিক দৃঢ়তায় আসীন করেছিল। যা শুধু মুসলিম বাংলার ইতিহাসে নয়, সমগ্র বাংলার ইতিহাসে বিরল ঘটনায় পর্যবসিত।

নারীর বীরত্বের এ ইতিহাস আজ স্মৃতির অগোচরে চলে যেতে বসেছে। রওশন আরা বাচ্চু গুরুত্ব সহকারে ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। যদিও তাঁর রচনায় বৃহৎ ছাত্র সমাজের সুমহান অবদানও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে আপামর জনসাধারণের আন্দোলন মূখর ভূমিকাও।

পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাসের ভীতি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ১৪৪ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রসমাজ এগিয়ে চলে। ফ্যাসিস্ট সরকারের পক্ষে, ছাত্রদের এ তেজ হজম করা সম্ভব ছিল না। গুলি চালানোর হুকুম জারি করল পাকিস্তান সরকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ দেয় বরকত সহ আরো অনেকে।[১৮] গুলি চলার পর ছাত্রদের আন্দোলন পরিণত হয় জন আন্দোলনে। সে ঘটনা সম্পর্কে রওশন আরা বাচ্চু লিখছেন—

> অনুষ্ঠান করা থেকে শিল্পীরা বিরত থাকে। যানবাহন ও দোকানপাট লোকেরা বন্ধ করে দেয়।[১৭]২১ ফেব্রুয়ারি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া ঢাকা শহরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকই ছিল। কারণ আন্দোলনটা ছিল মূলত ছাত্রদেরই। কিন্তু গুলি বর্ষণের পর তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। চারদিকে তখন বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি

> বেসরকারি অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যায়। রেডিওতে অনুষ্ঠান করা থেকে শিল্পীরা বিরত থাকে। যানবাহন ও দোকানপাট লোকেরা বন্ধ করে দেয়।[১৯]

গণআন্দোলনের এই জোয়ার পূর্ববঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের অভ্যন্তরেও পৌঁছায়। বিরোধী দলের সদস্য আনোয়ারা বেগম (১৯১৮-১৯৮৮), রংপুরের খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২), কুমিল্লার আহমদ আলী এই ঘটনার প্রতিবাদ করে অধিবেশনের উপর মুলতুবি প্রস্তাব আনেন।[২০] স্বভাবতই সরকার পক্ষ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। এই সময় একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটে যায়। সরকারপন্থী পাবনার সদস্য ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। সে সম্পর্কে রওশন আরা বাচ্চু লিখছেন—

> তিনি বললেন, যখন আমাদের বক্ষের মানিক, আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নেতা ছয়জন ছাত্র রক্তশয্যায় শায়িত তখন আমরা পাখার নিচে বসে হাওয়া খাব, এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি জালেমের জুলুমের প্রতিবাদে পরিষদগৃহ পরিত্যাগ করছি এবং মানবতার দোহাই দিয়ে আপনার মাধ্যমে সকল মেম্বারের কাছে পরিষদকক্ষ ত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি এটা বলার সঙ্গে তিনি বাজেট অধিবেশন বয়কট করে বিরোধীদলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও কংগ্রেস পার্টির সদস্যসহ পরিষদ ভবন ত্যাগ করে মেডিকেল কলেজে শহীদ ও আহতদের দেখতে চলে আসেন।[২১]

শহীদ ও আহতদের দেখা এবং বরকতের মস্তিকের তাজা রক্তে ভেজা স্থান দেখার জন্য লোক সমাগম হয় সর্বত্র। এ রক্ত জনতাকে পিছু টানে না। জঙ্গি আন্দোলনে উদ্দীপনা সঞ্চার করে। এর পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদের জন্য গায়েবানা জানাজা। জানাজায় উপস্থিত ছিলেন— মওলানা হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬), খয়রাত হোসেন, আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রমুখ।[২২] জানাজা শেষে শহীদদের রক্তমাখা জামা বাঁশের মাথায় বেঁধে শুরু হয় জঙ্গি মিছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এগিয়ে যায় সে মিছিল।

সাধারণ মানুষের সংগ্রামের তেজে পাকিস্তানের মন্ত্রী আমলারা প্রমাদ গোণেন তাঁরা লুকিয়ে পড়েন সেনা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। সরকার আন্দোলন দমাতে সেনাবাহিনী

তলব করে। গুলি বর্ষণ শুরু করে পুলিশ। কিন্তু সে সব উপেক্ষা করে বাঙালি। জীবন বাজি রেখে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। সকলে কালো ব্যাজ ধারণ করে। পালিত হয় হরতাল।

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থানে কলেজের ছাত্ররা নির্মান করে প্রথম শহীদ মিনার। বাইরে কারফিউ। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্ররা বেপরোয়া, জীবন বাজি রেখে উদ্দেশ্য সফল করতে বদ্ধপরিকর।[২৩] পরদিন ভোরে সংগ্রামী ছাত্রদের এ জীবনপন লড়াইয়ে জীবন যোগ করে হাজার হাজার মানুষ–

> মিছিলের পর মিছিল ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। অসংখ্য মেয়ে সোনার অলঙ্কার খুলে দিল আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। সারা দেশে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট পালিত হলো।[২৪]

এ সর্বাত্মক আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ দিশাহারা। বাঙালির খুনে রক্ত গঙ্গা বইল। আন্দোলন থামলনা। সরকার উদ্দত হল আন্দোলনের আঁতুড় ঘর ধ্বংস করতে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল চব্বিশ ঘন্টা ঘেরাও করে ত্রিশ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। ওই দিনই একই কায়দায় গ্রেফতার করা হয় ১০ মেডিকেল ছাত্রকে। ঘেরাও চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি সি মোয়াজ্জেম হোসেন, মুসলিম হলের প্রভোস্ট ড. ওসমান গনি ও রেজিস্ট্রারকে কাঠের পুতুলের মত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। গ্রেফতার করা হয় মুসলিম হলের হাউস টিউটর অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদকে।[২৫] এ যেন ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ ছাত্র অধ্যাপক হত্যার পূর্ব প্রস্তুতি।

আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করলেই প্রতিবাদ থমকে যাবেনা, এ তারা জানে। তাই ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে ধ্বংস করা চাই। শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ তাই ভেঙে টুকরো করে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ভাষা আন্দোলন জন মানসে যে সংগ্রামের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে তা কোনও মুল্যে নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি পাকিস্তান সরকারের পক্ষে। ছাত্রদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রেফতার বরণ করলেন সমাজের মাথারাও– আবুল হাশিম(১৯০৫-১৯৭৪), মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী(১৮৮০-১৯৭৬), খন্দকার

মোশতাক আহমেদ(১৯১৮-১৯৯৬), আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ(১৯০০-১৯৮৬), পুলিন দে(১৯১৪-২০০০), ড. পি সি চক্রবর্তী, ড. আজমল, খয়রাত হোসেন(১৯০৯-১৯৭২), গোবিন্দলাল মুখার্জি , মির্জা গোলাম হাফিজ(১৯২০- ২০০০), মুহাম্মদ তোয়াহা(১৯২২-১৯৮৭), আজিজ আহম্মদ, আলি আহাদ(১৯২৮-২০১২), এস এ বারী এ টি(১৯২৭-১৯৮৭), খালেক নেওয়াজ(১৯২৬-১৯৭১), শওকত আলী(১৯৩৬-২০১৮), হাশিমুদ্দিন আহমদ, আব্দুল মতিন(১৯২৬-২০১৪), ফজলুল করিম , আনোয়ারুল হক(১৯১৮-১৯৮১), সাদেক খান(১৯৩৩-২০১৬), লতিফ চৌধুরী, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী(১৯৩১-২০১৪), মজিবুল হক, ... প্রমুখ।[২৬]

এইভাবে ছাত্রসমাজ সংকটগ্রস্ত জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। লেখক তাই যথার্থই প্রবন্ধের শেষে বলছেন—

> জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে রাজনীতিবিদরা যখন মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই তখন হয়ে উঠেছিল জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও তাদের পথপ্রদর্শক।[২৭]

‘বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল

ভাষা সংগ্রাম সম্পর্কে সুফিয়া কামালের ভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর লেখা ‘একালে আমাদের কাল’[২৮] নামক আত্মচরিতে। অল্পপরিসরে হলেও ভাষা চেতনার নির্যাসকে তুলে ধরেছেন। আত্মচরিতে তিনি লিখছেন—

বাংলা ভাষার উপর আঘাত নামে এলে তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যদিও তাঁর শায়েস্তাবাদের বাড়িতে তখনও উর্দু ভাষাই প্রচলিত ছিল। তবুও কি অমোঘ টানে তিনি এই আন্দোলনের পুরোধা হয়ে আন্দোলনকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সে সম্পর্কে তিনি লিখছেন—

> অবশ্য শায়েস্তাবাদের আমাদের পরিবারেরও তখনকার ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু আমাদের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জায় যে ভাষা মিশে গেছে তা বাংলা বাংলার ভাষা, বাংলার আকাশ বাতাস মাটি পানিতে এ দেহ পুষ্ট। এর প্রকৃতির

> শোভায় চোখ জুড়ায়। এর গানে সুরে সংস্কৃতিতে আমাদের গৌরব, একে ছেড়ে কি বাঁচা যায় ?[২৯]

সুফিয়া কামালের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় বাঙালিকে ভাষার জন্য এই মরণপণ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করল কোন সে চেতনা? জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে যে ভাষা তাকে ছাড়া জীবন চলে না। তাই বাঙালি গড়ে তোলে নতুন ইতিহাস। সুফিয়া কামাল লিখছেন –

> বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন পৃথিবীর বুকে এক নতুন ইতিহাস। বিস্ময়। বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা মরতে ভয় পায় না। বাংলার মা তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে কুণ্ঠিত নয়।[৩০]

বাঙালির এ ভূমিকা তাঁর কাছে গর্বের তো বটেই। তাঁর আরও গর্বের উদ্রেক করে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে। মুসলিম মহিলার অবরোধের বাইরে আনার কঠোর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি। সেই নারী প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে মিছিলে অংশগ্রহণ করছে। তাঁর কাছে নারীর এ ভূমিকা বিস্ময়কর তো হবেই। ১৯৫২র ২১ ফেব্রুয়ারিতে নারীর সে ভূমিকা সম্পর্কে লিখছেন–

> এল ৮ই ফাল্গুন। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী, অমর একুশে গৌরবোজ্জ্বল শহীদ দিবস। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী দেখলো বাঙ্গালীর বিক্রম, তার আত্মত্যাগ, মেয়েরা মায়েরা আর শুধু শোকাকুলা নন। তারা সাহসিকা। পথে পথে শোকমিছিল। নগ্নপদে কচি বাচ্চার হাত ধরে পুলিশের আক্রমন তুচ্ছ করে পথে বের হলাম আমরা। হার মানতে বাধ্য হল পশুশক্তি নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে।[৩১]

সনজিদা খাতুনের রচনায় ভাষা আন্দোলন

সনজিদা খাতুনের ‘একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে’[৩২] পুর্ব বাংলার বাঙালি মানসের পাকিস্তান নিয়ে স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং প্রতিবাদ প্রতিরোধে জ্বলে ওঠার কাহিনি শোনায়। এই প্রবন্ধ সেই মেয়ের কাহিনী যে ভাষার কি মহিমা তা নিয়ে আগে থেকে সচেতন ছিল না। এ প্রবন্ধ সেই মায়ের কাহিনি যিনি আগে বীরাঙ্গনা ছিলেন না। ৫২-র একুশ তাঁদের

সচেতন করেছে, ভাষা দিয়েছে প্রতিবাদী বীরাঙ্গনা করে তুলেছে। তাঁর 'একুশে ফেব্রুয়ারি: গণসঙ্গীত ও আন্দোলন' [৩৩] প্রবন্ধটি সেই সময়ের উদ্দীপ্ত ভাষা চেতনার ভাষা। সে ভাষা বীরত্বের সে ভাষা সাহসের– যা প্রবাহিত হয়েছে কথা সুরের মাধ্যমে। সেই কালজয়ী গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছে দেশবাসী।

সনজিদা খাতুন এই প্রবন্ধে সেই মেয়ের মানুষ হয়ে ওঠার পরিক্রমা দেখিয়েছেন – যে আটচল্লিশে পাকিস্তান প্রধান মহম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে গলা ফাটিয়েছে। কিম্বা 'পাকিস্তানের গুলিস্তানে আমরা বুলবুলি' অথবা 'পাকিস্তানে অভাব কি' গান গেয়ে সুখে দিন কাটিয়েছে। এমনকি ৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারিতেও অংশগ্রহণ করার মত সুবিধাজনক অবস্থান নিজের জন্য সৃষ্টি করতে পারেনি। নিজের সেদিনের সে অবস্থা সম্পর্কে সনজিদা খাতুন লিখছেন–

> একুশে ফেব্রুয়ারিতে সে বছর বৃহস্পতিবার ছিল; প্রথম বেলাতে ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরেছি।[৩৪]

এরপর দুপুরের পরে গুলিবর্ষণের খবর। এই গুলিবর্ষণই পিছুটানে আটকে থাকা মানুষকে প্রতিবাদ মূখর হতে সাহায্য করে। সনজিদা খাতুন লিখছেন– পুরোনো ঢাকার বাসিন্দারা নিজেরা একরকমের উর্দু বললেও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে এগিয়ে এসেছিল মুষ্ঠীবদ্ধ হাত নিয়ে।[২৯] মেয়েরাও তাদের আন্তরিক ভীতি অবদমিত করে নিজের মত করেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। অভয় দাস লেনের একটি বাড়িতে নূরুল আমীনের(১৮৯৩-১৯৭৪) রক্ত চেয়ে মহিলাদের সভা আহূত হয়।

সেই সভায় যাওয়ার পথে অবাঙালি সেনার চোখ রাঙানি। ঘাতক সেনার ভীতিতে বুক কাঁপে। কিন্তু জেদ বড় অসম্ভব। 'জেদ' এই ভিত মানুষদেরকে সেনাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে শেখায়। সনজিদা খাতুন বর্ণনা করছেন–

> এ কাহিনি সাহসের নয়, নয় দুঃসাহসেরও। একুশে ফেব্রুয়ারি কেমন করে আনকোরা সাধারণ মানুষগুলোর প্রাণ ধরে টান দিয়েছিল, তারই। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে পিটে নিয়েছিল – কী করে আগে

> বাড়তে হয়, ভয়ের মোকাবেলা করতে হয়। আরো শিখিয়েছিল কথা বলতে,...[৩৫]

ভয়ের বিরুদ্ধে সে প্রথম ভাষা। যারা নারীর মাতৃ সুলভ কমনীয়তার দোহাই দিয়ে তাদের প্রতিবাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় এবং অত্যাচারীকে সুরক্ষিত রাখতে চায় – তাদের বিরুদ্ধে সে ভাষা। সেই ক্ষোভ ঘৃণায় ভরা ভাষায় উচ্চারিত হয়–

> দেশবাসীর বুকের রক্তে মাটি ভিজিয়ে দিলে দোষ নেই, আর হত্যাকারীর খুন-চাওয়াটা হতে পারে বড় অপরাধ![৩৬]

এই প্রতিস্পর্ধী উত্তর শুধু এক তরুণীর নয়। তার পিছুটান কম। কিন্তু একজন মা ? তাঁর তো অনেক পিছুটান। তাঁর পিছুটান আছে, সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তায় ভয় আছে। কিন্তু আতঙ্ক নিয়ে তাঁরা ঘরে বসে থাকেন নি। কিম্বা সন্তানকে ঘরে আটকে রেখে সুরক্ষিত করতে চাননি। সন্তানের সাথে প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছেন। নিজের সাধ্যমত সংগঠিত করেছেন মহিলাদের।

রাজনৈতিক আন্দোলনের নির্যাস গণমনে পৌঁছে দেওয়ার শক্তিশালী মাধ্যম সঙ্গীত। ভাষা আন্দোলনে সঙ্গীতের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। লেখা হয়েছিল অনেক গান। সন্‌জিদা খাতুন সেই গানের প্রসঙ্গ নিয়ে লিখছেন 'একুশে ফেব্রুয়ারি: গণসঙ্গীত ও আন্দোলন'। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৯৫২তে একের পর এক গানের মাধ্যমে শক্তিশালী গণসঙ্গীতের ধারা তৈরি হল। গান শুধু আর ভাষার দাবি হয়ে রইল না। নিজস্ব অধিকার আদায়ের প্রতীক হয়ে রইল। সন্‌জিদা খাতুন লিখছেন–

> কেবল ভাষা তো নয়, যে-কোনো অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই দিনকে ঘিরে শক্তি অর্জন করেছে একের পর এক আন্দোলন।[৩৭]

আবদুল গাফফর চৌধুরী(১৯৩৪-২০২২) লিখলেন কবিতা। তার কিছু অংশে সুর সংযোগ করলেন আবদুল লতিফ(১৯২৭-২০০৫) ও আলতাফ মাহমুদ(১৯৩৩-১৯৭১)। সেই অনন্য সৃষ্টি- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি?' সিকান্দার আবু জাফর(১৯১৮-১৯৭৫)এর কথা শেখ লুতফর রহমান(১৯২০-১৯৭৯)র

সুরে জনতার আবহমান কালের সংগ্রামের পদধ্বনি– 'জনতার সংগ্রাম চলবেই'। সাধন সরকার(১৯২৯-১৯৯২) সুর দিলেন আবুবকর সিদ্দিক(১৯৩৬)এর কথায়– 'ব্যারিকেড বেয়োনেট, বেড়াজাল', ...। আবুবকর সিদ্দিকের 'বিপ্লবের রক্তরাঙা' লুতফর রহমানের সুরের যাদুতে স্বপ্ন রঙীন হয়ে উঠল। আবদুল লতিফ 'বাপ দাদার জবানের মান' বাঁচানোর শপথ চারিত করে দিলেন নিজের লেখা কথা সুরে।[৩৮]

পাকিস্তান শাসক ইসলামের দোহাই দিয়ে যে গান বন্ধের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল সেই গানই প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠল। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১) পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষার উৎসবে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে গেলেন। তাঁর লেখা প্রকৃতি পর্যায়ের গানও গণ আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল(১৮৮৯-১৯৭৬), সুভাষ মুখোপাধ্যায়(১৯১৯-২০০৩) এর বিদ্রোহের গান উদ্বেলিত মানুষের রক্তে মুক্তি নাচন লাগিয়ে দিল। সলিল চৌধুরী(১৯২৩-১৯৯৫) আসলেন তাঁর প্রতিবাদী গান নিয়ে। এই সময়েই নজরুলের লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতার সুর দেওয়া হয়। সুর দেন আলতাফ মাহমুদ ও শেখ লুতফর রহমান। সন্‌জিদা খাতুন লিখছেন–

> আবর্তনের নিয়মে, স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদ জাগতেই-রবীন্দ্র-নজরুলের সাময়িক গানগুলো আমাদের আন্দোলনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল।[৩৯]

'আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদে' শুধু রবীন্দ্র-নজরুল, সলিল চৌধুরী-সুভাস মুখোপাধ্যায় নন-প্রাসঙ্গিক হল বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের গান, রামপ্রসাদী পুরাতনী গান। এই গানই পরবর্তীকালে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।

বেগম হবিবর রহমানের স্মৃতিতে ভাষা আন্দোলন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক হবিবর রহমান ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। কবে কিভাবে জানেন না কেউ। এই মহান শিক্ষকের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী বেগম হবিবর রহমান ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর স্বামীর সমর্থন সম্পর্কে বলছেন।[৩১] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে একজন শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের

আন্দোলনের একজন অকুণ্ঠ সমর্থক ছিলেন তিনি। শুধু সমর্থকই নন– একজন শিক্ষক হিসাবে এই আন্দোলনে কেন অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতনের প্রতিকার কেন করতে পারছেন না তা নিয়ে সতত চিন্তা করতেন। সে নিয়ে বেগম রহমান লিখছেন–

> উনিশ শ' বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের সময় দেখেছি। হয়তো ঘরে পায়চারী করছে আর বলছে 'ওরা আমাদের ছেলেদের মেরে ফেলছে- আমরা মিছিল ছাড়া আর কিছু করতে পারছিনা। একি অন্যায় শুরু হয়েছে'।[৪০]

লক্ষ্য করার বিষয়– শিক্ষক এখানে পিতার ভূমিকায়। ছাত্ররা তাঁদের সন্তান সম। তাদের উপর রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের প্রতিকার করতে না পেরে উৎকণ্ঠিত। সারা দেশে এই আন্দোলনের উত্তাপ যখন ছড়িয়ে পড়ল তিনি আশ্বস্ত হলেন। বেগম রহমান লিখছেন–

> ভাষা আন্দোলন যখন সারা দেশে ছড়িয়ে গেল তখন আর মুখ আগের মত কালো করে ওকে থাকতে হল না এবং বেশ খুশিই হল।[৪১]

তাঁর এই দেশপ্রেম নিহিত ছিল অনেক গভীরে। যা চারিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধেও। ভাষা আন্দোলন থেকে শাসকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতা জন্ম দিয়েছিল আরও বড় এক সংগ্রামের।

এইভাবে ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল মুসলিম নারীকে সমাজের কাছে ও তার নিজের কাছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রথম ধাপ সে সকল ভাবে উত্তোরিত হতে পেরেছে জয়ী হয়েছে সে। আত্মত্যাগে, যুদ্ধযাত্রায় তার অংশও কম নয়– এ তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। শক্তি সঞ্চয় করেছে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গড়ে তোলার জন্য। প্রস্তুত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিজের নারীত্ব ও মানবিক সত্তাকে বিকশিত করবার কাজে।

তথ্যসুত্র:

১। সাদিয়া, সুপা, *৫২'র বায়ান্ন নারী,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০১১,পৃ- ১৪, মূল্য- ১৮০টাকা।

২। আহমেদ, সুফিয়া, 'ভাষার জন্য আবেগ বাঁধ মানেনি সেদিন', *অমর একুশে এবং আজকের বাংলাদেশ,* হক, ইমদাদুল(সম্পাদিত), মুন্নী প্রকাশক, ৩৮ক বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০,প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ-১০০, মূল্য- ৭০ টাকা।

৩। আহমেদ, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০০।

৪। আহমদ, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০০।

৫। হক, ইমদাদুল (সম্পা) 'জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমদ', কালের কণ্ঠ, www.kalerkantho.com, আপডেট: ৬ফেব্রু, ২০১৬, ০১.০১।

৬। আহমেদ, সুফিয়া, 'ভাষার জন্য আবেগ বাঁধ মানে নি', প্রাগুক্ত, পৃ- ১০০।

৭। আরা, রওশন বাচ্চু, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', *ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর,* প্রকাশক- আহমেদ মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৩০০ টাকা।

৮। আরা, রওশন বাচ্চু, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৫।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৬।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ– ১০৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ– ১০৭।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৮।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৮।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ– ১০৭।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ– ১১২।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১২।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৮।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৯।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ- ১১১।

২৭। আরা, রওশন বাচ্চু, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১২।

২৮। কামাল, সুফিয়া, 'একালে আমাদের কাল' , arts.blnews24.com।

২৯। কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ-

৩০। কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত।

৩১। কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত।

৩২। খাতুন, সনজিদা, 'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে', *একুশে ফেব্রুয়ারি,* আবুল হাসানত সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ- ১৪, মূল্য- ২৫০ টাকা।

৩৩। খাতুন, সন্‌জিদা, 'একুশে ফেব্রুয়ারি: গণসঙ্গীত ও আন্দোলন', পৃ- ২৮।

৩৪। খাতুন, সনজিদা, 'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে', প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪।

৩৫। খাতুন, সনজিদা, প্রাগুক্ত,'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে', পৃ- ১৫-১৬।

৩৬। খাতুন, সনজিদা, ' একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে' প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬।

৩৭। খাতুন, সনজিদা, 'একুশে ফেব্রুয়ারি:গণসঙ্গীত ও আন্দোলন', প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮।

৩৮। খাতুন, সনজিদা, 'একুশে ফেব্রুয়ারি:গণসঙ্গীত ও আন্দোলন', প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯।

৩৯। খাতুন, সনজিদা, 'একুশে ফেব্রুয়ারি:গণসঙ্গীত ও আন্দোলন', প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯।

৪০। হবিবর রহমান, বেগম, 'আমার স্বামী', হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি: ১৯৭১* , ১ম খণ্ড, ১ম পুনর্মূদ্রণ- ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা, পৃ- ৩১-৩৬।

৪১। হবিবর রহমান, বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬।

৪২। হবিবর রহমান, বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় পূর্ব বাংলার সমাজ প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় পূর্ববাংলার সমাজ প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭০)

উনিশশো সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা বাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক জগতে নতুন রূপরেখা তৈরী হয়। অখণ্ড ভারতবর্ষে যে মুসলমান জনসাধারণ নিজেদের উদ্বৃত্ত ভেবে পৃথক দেশ পাকিস্তানের দাবি করেছিলেন— তাঁদের কাছেও ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে অদ্ভুত দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কারণ- ধর্ম যাই হোক শাসকের চরিত্র এক। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ভাষা সংস্কৃতি সমস্ত দিক থেকেই যে ঔপনিবেশিক মানসিকতা দেখা গিয়েছিল তাকে চিনতে গিয়ে বাংলার মানুষ আগে বাঙালী হয়েছেন পরে মুসলমান। এই পরিচয়ই ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গবাসীকে নানান কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে রেখেছিল। এই পরিচয় অনেক বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে প্রাণিত করেছিল। এই সময় নারীও ধীরে ধীরে অনেক কিছু আবরণ ভেদ করে বাঙালী পরিচয়কে সাথে নিয়ে শিক্ষা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। যদিও মৌলবাদী এক শাসনামলে তা সহজ ছিল না মোটেই। কিন্তু স্বৈরাচারী মৌলবাদী শাসনের পাষাণভার আলগা করতে নারীও অংশগ্রহণ করেছেন রাস্তায় নেমে আবার অন্তঃপুরে থেকেও। এইসময়ে নারীর সামাজ প্রগতির আন্দোলন ও তার নিজস্ব মুক্তির দাবী নিয়ে সংগঠিত আন্দোলনের গতিপথ ধরতে চেয়েছি সেই সময়কে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের লেখা নিয়ে। সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯), মালেকা বেগম(১৯৪৪), নবুয়াত ইসলাম পিনকি(১৯৪৪), সনজিদা খাতুন(১৯৩৩), কোহিনূর হোসেন সেই সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তাঁদের লেখায়।

১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পুর্ববর্তী সমাজ ও নারীর অবস্থান

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর ঔপনিবেশিক শোষণনীতি চাপিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পূর্ববঙ্গ ব্যবহৃত হতে

লাগল। যার ফলে সোনার ফসল ফলে যে বাংলায় সেখানেই ১৯৫০-১৯৫১ সালে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, প্রবল অর্থাভাব[১] কিন্তু তা নিয়ে পশ্চিমের শাসক কিম্বা তাদের পূর্বের দোসরদের কোনও ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তার সাথে ছিল ইসলামী সংস্কৃতির গোঁড়ামীকে চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি। যাতে করে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিকে দমন করা যায়। এরই ফলস্বরূপ আমরা ভাষা আন্দোলন দেখেছি। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে বাঙালি নিজেকে চিনতে শিখলেও পাকিস্তান বাঙালির শক্তিকে চিনেছিল ঢের বেশি। তাই অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে পঙ্গু করে বাঙালীকে মারতে চেয়েছিল। তাই ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৫১ সালে যে নির্বাচন হওয়ার কথা তা হতে পারে না। পূর্ববঙ্গবাসীর অনেক মেহনতের ফলে নির্বাচন শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। সেই নির্বাচনে সরকারপন্থী মুসলিম লীগের ধরাশায়ী হার মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই কিছু দিন পরেই জনগণের বিপুল ভোটে জেতা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন ... ... ।[২] ১৯৫৫ সালে সামরিক শাসন তুলে নিয়ে সরকার গঠন করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সরকারকে করে রাখতে চাওয়া হয়েছিল পুতুলের মত। ফলে এই সময় একের পর এক সরকারের পতন ঘটে। নতুন সরকার গঠন করা হয়। ১৯৫৬ সালে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেলেও পূর্ববাংলা তার নাম হারায়। পূর্ব বাংলার নতুন নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। সমস্ত সরকারি জায়গায় পূর্ববঙ্গ পূর্ববাংলা বলা নিষিদ্ধ করা হয়।[৩] ১৯৫৮ সালে আবার সামরিক শাসন জারি করা হয়। এবং সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলন, আইন ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপন সরকারি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ হাতিয়ার হয়ে নেমে এলেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুচ্ছ করে শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীরা রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপন করলেন বিপুল সমারোহে।

সরকারী নিয়ম কানুন যতই কঠোর হয়েছে ততই মানুষের ক্ষোভে বারুদ ভরেছে শাসক। ১৯৬২ সালে এসে সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করল ছাত্ররা আবারও। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম গণ বিক্ষোভ শুরু হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে।

সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামাল "একালে আমাদের কাল"(১৯৮৮)[৪] এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন দেশভাগ উত্তর কালের পূর্ব বাংলার সমাজ সংস্কৃতির আন্দোলন, নারীমুক্তির আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়। তিনি নিজে যেহেতু ছিলেন একজন সমাজ সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মী তাই সেই সময়ের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছিলেন আন্তরিকভাবে যুক্ত। তাতে অনেক সরকারি বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে সত্যের পথ থেকে টলানো যায়নি। তাঁর এই রচনা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

সুফিয়া কামাল দেশভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া পাকিস্তানে যে মানুষের আসল মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে না তা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। রোকেয়ার আদর্শে গড়া সুফিয়া কামাল ঢাকায় এসেই নতুন দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে লীলা নাগ হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করেছেন। সুফিয়া কামাল এই কমিটিতে যোগ দেন। নতুন করে গড়ে ওঠা দেশে শান্তি, নিরাপত্তা, বাসস্থান, খাদ্যের সংস্থানের বিষয় নিয়ে এঁরা গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদের মধ্যে কাজ করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে দেশভাগে বিধ্বস্ত, উৎপীড়িত মেয়েদের কাছ থেকে অনেক কটুকথা শুনেছেন। কিন্তু হাল ছাড়তে পারেননি তাঁরা। এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল স্মরণ করেছেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগের অসীম ধৈর্যের কথা। তিনি বলছেন-

> সর্বহারা ঘরহারা স্বজনহীনা স্বামীপুত্রহীনা মায়েদের বুকের তপ্ত অভিশাপ আকুল কান্না কটুবাক্য সহ্য করতে হয়েছে। দুঃখের কাহিনী শুনে শুনে কত প্রহর কত গভীর রাত হয়ে গেছে। ওদের সাথে না মিশলে, সমব্যাথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন?[৫]

এই উদ্ধৃতিতে দেশহারা মানুষদের করুণ অবস্থার কথা খুব বেশি বর্ণিত না হলেও এই কয়েকটি কথায় অনুভব করে নেওয়া যায়। সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার দীর্ঘ যাত্রাপথে কত শত হত্যার স্মৃতি উসকে ওঠে। কত শত নারী হারিয়েছেন তাঁর স্বজন, হারিয়েছেন তাঁর সম্মান। তার বিনিময়ে এসেছে তীব্র ঘৃণা। এই ঘৃণা কখনও অন্য জাতির প্রতি কখনও

সভ্য সমাজের প্রতি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি। তারই নিস্ফল ক্রোধ ঝরে পড়েছে সমাজকর্মীদের প্রতি।

ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ভূমিকা পার হয়ে এল রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী। ১৮৬১ সালে নিষিদ্ধ করা হল যাবতীয় রবীন্দ্র চর্চা। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন সমস্ত রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ। ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, শিল্পীরা মিলিত হলেন রবীন্দ্র শতবর্ষ পালনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলেন সুফিয়া কামাল। ঐ কমিটির সভানেত্রী সুফিয়া কামাল সেদিনের সেই সরকারী বিরুদ্ধতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভূমিকার কথা লিখছেন-

> এল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী।.. ... নিষেধ জারী করতে তৎপর হয়ে উঠে পড়ে লাগল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বন্ধ করার জন্য। রাজধানীর গুণী সুধীজন বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো একান্ত অযোগ্য আমার কাছে তখনকার দিনের শিল্পী সাহিত্যিক সমাজসেবীরা এসে নানারূপ পরিকল্পনায় রবীন্দ্রজয়ন্তী অবশ্য পালনের শপথ গ্রহণ করলেন। সরকার তা শুনে আমার বাড়ীতে তৎকালীন অনেক পদস্থ কর্মচারী, উপদেষ্টা, ধর্মীয় ব্যক্তি পাঠাতে লাগলেন। ... .. বাধা-ব্যাঘাতের মধ্য দিয়ে অসম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সে আন্দোলনে।[৬]

সুফিয়া কামালের স্বামী- কামাল উদ্দীন আহমেদ(১৯৩৭ - ১৯৭৭) সরকারী চাকুরে বলে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কৌশলে চাপ সৃষ্টি করে নিরস্ত করার চেষ্টা হল তাঁকে। কিন্তু তিনি ছিলেন সংস্কৃতি রক্ষায় অনড়। তাই তো সুফিয়া কামাল রবীন্দ্র শতবর্ষ উদযাপনকে বলছেন- আন্দোলন। নিছক সংস্কৃতি চর্চা নয়।

মহাসমারোহে সে বছর পালিত হল রবীন্দ্র শতবর্ষ। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্র শতবর্ষের অনুষ্ঠান। তারপর সারা বাংলায়— চট্টগ্রাম থেকে সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর থেকে বরিশাল পর্যন্ত এক মাস ধরে চলে সে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পূর্ববঙ্গে আর এক ধরণের সমস্যা সম্মুখীন হয়েছিলেন সংস্কৃতিকর্মীরা। গান, নাচের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। রবীন্দ্র শতবর্ষের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সে অভাব আরও স্পষ্ট হয়। এ সমস্যার কথা আনোয়ারা বাহার চৌধুরীও জানিয়েছেন। সুফিয়া কামাল সহ অন্যান্যরা এই সমস্যা নিরসনের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 'ছায়ানট'। শিল্পী, কলাকুশলী সবাই মিলে দেশের সংস্কৃতি চর্চায় ও রক্ষায় 'ছায়ানট' রক্ষায় নিয়োজিত হলেন।[৭]

এই গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে তিনি অগ্রণী নারী সমাজকে নিয়ে পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন— 'উয়ারী মহিলা সমিতি'। শিশুদের সুন্দরভাবে গড়ে উঠবার জন্য 'চাঁদের হাট' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। তৈরী করেন 'কচিকাঁচাদের মেলা'। তিনি সে সম্পর্কে লিখছেন—

> সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে তখনকার দিনে পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পুরস্কার লাভে কচিকাঁচা আজ শিশুকল্যানমূলক একটি বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। আমাদের বাড়ির আমগাছতলায় কচি শিশু নিয়ে যে চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল আজ তা শাখা-প্রশাখায় বিরাট-বিশাল।[৮]

এই গ্রন্থে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক চিত্রে ধরা পড়েছে— পাকিস্তানী সামরিক শাসন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, রাজনীতির ছোঁয়াচের বাইরের মানুষদেরও স্বাধীকারের লড়াইয়ে অকাতরে যোগদানের কথা। লেখক ব্যথিত হয়েছেন— দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানরা অকাতরে প্রাণ বলী দিয়েছেন কিন্তু তার সঠিক ইতিহাস কেন লেখা হয়নি ![৯]

তিনি নিজে ছিলেন আমৃত্যু যোদ্ধা। পাকিস্তানী আমলের ১৯৬৬ সালের উত্তাল সময়েও সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির জন্য গ্রামে গঞ্জে ঘুরে কাজ করেছেন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সমিতির সভানেত্রী হিসাবে এই সংগঠনের উদ্যোগে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ধর্ষিত নারীদের ন্যায় বিচারের দাবিতে সামিল হয়েছেন।

সুফিয়া কামাল ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে লিখছেন তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে।[১০] ছাত্র আসাদুজ্জামানের মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখছেন। ছাত্রীরাও এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। সে প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—

> ৬৯ এর ১৯ জানুয়ারী ছাত্রীদেরও পুলিশ লাঠিপেটা করে। ২০ জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন ছাত্র আসাদুজ্জামান।[১১]

সুফিয়া কামালের *একাত্তরের ডায়েরীতে* (১৯৮৯) ১৯৭০ এর নভেম্বর ডিসেম্বরের ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের কথা জানা যায়। তাঁর এই ডায়েরী শুরু হয়েছে ১৯৭০ এর ৩০ ডিসেম্বর এই বন্যায় ত্রাণ দিতে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই দিনলিপির সূত্রে বন্যা পীড়িত মানুষের চরম দুর্দশার দিকটি অনুভূত হয়। দেশের সাধারণ মানুষের অশিক্ষার অন্ধকার, তাদের সরলতা, তাদের চাতুর্যে সুফিয়া কামাল দুঃখিত হয়েছেন। ত্রাণ দিতে গিয়ে তাদের অসহায়তা তাঁকে ব্যথাদীর্ণ করেছে। তিনি লিখছেন—

> হাজার হাজার মানুষ। সর্বহারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন। এককালে খেয়েদেয়ে চরের মানুষেরা স্বাস্থ্যবান ছিল। তাই আজও এরা মরণের সাথে যুঝে সবল। অসহায়। সরল, বোকা, চালাক লোকের অভাব নেই। যুগ যুগ ধরে এরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আজও এরা মৌন, মুক, অসহায়, ভীতু ভীরু।[১২]

এই সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যার কি মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল তা ১৯৭১ সালের ৫ জানুয়ারিতে লেখা ডায়েরির পাতায় ধরা পড়ে। ১১ নভেম্বর রাতে ঘটে যাওয়া সাইক্লোন সমুদ্র উপকুলকে মৃতের স্তূপে পরিণত করেছিল। এবং সরকারি নিশ্চেষ্টতায় সেখানকার মানুষের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। ৫ জানুয়ারি পর্যন্তও মৃতদেহের কোনও সৎকার হয়নি। তা এই লেখা থেকে বোঝা যায়—

> চর বিশ্বাস, চর সাগস্তিতে গেলাম... .... এখানে এখনও অনেক লাশ পড়ে আছে, ভেসে এসে হোগলা বনে, ধান ক্ষেতের আলে আলে লেগে আছে। অবশ্য আমাদের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু মাঝে মাঝে গন্ধ পাওয়া যায় আর

> মাছি এত, যে খাওয়া দাওয়া কষ্টকর। আজীজ এত মৃত দেহের স্কেচ এত সুন্দর করে করেছে। ভয়াবহ মৃত্যুর বীভৎস চিত্র।[১৩]

এই মৃতের স্তুপে ত্রাণ নিয়ে সুফিয়া কামাল মা ফতেমার মত পৌঁছে গেছেন সেখানে তাই ৬ জানুয়ারি রিলিফ শেষের দিন ১৫ হাজার মানুষের সমাগমে সুফিয়া কামাল, সুলতানা জামান(১৯৩৫-২০১২) সহ রিলিফ টিমকে সম্বর্ধিত করলেন ওখানকার মানুষ। একটা ভালো মালার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেননি। কিন্তু অপার শ্রদ্ধায় সাজান সে মালা-

> আজ বিকালে মাঠে জনসাধারণ সভা করল। কবে কার পুরানো কাগজের মালা, মালা আমার আর সুলতানার গলায় পরাল। হোক নোংরা পুরানো তুচ্ছ কাগজের মালা, কিন্তু সবার অন্তরের শ্রদ্ধায়, পূত পবিত্র অমূল্য এ মালা। মহিলারা উপস্থিত ছিলেন, কান্নায় আমার বুক ভেঙ্গে গেল। ওরা ভিক্ষা নিয়ে শ্রদ্ধা দিল।[১৪] ঐ, পৃ- ১৮-১৯।

জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি, তাদের সম্পর্কে তাঁর অগাধ ভালোবাসা এই অংশে ফুটে ওঠে। জনগণের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা তাঁর প্রতিও জনগণকে আস্থাশীল করেছে। একটি জাতির আত্মপ্রত্যয় হয়ে অবস্থান করেছেন আজীবন।

মালেকা বেগম

মালেকা বেগম সামাজিক রাজনৈতিক একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে বিভিন্ন আন্দোলনে নারীর ভূমিকার কথা, নারীর সমস্যার কথা অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। ১৯৪৭এর স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনে, নারীমুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীর ভূমিকা নিয়ে লিখেছেন- *বাংলার নারী আন্দোলন*(১৯৮৯), *নারীমুক্তি আন্দোলন*(১৯৮৫) *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (২০১১) গ্রন্থে।

মালেকা বেগম লিখছেন- ১৯৪৭ পরবর্তী বেশ কিছু বছর পূর্ববঙ্গের মহিলারা কঠিন অবরোধ-অশিক্ষা-কুসংস্কারের অন্ধকারে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজ সংস্কারের কাজে গার্লস মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে মহিলারা এগিয়ে আসেন।[১৫]

সরকারী নারী সংগঠনের বিপরীতে শিক্ষা প্রসারের দাবি নিয়ে কতিপয় মহিলা- জোবেদা খাতুন চৌধুরী(১৯০১-১৯৮৬), সেরাজুন্নেসা চৌধুরী এগিয়ে আসেন। সংখ্যায় তাঁরা কম হলেও তাঁদের দাবি ছিল অদম্য আর মনোবল ছিল অসীম। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী সিলেট মহিলা কলেজ বন্ধ হওয়ার প্রতিবাদে সে সময়ের গভর্ণর ফিরোজ খান নুনের সাথে দেখা করেন। গভর্ণর তাঁকে এক বছর সময় দিয়ে বলেছিলেন এর মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছাত্রী না হলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।[১৬]

জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সেরাজুন্নেসা চৌধুরী, শামসুন্নাহার মাহমুদ, আনোয়ার বাহার চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, মেহেরুন্নেসা, লীলা নাগ প্রমুখ সরকারী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসাধ্য সাধন করলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুধু সিলেট কলেজে পর্যাপ্ত ছাত্রীই জোগাড় করলেন না, বাংলাদেশের বিভিন্ন নারী শিক্ষা কেন্দ্র চালু রাখলেন এবং নারী শিক্ষা প্রসারে আরও শক্তি নিয়োগ করলেন।

ইডেন কলেজ ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলকে একত্রিত করার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর উদযাপিত হল স্বতঃস্ফুর্ত ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে সামিল ছিলেন ৫০০ জন ছাত্রী। চাকরি খোয়ানোর সরকারী ভয়কে উপেক্ষা করে শিক্ষিকারাও ধর্মঘট পালন করেছিলেন। আন্দোলনের তীব্রতায় সরকার তাঁদের দাবি মেনে নেয়।[১৭]

স্বাধীন দেশে নতুন করে মেয়েদের পর্দানসীন করা অশিক্ষিত রাখার কৌশল নেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন মালেকা বেগম। স্কুল কলেজের ছাত্রীদের বাসে পরিকল্পিত ভাবে গুণ্ডা বাহিনি দিয়ে আক্রমন চালানো হত। নাচ- গান প্রভৃতি সংস্কৃতি চর্চার আসরে মেয়েদের উত্যক্ত করা অপমানিত করা হত। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই পড়াশুনা, সংস্কৃতি চর্চা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। কতিপয় ছাত্রী এই কঠিন পরিস্থিতিতে রীতিমত সংগ্রাম করে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে চললেন।[১৮]

ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৫৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি চললে নারী সমাজ নিন্দা প্রস্তাব

গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য নারায়ণগঞ্জের মডার্ণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৯] এই সময় মেয়েরা একটি উল্লেখযোগ্য দাবি আদায় করে আন্দোলনের মাধ্যমে— ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা। নারীর স্বনির্ভরতার প্রশ্নটি সামনে রেখে নারী আন্দোলনের দাবি দাওয়া নির্ধারিত হয়। সরকারের কাছে তাই ম্যাটার্নিটি হাসপাতাল, গার্লস গাইড, নিটিং শিক্ষা কেন্দ্র খোলার দাবি জানানো হয়। ধারাবাহিক আন্দোলনে সরকার এ বিষয়ে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যান্য অধিকারের দাবিতে একই সাথে চলতে থাকে— প্রতিবাদ সভা, প্রচার অভিযান, শোভাযাত্রা, স্মারক লিপি পেশ প্রভৃতি কার্যক্রম।[২০]

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে লিখছেন এই গ্রন্থে। পাকিস্তানের গণপরিষদে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন- আনোয়ারা খাতুন(১৯১৯-১৯৮৮), নূরজাহান মুরশিদ(১৯২৪-২০০৩), দৌলতুন্নেছা খাতুন(১৯২২-১৯৯৭), বদরুন্নেসা আহমদ(১৯২৭-১৯৭৪), সেলিনা বানু(১৯২৬-১৯৮৩), রাজিয়া বানু।[২১]

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পাকিস্তান সরকার অকার্যকর করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। এরপর একের পর এক অস্থায়ী সরকার গঠন। এবং পাকিস্তান সরকারের চক্রান্তে দেশের মানুষ বিপন্ন হতে থাকেন। ১৯৫৭ সালে দেখা দেয় তীব্র খাদ্য সংকট। এই সময় মহিলারা খাদ্যের দাবিতে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। মালেকা বেগম লিখছেন—

> ১৯৫৭ সালে গ্রামবাংলা জুড়ে খদ্যাভাব দেখা দিলে হাজার হাজার মহিলা ভুখা মিছিল করেন। এবং খাদ্যের দাবিতে দিনের পর দিন আন্দোলন করে যেতে থাকেন।[২২]

১৯৫৮ সাল থেকে নতুন করে সামরিক শাসনে নারী পুরুষ সবারই অধিকার খর্ব হয়। কিন্তু নারীর অধিকার খর্ব হয় অনেক বেশি। ধর্মোন্মত্ত সামরিক শাসন মেয়েদের আরও বেশি অবরোধের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফলে অবরোধের আবদ্ধতায় তার বিকাশ যায় থমকে। সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সময়ের অভিঘাতে পুরুষরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই সময়ে প্রতিবাদী কণ্ঠকে হত্যা করার জন্য

নির্বিচারে কারাদণ্ড দিয়েছে সরকার। যা ভোগ করেছেন বেশিরভাগ পুরুষরাই। নারীর নির্যাতন হয়েছে তার পরিবারে, অন্তরে। অত্যাচারিত স্বামী, সন্তান, পিতা সহ আত্মীয়তার সূত্র ধরে তাঁদের পরোক্ষ নির্যাতন সইতে হয়েছে।[২৩]

এই সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক গতিপথ এগিয়ে যাচ্ছিল প্রবল এক শক্তির টানে— আত্মশক্তি। জনগণ ক্রমশ তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছিল। কিন্তু মালেকা বেগম মনে করেন— মেয়েদের অবস্থান ছিল পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। শাসকের সমস্ত রকম দমন পীড়ণ সত্ত্বেও পুরুষ বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রবল বেগে এগিয়ে যেতে পারছিল। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তার কারণ— একদিকে তার নিজস্ব মনন জগতের সংস্কার অন্যদিকে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক অবরোধে তার বিকাশ রুদ্ধপ্রায় ছিল। মালেকা বেগম লিখছেন—

> নির্দিষ্ট সময়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে নারী বঞ্চিত থাকার কারণে একই ঐতিহাসিক ঘটনা নারীর উপর পুরুষের তুলনায় ভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে(প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দমননীতি, সামরিক শাসনের সব কুপ্রভাব সত্ত্বেও পুরুষের অগ্রগতি সাধন ঠিকই হয়)। এই তাত্ত্বিকতার আলোকে নারীর ভিন্ন ভূমিকা পালনের কারণ, তার প্রতিবাদের ভাষা ও শক্তিকে বুঝতে হবে। এসব ভিন্নতা সৃষ্টি হয় বস্তুত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে[২৪]

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে নিহত হন আসাদুজ্জামান। তাঁর মায়ের গৌরবময় ভূমিকা নিয়ে মালেকা বেগম লিখছেন। আসাদের মা সন্তানের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েননি। তিনি ঐ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতে বলেছেন আসাদের শহীদত্ব দেশবাসীর মনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে। আসাদের মা তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে পাঠানো বার্তায় বলেছেন—

> আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদ বলত, "মা, আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে"। আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো।[২৫]

এই সময়কার ঘটনা প্রবাহে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে ছাত্রী সহ মহিলাদের গৌরবময় ভূমিকার কথা লিখছেন লেখক। প্রতিদিন একের পর এক প্রতিবাদী কর্মসূচী নারীরা গ্রহণ করেন। তার একটি বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

১৯৬৯	
২২ জানুয়ারি	আসাদের শোক মিছিলে ৫০০ ছাত্রীর অংশগ্রহণ
২৪ জানুয়ারি	ছাত্র মিছিল থেকে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে কালো পতাকা হাতে দীপা দত্ত ও তরু আহমদ এগিয়ে আসেন। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নিজ বাসভবনে সভা। সন্ধ্যা ছ'টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মশাল মিছিল। নারী সমাজের প্রতিনিধিদের এতে যোগদান।
২৫ জানুয়ারি	জনতার আন্দোলনে পুলিশি গুলিতে নিহত হন নাখাল পাড়ার আনোয়ারা খাতুন ও তাঁর দুগ্ধ পোষ্য শিশু।
২৮ জানুয়ারি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষকের স্ত্রী, ছাত্র-জনতার উপর সরকারের সশস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দেন। ছাত্র ছাত্রীদের ডাকে কালাদিবসে বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। খালেদা খানমের সভাপতিত্বে সভা। বক্তব্য রাখেন- তাসমিন আরা, রাশেদা খানম, হান্নানা বেগম, মমতাজ বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম, শিরিন কামাল প্রমুখ।

গণ আন্দোলনের তীব্রতায় সরকারী দমন পীড়ন মাত্রা ছাড়া পৌঁছায়। এর বিরুদ্ধে বাংলার সচেতন নারী সমাজ তীব্র গণ আন্দোলনে সামিল হন। তার বিবরণ পাই "বাংলার নারী আন্দোলন" গ্রন্থে। আন্দোলনের উত্তাপে সরকার ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে কারফিউ ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে ঐদিন সকালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলারা শহীদ

মিনার ময়দানে সমাবেশ করেন। আড়াই হাজার মহিলা মিছিল করে সমাবেশে যোগ দেন। লেখক লিখছেন—

> হাজার হাজার বোরকা পরা পর্দানশীন মহিলারা এতে যোগ দেন। শিশু কিশোরী সবাই এ বিরাট মিছিলে ছিল।[২৬]

১০ ফেব্রুয়ারি স্বয়ং লেখক মালেকা বেগমের আহ্বানে গঠিত হয় 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। সুফিয়া কামাল সভানেত্রী, মালেকা বেগম সম্পাদক নির্বাচিত হন। সমাজ কর্মী রাজনৈতিক কর্মী শিল্পী সহ সংগঠনে সদস্য সংখ্যা চোখে পড়ার মত। জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বদরুন্নেসা আহমদ, জোহরা তাজউদ্দীন, আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, সারা আলী, হামিদা হোসেন প্রমূখ।[২৭]

ঐ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাষা শহীদ দিবস নতুন আবেগ উদ্দীপনায় পালিত হয়। ব্যাপক সংখ্যায় মহিলারা সেদিন প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৮]

২২ ফেব্রুয়ারি আর এক ঐতিহাসিক দিনের সূচনা হল। আন্দোলনের চাপে আগরতলা মামলা থেকে মুজিবর রহমান সহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। মুক্তি পেলেন অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী।[২৯]

১৯৬৯ সালের ২৩ মার্চ ছাত্র ছাত্রীদের পরিচালনায় এক মশাল মিছিল হয়। ৩০ হাজার ছাত্র ছাত্রীর এই মিছিলে সুফিয়া কামাল, জোহরা তাজউদ্দীন, হাজেরা মাহমুদ, কামরুন হাসান লাইলী, ফরিদা হাসান, আজিজ ইদরিস, রেবেকা মহিউদ্দীন, দীপা দত্ত যোগ দিয়েছিলেন। মালেকা বেগমও ছিলেন এই মিছিলে।[৩০]

ঐ বছর ২৫ মার্চ গণ আন্দোলনের তীব্রতা ঠেকাতে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি করলেন নব নির্বাচিত প্রসিডেন্ট ও সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খান। বাতিল হল- শাসনতন্ত্র, বিলুপ্ত হল আইন পরিষদ। এর ফল হিতে বিপরীত হল পাক সরকারের কাছে। প্রতিবাদের ঢেউ উঠল বহুগুণ। মালেকা বেগম লিখছেন—

> সারা দেশে সামরিক শাসন জারি থাকা সত্ত্বেও সে আন্দোলনের দুর্বার স্রোত অব্যাহত রইল। সভা, মিছিল, হরতাল, লাঠিপেটা, গুলি ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।[৩১]

এই বিশাল আন্দোলনের কাছে সরকার কিছুটা নতি স্বীকার করে। একবছর পর সামরিক শাসনের কিছু বিধি নিষেধ শিথিল করে নির্বাচনের অনুমতি দেওয়া হয়। ঘোষণা হয় ১৯৭০ এর অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের। কিন্তু বন্যার জন্য নির্বাচন পিছিয়ে যায়।

১৯৭০ সালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। ইতিমধ্যে আগে গঠিত 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' ভেঙে যায়। মহিলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মহিলাদের দাবি নির্ধারণ করে। মালেকা বেগম এ প্রসঙ্গে লিখছেন-

> 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'-এর তরফ থেকে ওই সময় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও নারীদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন, রাজবন্দীদের মুক্তি, নারী শ্রমিকদের মজুরিগত বৈষম্য দূর করা, জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিও তোলা হয়েছিল।[৩২]

মহিলাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি থাকলেও আমরা দেখলাম সেখানে অন্যান্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিও ছিল।

১৯৭০ সালের ১১ নভেম্বর ঘটল প্রলয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আর বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস। এতে মারা যান তিন লক্ষ মানুষ। তিন লক্ষ মানুষ ধ্বংসস্তুপে মৃতদেহের মধ্যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুলতানা জামালের উদ্যোগে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, সাধারণ নারী পুরুষ এগিয়ে আসেন।[৩৩]

এই ঘূর্ণিঝড়ের অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ এর ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্বভাবে বিজয়ী হয়— জাতীয় পরিষদে ৩১৩ টি আসনে ১৬৭টি, প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের ২৯৮টিতে জয়লাভ করে।[৩৪] এই জয় পূর্ববঙ্গবাসীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর করেছিল। কিন্তু বাঙালিরা আইনসভা গঠন করতে পারেনি তা আমরা জানি। বাঙালির স্বপ্নের এমন লাঞ্ছনা তাকে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণিত করেছিল।

আইন পরিষদে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা নিয়ে প্রচলিত আইন সংশোধন করে মেয়েদের দূরে রাখার আইন আনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মালেকা বেগম লিখছেন-

> ১৯৭০ সালের 'সংরক্ষিত মহিলা আসন' পদ্ধতির নিয়ম বিধি ১৯৬৫ সালের নিয়মের মতো ছিল না। এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের 'প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্যা'র পদ সংরক্ষণের আইন ১৯৭০ সালে সংশোধন করে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নে সাতজন নারী সদস্যের আসন সংরক্ষিত রাখার আইন।[৩৫]

এই আইন অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে ১৯৭১ এর ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সাতজন সদস্য সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনীত হন।[৩৬]

এই সমগ্র সময়ে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে লেখক এক অনন্য সাধারণ মূল্যায়ণ করেছেন। তিনি মনে করেন— নারী পুরুষ বিচারে সামগ্রিক অর্থে প্রত্যক্ষভাবে নারীর অংশগ্রহণ পিছিয়ে ছিল। এর কারণ নারীর দীর্ঘদিনের অবোরোধের বেড়াজাল। তাকে সঙ্গ দিয়েছে স্বৈরাচারী শাসকের নানা আইন কানুন এবং সমাজ মননের দীর্ঘদিনের সংস্কার। সচেতন নারীরা যখন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে তাকে ঠেকাতে পরিবারে চাপ সৃষ্টি করার জন্য আইন প্রণয়ন হয়েছে। পরিবারে কেউ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে স্বামী, বাবার সরকারী চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। এ প্রসঙ্গে লেখক মতিয়া চৌধুরী ও সুফিয়া কামালের উদাহরণ দিয়েছেন। ছাত্রনেত্রী অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা বাবার উপর সরকারী চাপ সৃষ্টি হলে বাবার অভিভাবকত্ব ছেড়ে বিয়ে করেন সহযোদ্ধা বজলুর রহমানকে। সুফিয়া কামালের স্বামী কামালুদ্দীন আহমেদের সরকারী রোষে দীর্ঘদিন পদোন্নোতি হয়নি। এবং নানা রকম সরকারী দমন নীতিরও শিকার হন। কিন্তু তাতে তাঁরা দমে যাননি।[৩৭] কিন্তু সবার এই মনোবল না থাকাই স্বাভাবিক। ফলে অনেক নারীই পরিবারের স্বার্থে অন্তঃপুরে ঢুকে গেছেন এই সময়। মালেকা বেগম নারীদের প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গীও বিশ্লেষণ করেছেন—

> ঐ নির্বাচনে(১৯৭০) নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি কোনো রাজনৈতিক দল। কিন্তু নারী ভোটারদের মধ্যে কাজ করার জন্য দলে নারী সদস্যদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল[৩৮]

নারী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা সমাজ মানসে তখনও তৈরী হয়নি বোধ হয়। তাই কোনও দলেরই রাজনৈতিক ইস্তাহারে নারীর মর্যাদা, রাজনৈতিক—সামাজিক সমমর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়নি। আর যে মহিলারা অন্দরমহলে থেকেছেন, প্রকাশ্য রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি তাঁরাও এ সময় নির্লিপ্ত ছিলেন না। আত্মীয় পরিজনের থেকে দেশের পরিস্থিতির তাপে তাপিত হয়েছেন, করেছেন তাঁদের সমর্থন। এই ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি প্রসারিত না হলেও নারীর এ ভূমিকাকে খাটো করা যায় না। মালেকা বেগম লিখছেন—

> তাঁরা তাঁদের তৎপরতা গৃহের গণ্ডির ভেতরেই সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন কেবল স্বামী, পিতা, ভাই বা নিজের সন্তানকে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুকূলে সমর্থন জানানোর ভেতর দিয়ে। প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান সংগ্রামী পুরুষদের ইতিহাসে নারীর পরোক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকার দিকটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবেত্তাদের এড়িয়ে গেছে।[৩৯]

তাঁদের এই আন্তরিক তৎপরতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন পরবর্তী অধ্যায়— মুক্তিযুদ্ধে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার কাজে আত্ম নিবেদিত হয়েছে।

নবুয়াত ইসলাম পিনকি

নবুয়াত ইসলাম পিনকি দুটি স্মৃতিকথা- 'অরুণোদয়ের দিনগুলি: উইমেন্স হল থেকে রোকেয়া হল'(২০২০, জানু ৩০)[৪০] ও '৬৪-এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত'[৪১] (১৭ মে, ২০১৯, আর্টস bdnews.com)।

'অরুণোদয়ের দিনগুলি: উইমেন্স হল থেকে রোকেয়া হল' প্রবন্ধে লেখক ৬২ সালে তাঁর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তী হওয়ার কথা লিখেছেন। লিখেছেন আবু হেনা মোস্তাফা কামাল স্যারের বৈষ্ণব পদাবলী মুগ্ধ হয়ে শোনা; লাইব্রেরীতে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ময় হয়ে পড়া। লিখছেন বুদ্ধদেব বসুর

সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়ে মন ভালো করা সেই আকর্ষণের কথা। এই বর্ণনার মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার নাড়টি বোঝা যায়। যখন সরকারের পক্ষ থকে হিন্দুয়ানী বর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন সহ অনেক কিছুই নিষিদ্ধ। তখন বৈষ্ণব পদাবলী পড়াচ্ছেন আবু হেনা স্যার, তন্ময় হয়ে শুনছে শিক্ষার্থীরা। এখানে সাম্প্রদায়িকতা কোথায় ঠাঁই পায়!

এরই সাথে এসেছে আবাসিক হোস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা। এই হোস্টেলের নাম ছিল উইমেন্স হল। যার নাম ১৯৬৩ সালে পরিবর্তিত হয়ে হয়— রোকেয়া হল। যদিও নাম পরিবর্তন হলেও রোকেয়া নির্মিত তারিণী ভবনের(পদ্মরাগ) উদার গণতন্ত্রের চর্চা এখানে ছিল না। হোস্টেলের নিয়ম ছিল কঠিন নিগড়ে বাঁধা। লেখক লিখছেন—

> ঠিক ছয়টায় গেট বন্ধ হয়ে যেত। কি কঠিন করুণ নিয়ম ছিল! কোনও কারনে দু'এক মিনিট দেরি হতে পারে। এ ব্যাপারে কোনও শিথিলতা নাই বা কতৃপক্ষ কোনও জবাবদিহিতার প্রয়োজন মনে করতেন না। গেটের ভিতর অনতিদূরে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর একটা মোটা বাঁকানো লম্বা চওড়া খাতা আর পেন্সিল রাখা থাকতো। আবাসিক ছাত্রীদের স্বাক্ষরসহ কয়টায় বের হওয়া এবং ফেরা উল্লেখ করতে হতো। ছয়টা বাজার সাথে সাথে দারোয়ান ছোঁ মেরে খতাটা নিয়ে প্রভোস্টের হাতে দিতো। প্রভোস্ট আপা বারান্দায় বসে থাকতেন। সন্ধ্যার মধ্যে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের, যদি কোনও ছাত্রী ছটার মধ্যে ঢুকতে না পারে তার এখন কি অবস্থা হবে ? সে এই সন্ধ্যায় লোকাল গার্জেনের বাসায় ফিরে যাবে, তার কি হবে কে জানে? আমার ভাবতে আজও কষ্ট হয় কি নির্মম একটা নিয়ম। সেই লর্ড কর্ণওয়ালিশের "সূর্যাস্ত আইন" যেন! আমি হলফ করে বলতে পারি সেই সময় আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রীরা বা মেয়েরা অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শালীন ছিলো। উচ্ছৃঙ্খল ছিলো না কেউ। তবুও তখন সেই অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত ছিলো।[৪২]

আমরা দেখলাম লেখক হোস্টেলকে জেলখানা আর হোস্টেলের নিয়মকে ব্রিটিশ প্রবর্তিত সূর্যাস্ত আইন এর সাথে তুলনা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জনপ্রিয় মানুষ মধুদা- মধুসূদন দে। তাঁর ক্যান্টিন কিংবদন্তীতে পরিণত। তাঁর এই প্রবন্ধে মধুদার ক্যান্টিনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছেন। মধুদার ক্যান্টিনে ধারে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাই সবার নামে ছিল খাতা। নবুয়াত ইসলাম পিনকির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিয়ের পর লেখক স্বামীকে সাথে নিয়ে মধুদার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ধার শোধের প্রস্তাব তুলেছিলেন। কিন্তু মধুদা বলেছিলেন- 'ধার শোধ করা লাগবে না দিদি। একজোড়া পায়জামা পাঞ্জাবী দিবেন'। আর একজন ছিলেন বাসুদা। যিনি কাপড় ইস্ত্রি করতেন। তাঁর হাতের 'কাটা করা', 'আব দেওয়া' ইস্ত্রি করা শাড়ি যা অল্প দামের শাড়িকেও অন্য মাত্রায় নিয়ে যেত। সেই শাড়ির ভাঁজ ভেঙে পরার তৃপ্তিই আলাদা। কিন্তু ১৯৭১ এর পঁচিশের রাতে বাসুদা হারিয়ে গেলেন। হারিয়ে গেলেন মধুদাও। ঐ সময় তিনটে শাড়ি বাসুদাকে 'কাটা করতে' দিয়েছিলেন লেখক। কিন্তু সে শাড়ি নেওয়া হয়নি। "পঁচিশের রাতে বাসুদার নিপুন হাতে কাটা/ তোমার জামদানী? রূপান্তরিত হয়েছিলো/ স্বাধীন বাংলার পতাকায়"। আর মধুদার পাঞ্জাবীও পরা হয়নি। বোধহয় সারা মুক্তিযুদ্ধে এই 'পাঞ্জাবী' নামটি ধিকৃত হয়ে উঠবে বলে মধুদা তা আর পরতে চাননি।[৪৩]

নবুয়াত ইসলাম পিনকি '৬৪-এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের একটি ভয়ার্ত রাত' প্রবন্ধে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক অবস্থায় হিন্দু ছাত্রীরা কিভাবে দাঙ্গা কবলিত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন। তবে তার সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে এসেছে দেশভাগের সময় মুসলমান বলে নিজেরা কিভাবে দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তার ঘটনা।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে লেখকের বাবা পূর্ববঙ্গে নিজের পৈতৃক বাড়ীতে ফিরবার কথা ভাবেননি। পার্কসার্কাসে তাঁর সেজ ভাইয়ের বাড়িতে সপরিবারে থাকেন। লেখক নবুয়াত ইসলাম ও তাঁর ছোট বোন— শিশু বিদ্যাপীঠ, বুবু, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে, দাদুমনি— মিত্র ইন্সটিউশনে, দিদি কলেজে পড়তেন। বড় দাদা রয়াল এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়ে লন্ডনে প্রশিক্ষণ নিতে গেছেন। কিন্তু ১৯৫০ র পরিস্থিতি তাঁদের তাড়িত করে চলল। চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে ছ' বছরের শিশু প্রত্যক্ষ করলেন বীভৎস এক ভয়ের দৃশ্য। তার বর্ণনা দিচ্ছেন নবুয়াত ইসলাম—

> কয়েকদিন ধরে দেখছি বাড়ির আবহাওয়া কেমন থম থমে, ভয় ভয় ভাব সকলের, এমনকি পাড়ার অবস্থাও তাই। মা কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। আমাদের সবার স্কুল, কলেজ যাওয়া এমনকি সামনের মাঠে খেলতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। রাতের আঁধারে নানা রকম ভয়ার্ত ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে যেত। ছোট্ট বুকটা ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। এর মধ্যে একদিন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ দেখি একটি লোক দৌড়াচ্ছে, পিছন থেকে দুটি লোক তাড়া করে দৌড়ে জাপটে ধরে, চাকু মেরে ম্যানহোলে ধুকিয়ে দিলো। জীবনে প্রথমবার আর একবারই মানুষ হত্যা দেখি।[৪৪]

এরপরেই রাতের অন্ধকারে গোছগাছ করে লেখকের পরিবার আশ্রয় নেন এংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায়। সেখান থেকে এয়ারপোর্ট। ঢাকায় ফিরবার প্রত্যাশা। দেশভাগের এতদিন পরে আবার নতুন করে উদ্বাস্তু হওয়া। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত উদ্বাস্তু মানুষদের সেদিনের অবস্থার কথা বিবরণ দিয়েছেন লেখক—

> সারা এয়ারপোর্ট জুড়ে অপেক্ষমান মানুষের ভীড়। দুদিন দমদম এয়ারপোর্ট অপেক্ষা করার পর আমাদের মালবাহী প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া হয়।[৪৫]

কিন্তু এই ভেসে থাকা অবস্থায় বাবা-দাদাকে কাছে পেলেন না। কারণ— দাদুমনির ম্যাট্রিক পরীক্ষা, বাবা থেকে গেলেন কলকাতায়। বাকি পরিবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভেসে চলল ঢাকার পথে পথে—

> শুরু হল আমাদের ভাসমান জীবন। আমাদের সঙ্গে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার ছিল, সেই সব সত্যিকারের উদ্বাস্তুদের সাথে আমরাও এক উদ্বাস্তু হয়ে ফিরলাম নিজ জন্মভূমিতে।[৪৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, লেখক এই বর্ণনায় উল্লেখ করেননি যে তাঁরা ধর্মোন্মাদ হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন কিম্বা সেদিনের সেই হত্যা সেই তারাই করেছিল। কিন্তু বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে কাতারে কাতারে মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে কেন পূর্ববঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন সেদিন। তাঁর মনে কিন্তু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরধর্ম বিদ্বেষ ঠাঁই পায়নি। তাই ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় হোস্টেলের হিন্দু ছাত্রীরা আক্রান্ত হতে পারে এই সম্ভাবনায় মুসলমান ছাত্রী হিসাবে তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেন।

লেখক তখন ছিলেন ‘এপসু’ অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল ছাত্রীদের সমাজ কল্যান সম্পাদক। রোকেয়া হলের হিন্দু ছাত্রীদের সুরক্ষার জন্য ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মতিয়া চৌধুরী, কমনরুম সম্পাদক জিনাত ইসলাম (জিনা) ফাহমিদা খাতুন(বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী), রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইউ এস জেড সুলতানা, সহ সাধারণ সম্পাদক রোকেয়া সুলতানা চৌধুরী মীরা, সাহিত্য সম্পাদক হাস্না হানা বকুল সহ অন্যান্য ছাত্রীরা করণীয় কর্তব্য ঠিক করেন।

হোস্টেলের প্রভোস্ট মিসেস আখতারী ইমামের সাথে দেখা করেন তাঁরা। যেসব হিন্দু ছাত্রী হোস্টেল ছেড়ে যেতে পারেননি তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হল। অন্যদিকে জগন্নাথ হলের হিন্দু ছাত্রদের রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে সর্বদলীয় ছাত্র কমিটি। তারা সারা রাত প্রহরায় রইলেন আবাসিকদের রক্ষার জন্য।

সেদিনের সেই রাতে সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে মোটা চাদর জানালায় দিয়ে মেঝেতে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সবার। হিন্দু ছাত্রীদের মুসলমান ছাত্রীরা কলেমা পড়তে শিখিয়েছিলেন। শেখানো হতে লাগল আলহামিদুল্লাহ সুরা। যদি ধর্মোন্মাদগুলোকে ধর্মের দোহাই দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করা যায়।

রাত যখন গভীর হল। সবার চোখে যখন ঘুম নেমে এসেছে প্রায়। দূর থেকে শোনা গেল- ‘নারায়েতাকবীর আল্লাহুয়াকবার....’। এ ধ্বনি শুনে মুসলিম ছাত্রীরা তাদের সহপাঠীদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁরা থাকতে তাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না। কিন্তু তারা যখন সেই ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল যখন হোস্টেলের গেটে এসে ধাক্কা দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলেছিল- ‘দরওয়াজা খুল দো’। তখন সেই আশ্বাসবানী যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সে যাত্রায় রক্ষা করেছিলেন গেটের দারোয়ান নমিদা।

> তিনি উর্দুতে বারবার বুঝিয়েছিলেন – ‘হলে কোনও ছাত্রীই নাই। আমি দরোজা খুলবো না’। বিহারী নমিদার উর্দু শুনে তারা বিশ্বাস করল। ফিরে গেল দাঙ্গাকারীরা। সেদিন নমিদা ছিল বলে বেঁচে গেল হিন্দু ছাত্রীরা।[৪৭]

হিন্দু ছাত্রীদের জন্য সে জায়গা সুরক্ষিত নয় ভেবে ইডেন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা রোকেয়া কবীর(১৯২৫-২০০০) নিজে ড্রাইভ করে এসে ছাত্রীদের অফিস বিল্ডিং এ নিয়ে যান। রোকেয়া কবীর যিনি সেই সময়ের প্রগতিশীল আন্দোলনের মুখপাত্র ও বামপন্থী রাজনীতিবিদ।[৪৮]

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সবারমত নবুয়াতও বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানেও অপেক্ষা করে আছে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কুল নারী শিক্ষা মন্দিরে ঢুকে দুজন শিক্ষক— 'রাধানাথ স্যার' ও 'যগজ্জীবন স্যার' ও 'কেরানী বাবু'কে হত্যা করেছে দাঙ্গাকারীরা।

এই স্কুলটির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গও এসেছে এই প্রবন্ধে। স্বৈরাচারী শাসক মোনেম খাঁ এর আমলে স্কুলটির নাম পরিবর্তনের জন্য চাপ আসে। স্কুল কতৃপক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠাতা মহীয়সী নারী লীলা নাগের নামের রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নারীর নামে কোনও বিদ্যালয় রাখা সরকারের পছন্দ ছিল না। নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়- 'শেরে বাংলা মহাবিদ্যালয়'। লেখকের এখানে আক্ষেপ—

> প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ কোনো কৃতিমান মহিলার নামে নয়। বরং একজন পুরুষের নামে রাখা হলো যার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো অবদান নাই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি আমাদের বর্তমান যুগেও সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্যের কি করুণ অবস্থা।[৪৯]

রাধানাথ স্যার, যগজ্জীবন স্যার, কেরাণী বাবুদের হত্যায় পুরনো ঢাকার ঠাটারি বাজারের কসাইদের দাঙ্গার ইতিহাস তো থেমে থাকে না। তাদের উন্মাদ ধর্ম বিদ্বেষের বীজ অনেক গভীরে বাঁধা। তারও প্রসঙ্গ লেখক বর্ণনা করেছেন। যে নমিদা মনিরুলদা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের রক্ষা করেছিলেন তাঁরা তাঁদের শেষ দিন পর্যন্তই দরজা আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু না। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে তাঁরা আর দরজা আগলে রাখতে পারেননি। প্রথমে তাঁরা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন তারপর দরজা অরক্ষিত হয়েছে। সে রাতেই ক্যাম্পাসের ভিতরে তাঁদের পরিবার পরিজনকেও হত্যা করা হয়েছে।

নবুয়াত ইসলাম পিনকির এই দুটি প্রবন্ধের সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অভিজ্ঞতার কথাই শুধু জানা গেল না। জানা গেল দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষের চরম সংকটের কথা। জানা গেল সেই সময়ের মেয়েদের আবাসিক জীবনের চিত্র। জানা গেল দেশ নির্বিশেষে সংখালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জীবম্মৃত হয়ে বাঁচার কাহিনী। প্রাপ্তি হল তখন ঢাকাকে কেন্দ্র করে ছাত্র রাজনীতির গতিপ্রকৃতি। বাম রাজনীতির প্রভাব ছাত্র রাজনীতিকে চালিত করেছে। শাসকের নৃশংস বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে ছাত্র ছাত্রীরা একত্রিত হয়েছে। দেখছি ইডেন কলেজের সহ অধ্যাপক রোকেয়া কবীরের অসম সাহসী পদক্ষেপ। যা আজও মুক্ত চিন্তা বিকাশে অনুপ্রেরণার। দেখলাম মধুদা, বাসুদা, নমিদা, যগজ্জীবন স্যার.. .. কেরাণী বাবু, মনিরুল দার অশেষ দেশপ্রেমের কথা।

কোহিনূর হোসেন

কোহিনূর হোসেন, ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চে শহীদ বীর স্বামী মোয়াজ্জেম হোসেন-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার(১৯৬৯) কথা উল্লেখ করেছেন।[৫০] কারণ এই মামলায় প্রকৌশলী তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। প্রথম আসামী। এই স্মৃতিচারণায় তিনি লিখছেন, তাঁর স্বামী নৌ বাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থানের বিরাট পরিকল্পনা রচনা করেন। সেটা সরকার বুঝতে পেরে মোয়াজ্জেম হোসেন সহ অন্যান্যদের গ্রেফতার করে। প্রথমে কেস সাজানো হয়- রাষ্ট্র বনাম মোয়াজ্জেম হোসেনের নামে। কিন্তু পরদিন তা প্রত্যাহার করে জেলবন্দী মুজিবর রহমান আর রাষ্ট্রের মধ্যে কেস সাজানো হয়। কোহিনূর হোসেন এর কারন হিসাবে বলছেন-

> আগরতলা মামলার প্রথম আসামী ছিলেন। কিন্তু ৩৫ বছরের একটি ছেলে আর্মির মধ্যে থেকে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করছে তাতে বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের মুখ পুড়বে তাই মুজিবর রহমানকে বেল দিয়ে আবার এরেস্ট করা হয় আগরতলা মামলার প্রধান আসামী করে।[৫১]

আগরতলা মামলায় মোয়াজ্জেম হোসেন সহ অন্যান্যদের অপরাধ প্রমান করতে পারেনি সরকার। ইতিমধ্যে বাইরে সরকার বিরোধী প্রবল গণ আন্দোলন চলছে। এরফলে আসামীদের মুক্তি দেওয়া হয়। কোহিনূর হোসেন লিখছেন— অপরাধ প্রমাণ করা না গেলেও পাক সরকার সবই জানতেন তাঁর সরকার বিরোধী কার্যকলাপের কথা। তাই মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ১৯৭১এর ২৬ মার্চ তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি করে হত্যা করা হয় লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে।

কোহিনূর হোসেনের এই লেখা থেকে মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাময় রূপরেখাটি বোঝা যায়। ১৯— সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনমানসে কি বিপুল ক্ষোভ ছিল। একদিকে ছাত্র যুব কৃষক মহিলা শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশ্য জঙ্গী আন্দোলন। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা। সব মিলিয়ে অগ্নিগর্ভ পূর্ব বাংলা। এই রকম সব ধরণের উত্তাপ মিলতে মিলতে বাঙালিকে পৌঁছে দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নে।

সনজিদা খাতুন

সনজিদা খাতুন(১৯৩৩) পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষায় নিবেদিত এক প্রাণ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য সোচ্চারে ফেটে পড়েছিল তা আজও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তিনি মূলত সংস্কৃতি জগতের মানুষ। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় উন্মাদনা প্রভাবিত সংস্কৃতিকে যেভাবে চাপানো হয়েছে তার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে নিরলস কাজ করে গেছেন। শাসকের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পালটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিয়োজিত হয়েছেন। পাকিস্তান জন্ম নেওয়ার পর ‘পাকিস্তানের গুলিস্তানে আমরা বুলবুলি’ গান গেয়ে পাকিস্তানের জয়গান করে শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন তাঁদেরও মানস জগৎ কিভাবে পাকিস্তান বিমুখ হয়ে গেল, কিভাবে সাংস্কৃতিক আক্রমনের ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষের মুসলমান পরিচয়ের থেকে বাঙালি পরিচয় বড় হয়ে উঠল তার দিক নির্দেশ পাওয়া যায় তাঁর “আমাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির আন্দোলন’, ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই’ ‘দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি’ প্রবন্ধগুলিতে।

পাকিস্তান শাসকের তীব্র মুসলমান আগ্রাসনের ফলে বাংলাভাষা ও বাংলার সংস্কৃতি চর্চা হয়ে পড়েছিল দেশদ্রোহীতার সামিল[৫২] এর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর মনে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এক অদম্য আশা জন্মেছিল। বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আগে এগিয়ে এসেছিলেন সংস্কৃতি রক্ষায়। একদিকে গ্রাম বাংলার প্রচলিত সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার আচরণ রক্ষা। অন্যদিকে প্রাচীন সাহিত্য সঙ্গীত ও আধুনিক সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পকলাকে সংস্কৃতি চর্চার ও রক্ষার মাধ্যম হিসাবে উপস্থাপিত করা।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা স্বীকৃতি পেল। কিন্তু 'বাংলা' নামে শাসকের বড় ভয়। তাই প্রদেশের নাম 'পূর্ব বাংলা' পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হল। তাই কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান, রেডিও, দূরদর্শন কোথাও 'পূর্ব বাংলা' উচ্চারণের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।[৫৩] ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে গেল।[৫৪]

১৯৫৯ সালে সরকারী প্রচেষ্টায় লেখক কেনা ও লেখা রেজিমেন্টেশনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।[৫৫] কিন্তু এর বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে এক দুঃসাহসিক কাজ শুরু করলেন বাংলার মানুষ। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপন। সারা বিশ্ব বিশ্বকবির জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করবে আর পূর্ববঙ্গে তা বাদ থাকবে! তা হয় না।

শুরু হল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি। কিন্তু সরকারি ফতোয়ায় রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের কবি হলেও পাকিস্তানের কবি নন যে(!) তাই—

> তখন এদেশের শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সভানেত্রী সুফিয়া কামালকে ডেকে ধমক দিচ্ছেন চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ। কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।[৫৬]

সুফিয়া কামালকে দমন করা যায়নি। বিপুল সমারোহে উদযাপিত হয়েছিল রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের উৎসব। ফলে তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অবলম্বন রূপে পূর্ববাংলার মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সাফল্যের এই বিপুল মনোবল এবং একতাবদ্ধ শক্তি এক বৃহৎ সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। কবি সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে গঠিত হয় – 'ছায়ানট'। সনজিদা খাতুন ছায়ানটের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লিখছেন—

> 'ছায়ানট' বুঝতে পেরেছিল, ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টাকে প্রতিহত করতে হলে ঐতিহ্য স্মরণের আয়োজন জরুরী। সেইজন্যই একষট্টি সালে সংগঠিত ছায়ানট প্রথমে পুরোনো গানের আসর করেছিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউটে।[৫৭]

দেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য বসন্তোৎসব, শারদোৎসব, বর্ষার গানের আসর, নববর্ষ উদযাপন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে গানের বিন্যাস। দেশবাসীকে সে গানে সংযুক্ত করা। 'পূর্ব বাংলা' নাম মুছে দেওয়ার প্রতিবাদে – 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কিম্বা 'সার্থক আমার জন্মেছি এই দেশে' গাওয়া হতে লাগল।[৫৮] বৈরী পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য গান হয়ে উঠল উজ্জীবনী মন্ত্র।

তবে শুধু গানের জন্য নয় কিম্বা 'ছায়ানট' কেবল মাত্র নিখাদ শিল্প চর্চার প্রতিষ্ঠান হয়ে রইল না। বন্যা, ঝড় দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শিল্পীরা রাস্তায় নেমে ত্রাণ সংগ্রহ করেছেন। ত্রাণ বণ্টন করেছেন।

সঙ্গীত যাতে নিছক শিল্পীর বিষয় না হয়ে থাকে সাধারণ দর্শক শ্রোতারাও যাতে সবদিক থেকেই সঙ্গীতের সাথে যুক্ত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হত। শ্রোতাদের মধ্যে সঙ্গীতের কথা সুর পৌঁছে দেওয়া হত। বলা হত সবাই একসাথে গাওয়ার জন্য। সনজিদা খাতুন লিখছেন—

> এক একদিন সমস্বরে এক একটি গান গেয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধে প্রাণিত হয়েছি আমরা সম্মিলিতভাবে।[৫৯]

এই আন্দোলনের তাপে উদ্বুদ্ধ হয়েই 'ছায়ানটে' শুরু হয়েছিল গণসঙ্গীত চর্চা।[৬০]

পাকিস্তান সরকার বরাবরই চেয়েছে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করতে। কিন্তু এর প্রতিবাদে রবীন্দ্র অনুশীলনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী গানের নিত্য

নতুন খোঁজ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান প্রতিবাদী উৎসবে পরিণত হয়। সনজিদা খাতুন ১৯৬৭ সালে বাইশে শ্রাবণ উদযাপনের সেই প্রতিবাদী সপ্তাহের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬১]

১৯৬৭ সালে ১ লা বৈশাখ উদযাপন আর এক নতুন ইতিহাস সূচনা করে। রমনার বটমূল থেকে ভাবী স্বাধীন বাঙালি জাতির জাতীয় উৎসবের সূচনা হল। পয়লা বৈশাখের সেই আনন্দানুষ্ঠান একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের সময় ছাড়া কোনও অজুহাতেই ছেদ পড়েনি।[৬২]

এই বছরই আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা শুরু হয়। পাকিস্তানের মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের ঘোষণার পর পরই চল্লিশ জন বিশিষ্ট(!)জন রবীন্দ্রনাথের অনপযোগিতা নিয়ে স্বাক্ষর করে সরকারকে সমর্থন করেন। এর মধ্যে একজন শান্তিনিকতনে পড়া বাংলার অধ্যাপকও ছিলেন।[৬৩] সরকারী এই বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান প্রতিবাদী উৎসবে পরিণত হয়। তিনদিন ধরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের হলে চলল বাইশে শ্রাবণ পালনের অনুষ্ঠান। সনজিদা খাতুন "দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি" প্রবন্ধে লিখছেন—

> এই তিনটি দিন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বিরুদ্ধে সাঙ্গীতিক 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' চালানো হয়েছিল। ভিড় সামলানো দায়, প্রেক্ষাগৃহের দ্বার খুলে দেওয়া হতো যাতে দাঁড়িয়েও সবাই অনুষ্ঠান দেখতে-শুনতে পায়। একেই বলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন।[৬৪]

এই রকম 'সাঙ্গীতিক ডাইরেক্ট অ্যাকশনে' কর্মকর্তা কলা কুশলীদের মনোবল কেমন অদম্য ছিল আর সরকার তাতে কেমন চটেছিল তার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি' প্রবন্ধে। সফলভাবে বাইশে শ্রাবণ উদযাপনের শেষ দিন। শেষ দিনের ঘটনা। "চিত্রাঙ্গদা"র অভিনয় হবে। প্রতিদিনের মত হল উপচে ভীড়। নাটক শুরুর পনের মিনিট আগে তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খাঁ এর পুত্র তার দলবল নিয়ে হলে ঢোকার জন্য চিৎকার চেঁচামিচি করছে। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারখানা বুঝলেন। তিনি ঘোষণা করলেন হল ভরে যাওয়ার দরুণ আবার করে "চিত্রাঙ্গদা"র অভিনয় হবে। এতে আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যায় তারা। কিন্তু এই ঘোষণায়

বিপদে পড়লেন চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে যিনি অভিনয় নাচ করছেন লায়লা হাসান। কারণ তাঁর এক মাসের শিশু রেখে অপরিসীম কষ্টে এই অভিনয় করছেন। কিন্তু অভিনয় তাঁকে শেষ পর্যন্ত আবার করে করতে হয়নি। মোনেম খাঁ এর ছেলে ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা ফিরে গেলে মুহুর্তেই হল খালি করে দেওয়া হয়। পরে তারা ফিরে এসেছিল হকি স্টিক নিয়ে। কিন্তু হল খালি দেখে ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু কিছু চেয়ার, ফুলের টব ভাঙা আর অশ্রাব্য গালি গালাজ করা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না।[৬৫]

পাশাপাশি নজরুল একাডেমী তৈরি করে রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে নজরুলকে দাঁড় করানোর সরকারী অপচেষ্টা শুরু হয়। 'ছায়ানটের সঙ্গীত শিক্ষকদের বেশি বেতন দিয়ে নজরুল একাডেমীতে সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হল। কিন্তু সমস্ত সরকারি অপচেষ্টা রুখে রবীন্দ্রনাথ নজরুল স্বমহিমায় রইলেন বাঙালীর অন্তরে।[৬৬]

১৯৬৯ সালে সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়। গঠিত হয় জাতীয় পুণর্গঠন সংস্থা। জাতীয় পূণর্গঠনের নামে আসলে বুদ্ধিজীবী ক্রয়ের চক্রান্ত করেন সংস্থার প্রধান হাসান জামান। যে বুদ্ধিজীবীদের ক্রয় করা যায়নি তাঁদেরকে একাত্তরে হত্যার প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন এই হাসান জামান।[৬৭]

সনজিদা খাতুন লিখছেন— এইসময় 'ছায়ানটে'র শিল্পীদের উপরও আঘাত নেমে এসেছিল। রেহাই পাননি সনজিদা খাতুনও। ঢাকা থেকে দূরে রংপুরে বদলী করা হল তাঁকে। করা হল নজরবন্দী। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির অছিলায় থেমে থাকল না প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন। গণ অভ্যুত্থানে দেশ উত্তাল। পটুয়া কামরুল হাসান(১৯২১-১৯৮৮) এগিয়ে এলেন ব্রতচারী গান নিয়ে। সত্যেন সেন(১৯০৭-১৯৮১) গণসচেতনতা বাড়ানোর জন্য ১৯৬৮ তে তৈরী করেছেন 'উদীচী' সাংস্কৃতিক সংগঠনের।[৬৮] দুই সংগঠনের আরও অনেক ছেলে মেয়েরা মিলে শহীদ মিনার সহ অন্যান্য জায়গায় নাচে গানে আহ্বান করছে- গুরু সদয় দত্ত(১৮৮২-১৯৪১)এর গানে- 'মানুষ হ' মানুষ হ' আবার তোরা মানুষ হ'। অনুকরণ-খোলস ভেদি' কায়মনে বাঙালী হ'। কিম্বা সিকান্দার আবু জাফর(১৯১৮-১৯৭৫)-এর গানে— 'জনতার সংগ্রাম চলবে, /আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই। জনতার সংগ্রাম চলবেই'।[৬৯]

১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গবাসী একটি ঘটনায় তার আত্ম উপলব্ধির বোধটি আরও শানিত করতে করতে গেছে। কখনও ভাষাকে কেন্দ্র করে, কখনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। এই বোধে উদ্বোধিত হয়েছে বাঙালি মুসলমান নারীরাও। হয়তো তারাও কায়-মনবাক্যে মানুষ হওয়ার সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে। হয়তো প্রচুর সংখ্যায় নারীরা এই সময়ে যুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু সমাজের অগ্রণী অংশের যে মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সংগ্রামী তেজ তাদের লড়াই আপামর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই। সেই তাপ অন্দরমহলে পৌঁছেছিল। এই চেতনাই তাকে পরবর্তীকালে দেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রাণিত করেছে। তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আর এক আলোক তীর্থের দিকে।

তথ্যসূত্র:

১. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ: ২০০৪, মূল্য- ৭০টাকা, পৃ- ৮২।

২. আহ্মদ, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন; সরকার, মোনায়েম; মঞ্জুর, ড: নুরুল ইসলাম(সম্পা), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)* , আগামী প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ- ২০০৪, মূল্য-৪০০টাকা, পৃ- ৫১।

৩. খাতুন, সন্জিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৪।

৪. কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল, নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল,* গুপ্ত, শ্যামলী, সাত্তার, আবদুস, রায়, গৌতম(সম্পা), পুনশ্চ, কল-৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং-২০০৭, দাম-২৭০টাকা।

৫. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৬।

৬. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৬।

৭. কামাল, সুফিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৭।

৮. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৭।

৯. কামাল, সুফিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৮।

১০. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রথমা, ১ম সং- ২০১১, ঢাকা-১২১৫, মূল্য-৩৫০টাকা, পৃ- ৩৩।

১১. বেগম, মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

১২. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* হাওলাদার প্রকাশনী, ৫ম সং ২০১৬, ঢাকা-১১০০, মূল্য- ২৫০/- টাকা, পৃ- ১৮।

১৩. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮।

১৪. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮,১৯।

১৫. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৮।

১৬. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৯।

১৭. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮০।

১৮. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮০।

১৯. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ-৮১।

২০. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮১।

২১. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮২।

২২. বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৮২।

২৩. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩২।

২৪. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

২৫. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

২৬. বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, ১ম প্রকাশ: ১৯৮৯, পৃ- ১৮৪।

২৭. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৭।

২৮. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫।

২৯. বেগম, মালেকা,*বাংলার নারী আন্দোলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮৪।

৩০. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩২।

৩১. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫।

৩২. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮।

৩৩. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯।

৩৪. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯।

৩৫. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯, ৪০।

৩৬. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০।

৩৭. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৬,৩৭।

৩৮. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯।

৩৯. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮।

৪০. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, 'অরুণোদয়ের দিনগুলি, উইমেন্স হল থেকে রোকেয়া হল', https://arts.bdnews24.com

৪১. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত',

৪২. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, 'অরুণোদয়ের দিনগুলি, উইমেন্স হল থেকে রোকেয়া হল', প্রাগুক্ত।

৪৩. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, 'অরুণোদয়ের দিনগুলি, উইমেন্স হল থেকে রোকেয়া হল', প্রাগুক্ত।

৪৪. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত', প্রাগুক্ত।

৪৫. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত', প্রাগুক্ত।

৪৬. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত', প্রাগুক্ত।

৪৭. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত', প্রাগুক্ত।

৪৮. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত', প্রাগুক্ত।

৪৯. ইসলাম, নবুয়াত পিনকি, '৬৪এর দাঙ্গায় রোকেয়া হলের ভয়ার্ত রাত', প্রাগুক্ত।

৫০. হোসেন, কোহিনূর, 'আমার স্বামী', হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি: ১৯৭১* , ৪র্থ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৯১, বাংলা একাডেমী ঢাকা, মূল্য- ৫০টাকা।

৫১. হোসেন, কোহিনূর, 'আমার স্বামী', হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি: ১৯৭১,* প্রাগুক্ত, পৃ- ১১।

৫২. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , হাসনত, আবুল(সম্পা), নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১০, মূল্য- ৫৮০ টাকা, পৃ- ২৪১।

৫৩. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৪।

৫৪. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৫।

৫৫. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৪-২৫৫।

৫৬. খাতুন, সনজিদা, 'আমাদের সঙ্গীত- সংস্কৃতির আন্দোলন', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১৪।

৫৭. খাতুন, সনজিদা, 'আমাদের সঙ্গীত- সংস্কৃতির আন্দোলন', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১৫।

৫৮. খাতুন, সনজিদা, 'আমাদের সঙ্গীত- সংস্কৃতির আন্দোলন', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১৫।

৫৯. খাতুন, সনজিদা, 'আমাদের সঙ্গীত- সংস্কৃতির আন্দোলন', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১৫-৩১৬।

৬০. খাতুন, সনজিদা, 'আমাদের সঙ্গীত- সংস্কৃতির আন্দোলন', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১৬।

৬১. খাতুন, সনজিদা, 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ।

৬২. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৮।

৬৩. খাতুন, সনজিদা, 'রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে বাঙালি জাতি সত্তার সন্ধান', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৬।

৬৪. খাতুন, সনজিদা, 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪২।

৬৫. খাতুন, সন্‌জিদা, 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৩।

৬৬. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫৮।

৬৭. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৯।

৬৮. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬০।

৬৯. খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই', *সন্‌জিদা খাতুন প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬০।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান : বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায়

বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসেছে নানান অভিঘাত নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববাংলার নারীর অবস্থানকে সমূলে নাড়া দিয়েছে। তার এ অবস্থান সমসাময়িক বিশ্বে ও আবহমান কালের ইতিহাসে বিরল। রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলনের যে পদযাত্রা শুরু হয়েছিল তার সম্পূর্ণতা পায় এই মুক্তিযুদ্ধে। একাত্তরের মা মুক্তি মা। দেশের জন্য সন্তানের উজ্জ্বল কেরিয়ার ভুলে কোরবান দিয়েছেন তাকে। প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন না থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রস্তুত করেছেন বিজয়ের পথ। এককথায় মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী এক ধাক্কায় নিজের অন্তরকে বাইরে এনেছে এবং বাইরের টানাপোড়েনকে নিয়ে গেছে অন্দরে। মুক্তিযুদ্ধে নারীমুক্তির শত সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে ওঠে। এর ফলে সামাজিক আলোড়নের নানা বিষয় সম্পর্কে সে সচেতন হয়। স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে তার। সেই ইতিহাস ধরা পড়ে বাঙালি মুসলিম নারীর মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক রচনায়। মুক্তিযুদ্ধ শুধু ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয়ের মধ্যেই থেমে থাকেনি। তার অভিঘাত সুদূর প্রসারী। ১৯৭১-এর সেই নয় মাসে দেশের মর্যাদা রক্ষায় ত্রিশ লক্ষের বেশি শহীদের প্রাণের বিনিময়ে ও দু লক্ষেরও বেশি নারী তার সম্মান বিনিময় করে এনেছে স্বাধীনতা। এসেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। ফেলে গেছে লাখো স্বজনহারার কান্না। দান করে গেছে একইসাথে নারী মুক্তির বহুদিক বিস্তৃত সম্ভাবনা আর বঞ্চনা, অবমাননার ইতিহাসকে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও ইতিহাসেই নিপীড়ক, ধর্ষক লুণ্ঠকরা জয়ী হয়নি। জয়ী হয়েছে মুক্তিকামী মানুষ। সে ইতিহাস লেখা আছে জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯২৪), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), পান্না কায়সার(১৯৪৭), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), মুশতরী শফী (১৯৩৮), মালেকা বেগম(১৯৪৪) নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২), সেলিনা হোসেন(১৯৪৭) বেগম মাসুমা চৌধুরী, সুলতানা রহমান, রোকেয়া বানু, শেখ সালমা নার্গিস, সারা আরা মাহমুদ,

জেসমিন সাদিক, যেবা মাহমুদ, মারুফা হাসিন, শামসুন্নাহার আজিম, মিলি রহমান, শাহজাদী বেগম, ডাঃ জাহানারা রাব্বী, ঝর্ণা জাহাঙ্গীর, কাজী তামান্না, আরশেদা বেগম রীনা, নাদিরা আলমগীর, খায়রুন্নাহার বানু, সেলিনা খাতুন, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা আখতার জাহান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাসিনী(১৯৪৭) প্রমুখের রচনায়।

ইতিহাস

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৭১ এর ১ মার্চ থেকে। দীর্ঘদিনের সামরিক শাসনের পর ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। বাঙালি বিপুলভাবে জয়ী করে আওয়ামী লীগকে। বাংলা প্রদেশের সরকার গঠনের জন্য ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান(১৯১৭-১৯৮০) ১ মার্চ তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেন।[১] বাঙালি জাতির উপর এহেন আক্রমণ আর অবমাননা আর মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। মুজিবর রহমান(১৯২০-১৯৭৫) দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা শুরু হচ্ছে ১ মার্চ থেকেই। জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৬) ১ মার্চের ঘটনাপ্রবাহ দিয়েই শুরু। সেদিন ছিল ক্রিকেট খেলা। ছাত্র, যুবক সহ হাজার হাজার ক্রিকেটপ্রেমী দর্শক গেছে খেলা দেখতে। অনেকেই সাথে নিয়ে গেছে রেডিও। রেডিওতে পাক প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শোনার পরই—

> অমনি কি যে শোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। মাঠ-ভর্তি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক— সবাই 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।[২]

আসলে তখন খেলা দেখার উন্মাদনার থেকেও জাতির স্বাধীকারের প্রশ্নটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঘোষণার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। পরের দিনের অনার্স পরীক্ষাও বন্ধ।[৩] এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সেদিনই প্রেস কনফারেন্স করে পরদিন ঢাকা শহরে আর তার পরদিন ৩ মার্চ সারাদেশে হরতালের ডাক দিয়েছেন মুজিবর রহমান। ডাক দিয়েছেন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণ জমায়েতের।[৪] তার সাথে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তার গণসংগঠনগুলি এই ঘটনার নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে বিবৃতি

দেয়।[৫] ২ মার্চ শুধু ঢাকা শহর নয়, সারা প্রদেশেই হরতাল অভূতপূর্বভাবে সর্বাত্মক। জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মিটিংয়ে ভিড় করছেন। এমনই একজন ছাত্র রুমী। তার মা যখন জিজ্ঞেস করেছেন সে তো কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। তবে কেন সব মিটিং শুনবে। সে উত্তর করেছে–

> এখন কি আর ব্যাপারটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে নাকি আম্মা ? এখন তো এ আগুনও ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে।[৬]

আগুন যে ছড়িয়ে পড়েছে তা দেখা যায়– হরতালে পিকেটিংয়ের ভয়ে সরকার কার্ফু দিয়েছে। কিন্তু তা উপেক্ষা করে জনগণ মিছিল করছে। গুলি খেয়ে মরছে। তবু মিছিল চলছে নিরস্ত্র জনতার। স্বাধীকারের দাবি, স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে। তাই জনসভায় স্বাধীন বাংলার পতাকাও দেখানো হল। ৩ মার্চ শহীদের দেহ নিয়ে মিছিল করল মুক্তি পিপাসু জনতা। তাতেও চালান হল গুলি। পরের দিনও তাই। সুফিয়া কামাল একাত্তরের ডায়েরীতে লিখছেন– বিবিসির সূত্র অনুযায়ী ৪ মার্চ পর্যন্ত দুই হাজার মানুষ শহীদ হয়েছেন।[৭]

বাঙালির এমন মরণপণ লড়াইয়ে ভীত ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ৭ মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে গণ-জমায়েতের আগেই । আর্মি আর নেভির ভয় দেখিয়ে বঙ্গবাসীকে ধমকে চুপ করাতে চাইলেন।[৮] কিন্তু এই হুমকিতে বিশেষ ফল হল না। কারণ তখন বাঙালি জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীকার কিম্বা স্বাধীনতার দাবিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বরং পরের দিন আরও উদ্দীপ্ত হয়ে শেখ সাহেবের বক্তৃতা শুনতে এল লাখে লাখে জনতা। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছিল সে সভায়। ২৪ ঘন্টার হাঁটা পথ পার হয়ে মানুষ সভায় এসেছে। দৃষ্টিহীন ছাত্রদের মিছিল এসেছে এই প্রথম। সবার উদ্দেশ্যে বার্তা– 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'[৯]। ঘরে ঘরে দুর্গ প্রস্তুত করার ডাক দিলেন মুজিবর রহমান। কিন্তু আন্দোলন চলল অসহযোগের শান্তিপূর্ণ পথে। আলোচনার পথও খোলা রইল পাক প্রেসিডেন্টের সাথে।

লেখক শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের জগতে আটকে ছিলেন না। তাঁরা দেশের গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে গড়ে তুললেন 'লেখক সংগ্রাম শিবির' ও 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম

পরিষদ'[১০]। মার্চের শুরু থেকেই লেখক, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র– সব মাধ্যমের শিল্পীরা অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পাক সরকারের দেওয়া একের পর এক পদক, সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১১]

পাক প্রেসিডেন্ট প্রতিদিন আলোচনার নামে দিনক্ষয় করছেন। আর গোপনে পূর্ব বাংলায় সেনা সমাবেশ করে চলেছেন। বন্দরে অস্ত্রভর্তী জাহাজ ভিড়ছে। বিহারীদের দিয়ে চলছে বাঙালি নিধনের নির্মম হত্যা। পাক প্রেসিডেন্ট ৬ মার্চ ঘোষণা করেছিলেন ২৫ মার্চ গণ পরিষদের অধিবেশন বসবে। আসলে ঐ দিনই নির্ধারিত হয়েছিল ২৫ মার্চ গণহত্যার নিষ্ঠুর নক্সা।

শহরের প্রাণকেন্দ্র, গণআন্দোলনের আঁতুড় ঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাঝরাতে ঢুকে পড়ল পাকিস্তান আর্মি। নির্বিচারে গণহত্যার স্বীকার হলেন শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীরা। গণ আন্দোলনের মুখ শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করল পাক আর্মি। বাংলাবাসী শুরু করল মুক্তি সংগ্রাম।

মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর এই নয় মাসে লক্ষ লক্ষ শহীদের তাজা রক্তে ধুয়ে গেছে বাংলার রাজপথ। লক্ষ নারীর সম্মানের বিনিময়ে এসেছে স্বাধীনতা। লক্ষ শহীদের গণ-কবরের উপর দিয়ে বয়ে এসেছে স্বাধীনতার ভোর। লক্ষ লক্ষ স্বজনহারা মা-বোন-স্ত্রী-সন্তানের ক্রন্দনে ধুয়ে গেছে শহীদ বেদী। আজও সে সব বীরের স্বপ্ন শপথ বয়ে চলেছে যুগান্তরের দিকে। নারীরা সেই যুগ সাধনায় আর অন্তঃপুরের বাসিন্দা হয়ে ছিল না। নেমে এসেছে রাজপথে। প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের মর্যাদায় আসীন হয়েছে। বাঙালি মুসলিম নারীর রচনায় বাঙালি নারীর এই ঐতিহাসিক অবস্থান অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে নারী

আমরা দেখেছি ১৯৭১ এর মার্চের আগে গণ আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও তা সর্ব ব্যপক ছিল না। তবে গণ আন্দোলনের উত্তাপ নারীর অন্দরমহলে পৌঁছেছে। অন্তরকে উদ্দীপ্ত করেছে। প্রস্তুত করেছে বাংলাদেশের মুক্তি

সংগ্রামে নিয়োজিত করার সংকল্পে। তাই দেখা যায় ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা হওয়ার পরই সারাদেশের সাথে মেয়েরাও প্রতিবাদে সামিল হয়েছে—

> ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার নিন্দা করে মুসলিম ছাত্রী সংঘের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা শাহানা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান।[১২]

৫ মার্চ নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির (আপওয়া) পূর্বাঞ্চল শাখা পাক সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা অসহযোগ আন্দোলনে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করে। দেশের সংগ্রামী মানুষকে অভিনন্দন জানায়। দেশের স্বার্থে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।[১৩]

সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে বায়তুল মোকাররমে ৬ মার্চ 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' এর পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৪] ওই দিনই শহীদ মিনারে 'আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সভাও সংগঠিত হয়।[১৫]

৭ মার্চ শেখ মুজিবের বক্তব্য শোনার জন্য অসংখ্য মহিলা এসেছিলেন। ছাত্রীরা মিছিল করে সভায় যোগ দেয়।[১৬] অসংখ্য মহিলা এসেছিলেন কাঁধে বাঁশের লাঠি নিয়ে।[১৭] সে সভায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শোনার পর মা-বোনেরা আরও সংগ্রামী তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ— বঙ্গবন্ধু বক্তব্যে বলেছিলেন—

> আমি আগেই বলে দিয়েছি, কোনো গোলটেবিল বৈঠক হবে না, ... যারা আমার মা-বোনের কোল শূন্য করেছে, তাঁদের সাথে বসব আমি গোলটেবিল বৈঠকে? যদি একটি গুলি চলে, তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো- যার যা আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। ... ... এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১৮]

বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে মহিলা মহলে সাড়া পড়ে যায়—

> সবাই শপথে বলীয়ান হয়ে বাড়ি ফিরে নিজেদের ছেলেমেয়ে স্বামী, শশুর-শাশুড়ি, মা-বাবা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে আলোচনা শেষে নানা পরিকল্পনা করলেন। এরই প্রতিফলন দেখা গেল হাতে লাঠি তুলে নেওয়া, মাথেয় ক্যাপ

> ও পায়ে কেডস পরে দৃঢ়ভঙ্গিতে প্রতিদিন তাঁদের কুচকাওয়াজ করা, শরীরচর্চার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে মনোবল-জাগানিয়া সভা-সমাবেশগুলোতে তাঁদের অংশগ্রহণ করার ঘটনার ভিতর দিয়ে।[১৯]

এই সময় ভাষা আন্দোলনের নেত্রী দেশের প্রথম মুসলিম মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরি(১৯০১-১৯৮৬)কে ৭০ বছর বয়সেও কি দৃপ্ত তেজে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি আমরা। তিনি ঐ বয়সেও সভা, মিছিল, কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দিতেন। উত্তরসূরী নারীরা সাহসে বলীয়ান হয়ে উঠতেন তা দেখে।[২০]

ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ার কাজে অধিকাংশ নারীরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৮ মার্চ থেকে ঘরে ঘরে স্বাধীনতার পতাকা তোলার কাজ মায়েরা মেয়েরাই করেছেন। স্বাধীন বাংলার পতাকা সেলাই করে দেওয়ার কাজটি অতি যত্ন নিয়ে তারাই করেছেন।

লেখক সংগ্রাম শিবিরের সদস্যরা ১৬ মার্চ যখন পথে নেমেছেন তখন আন্দোলনের ভাষাই বদলে গেছে। সেদিন মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে রাবেয়া খাতুন লিখছেন–

> মহিলাদের সংখ্যা কম হলেও মিছিলের মুখ তাদের দিয়েই। পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিরাট ব্যানারের একদিকের দন্ড ধরে লায়লা সামাদ। অন্য দিকে কাজী রোজী এবং আমি। মাঝে ফেস্টুন হাতে কবি সুফিয়া কামাল। ফেস্টুনে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা-
> "অস্ত্রের ভাষা অস্ত্রে চলবে এসো সশস্ত্র অস্ত্রের পথ ধরি"
> সুফিয়া কামালের দু'পাশে শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা, নতুন লেখক সুফিয়া খাতুন।[২১]

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই ১৮ দিনে এতটুকু সময় নষ্ট করেননি মহিলারা। ঘরে ঘরে দূর্গ প্রতিষ্ঠা করার কাজ করেছেন।

মা

ঘোমটার আড়ালে থাকা বাঙালি মায়ের চির পরিচিত আদলকে বদলে দেয় মুক্তিযুদ্ধ। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল। বিদেশে পড়বার হাতছানি ছিল। ছিল চাকরি করে স্বামী

পরিত্যক্ত দুঃখী দরিদ্র মায়ের দুঃখ মোচনের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নের রূপান্তর ঘটে। গর্ভধারিনী আর, দেশ জননী এক হয়ে যান। জাহানারা ইমাম, বেগম মাসুমা চৌধুরী, সুলতানা রহমান, রোকেয়া বানু, বেগম জেবুন্নেসা, আজাদের মা, করুণা বেগমরা রচনা করেন একাত্তরের মা, শহীদের মা হয়ে ওঠার কাহিনী।

বেগম মাসুমা চৌধুরী কি অসাধারণ নির্লিপ্তভঙ্গীতে সন্তান হারানোর ইতিহাসকে *স্মৃতি:১৯৭১*(১ম খন্ড) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[২২] ছেলের শৈশবেই স্বামী হারা মা অনেক কষ্টে সন্তানকে বড় করে তুলেছিলেন। সন্তান এ এফ জীয়াউর রহমান(১৯২৬-১৯৭১) ছিলেন সিলেট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। যুদ্ধের শুরুতেই পদোন্নতি হয়ে করাচি যাওয়ার কথা। কিন্তু বাংলা ছেড়ে যায়নি সে। দেশ ছেড়ে চলে গেলে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা সুশ্রুষা করা যাবেনা। মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় পাবে কোথায়! এই অসম্ভব দেশপ্রেমের কারণে পাক বাহিনী ১৫ মার্চ থেকে তাঁকে অন্তরীণ রাখে। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় অভুক্ত স্বামীর জন্য কিছু খাবার জোগাড় করে রান্না করে খেতে দিয়েছিল স্ত্রী। কিন্তু খাওয়া হয়নি তার। পাক আর্মি খাবার থালা থেকেই তুলে নিয়ে যায়। শেষবার মায়ের সাথে তার একটি কথা- 'আম্মা যাই'। আর ফিরে আসা হয়নি সন্তানের।

আর এক শহীদ খসরুর মা– সুলতানা রহমান। নবাব পরিবারের সন্তান খসরু, আহমদ ওয়াহিদুর রহমান। জনপ্রিয় কবি, নাট্যকার ছিল কিশোর বয়স থেকেই। মা রাজপুত্রকে হারিয়ে ফেললেন তার যৌবনের শুরুতেই। মা লিখছেন–

> আমার আত্মজ... ... আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, দীপ্তিমান, তারুণ্যে প্রোজ্জ্বল একটি ছেলে আহমদ ওয়াহিদুর রহমান... ... .. তার স্মৃতি চারণ করতে হচ্ছে আমাকে – আমি ভাগ্যবতী জননী নাকি অন্য কিছু?[২৩]

রোকেয়া বানু একসাথে চার সন্তান এবং একমাত্র জামাতাকে উৎসর্গ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। স্মৃতিচারণায়[২৪] কি অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় তা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখছেন-

> আজ আজও আমি পথ চেয়ে বসে থাকি এই বুঝি আমার মুকুল, মঞ্জু, অঞ্জু, রঞ্জু, ইউসুফ এসে বলবে- মা আমরা আবার ফিরে এসেছি।[২৫]

জাহানারা ইমাম *একাত্তরের দিনগুলি* (১৯৮৭)তে লিখছেন রুমী এবং আজাদের মায়ের 'শহীদ জননী' হয়ে ওঠার কাহিনি। রুমীর মা চাইছিলেন রুমী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমেরিকা চলে যাক। কারণ, স্বাধীনতার দাবিতে দেশের সন্তানরা অকাতরে রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। তার ছোঁয়াচ থেকে সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার। তাতে সন্তান সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু সন্তান এই আত্মসুখের সুরক্ষা চায় না। মায়ের বিবেকের কাছে সন্তান প্রশ্ন চিহ্ন রাখে—

> আম্মা দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়ত যাব শেষ পর্যন্ত! কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মত অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব; কিন্তু বিবেকের ভ্রুকুটির সামনে কোনওদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?[২৬]

শেষপর্যন্ত দেশের জন্য সন্তানকে উৎসর্গ করেন মা। নিজে ড্রাইভ করে সন্তানকে পৌঁছে দেন রণাঙ্গনে। এতদিন মা মুক্তিযুদ্ধকে দেখছিলেন ঘর বাঁচিয়ে। এখন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। কখন ওষুধ খাবার পোশাক পৌঁছে দিয়েছেন। কখনও মুক্তিসেনা, গেরিলা যোদ্ধাদের সরবরাহ করেছেন অস্ত্রশস্ত্র। একসময় রুমী আজাদ সহ বেশ কয়েকজন গেরিলা যোদ্ধা ধরা পড়ে পাক-আর্মির হাতে। রুমীর বাবা-মা মার্শি পিটিশন করে সন্তানের মুক্তির কথা ভাবেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও তার লড়াইয়ের প্রেরণা বাবা মায়ের মধ্যে তৈরি করে গভীর দ্বন্দ্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশের জন্য সন্তানকে কোরবানি করতে পারার মহৎ দায়িত্ব পালনে তা মিমাংশিত হয়।[২৭]

কিন্তু সবহারা আজাদের মায়ের কাছে এ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নি। যে মায়ের আজাদ ছাড়া খোয়ানোর কিছু নেই। সেই মা নিজেই সন্তানকে মৃত্যুর সাথে মোকাবিলা করতে শিখিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করছেন—

> বইনরে বড্ড মারছে আমার আজাদরে। আমি কইলাম বাবা কারও নাম বল নাই তো ? সে কইল, 'না মা কই নাই। কিন্তু মা যদি আরো মারে ? ভয় লাগে যদি কইয়া ফেলি ?' আমি কইলাম, বাবা যখন মারবো, তুমি তখন শক্ত হইয়া সহ্য কইরো' [২৮]।

সন্তান আর দেশ একাকার না হলে মায়েরা এমন দৃঢ়চিত্ত হতে পারেন না। আবার মায়েদের এমন ভূমিকা না হলে একটি দেশ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেও পারেনা। মায়ের ভূমিকা এখানেই। তাই এক সন্তান রুমীকে হারানোর পরও আর এক সন্তান জামীকে মুক্তিসেনার হাতে তুলে দেন মা।[২৯]

মুক্তিযুদ্ধের আর এক মায়ের রূপ দেখি বরিশালের করুণা বেগমের মধ্যে।[৩০] মাত্র তিন বছরের শিশুকে রেখে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে পাঁচ জন মহিলা ও দশ জন পুরুষ মুক্তি দল পাক সেনার শক্ত ঘাঁটি আক্রমন করে উড়িয়ে দেন।[৩১]

আর কোটি মায়ের কোটি কোটি সন্তান গেছেন যুদ্ধে। মায়েরা সন্তানের মঙ্গল কামনায় চোখের জল ফেলতে দ্বিধা করছেন। বাড়িতে বাড়িতে গ্রামে-গঞ্জে মায়েরা মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের ঘরের দা-বঁটি নিয়ে প্রস্তুত থাকতেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যে মিলিটারি রাজাকার মেরে তবেই নিজেরা মরবেন। তাঁদের সবাই কেবল মুক্তিযোদ্ধার মা নন, নিঃসন্দেহে নিজেরাও মুক্তিযোদ্ধা।[৩২]

সন্তান

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে সন্তানরা তাঁদের বাবা মা হারানোর অসীম যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা কেউ ছিলেন শিশু কিশোরী কিম্বা সদ্য যুবতী। অনেক সন্তান তার বাবাকে দেখেনি। মা বাবার অতি আদরের সে ফুল যখন মাতৃগর্ভে, মুক্তিযোদ্ধা বাবা নিহত হয়েছেন যুদ্ধে কিম্বা গ্রামেরই রাজাকার আলবদরের হাতে। বাবার সাথে আলাপ ছবিতে।[৩৩] তাই ভেবেছে- বাবা ছবির মত, মানুষের মত নয়।[৩৪] আর যেসব মেয়েরা বাবাকে কাছে পেয়েছে। তারা আজও ভাবে- এই বোধহয় বাবা তাঁর আদরের মেয়ের আদুরে নামটি ধরে ডাক দিয়ে কোলে তুলে নেবে। বাবার জন্য সালমা নার্গিসের অনন্ত প্রতীক্ষা শেষ হয়না—

> খুব ঝড় হলে, বৃষ্টি হলে দরজা জানালা বন্ধ করে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে ইচ্ছে করেনা। আমার মনে হয়— যদি বাবা এসে আমাদের ডেকে ডেকে

ফিরে যান। ভেজা পাঞ্জাবী থেকে তার টিপ টিপ বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে আর দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত বাবা যদি ফিরে যান।[৩৫]

আর এক মুক্তিযোদ্ধা বাবার মেয়ে– জেসমিন সাদিক, বাবার হত্যা দেখেছে নিজের সামনে। একই সাথে বোনের মৃত্যুও। বাবার স্মৃতিতে সে লিখছে–

আমার পিতা যাঁর কথা মনে হলেই মনে পড়ে একটি ডালিম গাছ যার অঙ্গে অজস্র লাল ফুল, নীচে দুটি রক্তলাল লাশ একটি আমার পিতার একটি বোনের। ... ... বাবার সাথে চির শয্যায় সুখের ঘুমে নিমজ্জিত।[৩৬]

মারুফা হাসিনের বাবাকে মনে পড়েনা। বাবার কথা শুনেছে। ঘোড়াশাল জুটমিলের অফিসার ছিলেন বাবা। পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু কর্মচারী সহকর্মীদের ফেলে তিনি একা জীবন বাঁচাবেন কি করে ! ১০২ জন কর্মচারীর সাথে তিনিও গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। মা তার দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাবাকে দেখতে গেছিলেন। তখনও বাবা জীবিত। দিদিকে কাছে ডেকে বাবা বলেছিলেন–

"রিয়া মামনি, একটা চুমু দাও আমায়"।[৩৭]

কিন্তু ভীত দিদি রক্তস্নাত বাবাকে শেষ আদর দিতে পারেনি। মুখ লুকিয়েছিল মায়ের কোলে। ততক্ষণে পাক আর্মি আবার ধেয়ে আসছে। দুটি শিশুকন্যা আর স্ত্রীর সম্মানের চিন্তা মৃত্যু পথযাত্রী বাবাকে ভাবিয়ে তুলল। মাকে বাধ্য করলেন চলে যেতে। ১০২ টি মৃতের স্তুপের মধ্যে জীবিত বাবা অপেক্ষা করে রইলেন অনন্ত পথের। চোখে তাঁর স্বপ্ন– স্বাধীন দেশে তাঁর শিশু কন্যা দুটি আদর্শবান ডাক্তার হবে।

যেবা মাহমুদ লিখছেন ডি আই জি বাবা শহীদ মামুন মাহমুদ(১৯২৯-১৯৭১) সম্পর্কে।[৩৮] বাবা তাঁর শিশু কন্যার আড়াই বছর বয়স থেকে চিনতে শিখিয়েছেন স্বদেশকে। চিনতে শিখিয়েছেন বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১-১৯৪১)কে- "তুমি যে দেখেছ গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে হেনেছে দুঃসহায়ে" কিম্বা "অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তৃণসম দহে"। ২৬ মার্চ ছিল বাবা মায়ের বিবাহ বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে ২৫ মার্চ বাবা যেবার জন্য কিনে এনেছিলেন– 'কার্ল মার্ক্সের শর্ট বায়োগ্রাফি' ও

'লেনিন' বই দুখানি। সেদিন রাতে সেই নৃশংস গণহত্যার পর অনেক স্বপ্ন নিয়ে বাবা লাল কালি দিয়ে বই দুখানিতে যেবার উদ্যেশ্যে লিখে রাখলেন ভাবী দিনের মুক্তি আন্দোলনের বার্তা। কার্ল মার্ক্স এর জীবনীতে লেখা ছিল–

> Zeba, when bangladesh is in the throes of its struggle for freedom, this book about one who preached emancipation of the downtroden should we hope inspire You. Papa/ Amma 26th March 1971[৩৯]

বাবা মাকে উপহার দিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিত সমগ্র। ছোট্ট ভাই জাভেদকে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের বই। তাতেও ভরা ছিল বাবার অনেক স্বপ্ন। লিখে দিয়েছিলেন–

> জাভেদ, বিজ্ঞানী মন জানতে চায় সব কিছুর কি ও কেন ? তোমার মনটাও যেন গড়ে ওঠে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে।[৪০]

বাবা এইভাবে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভাবী প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন সেই বার্তা ধর্মীয় উন্মাদ নিষ্ঠুর শাসককে কি করে বুঝতে হয়। কিভাবে তার সাথে লড়তে হয়।

বাবা নিজেকে উপহার দিয়েছিলেন বিপ্লবী চে গুয়েভারার – *Reminisance Of The Cuban Revolutionary War* । তাতে লাল অক্ষরেই লেখা ছিল- মামুন – ২৬ মার্চ ১৯৭১[৪১]। নিজেকে দেওয়া বাবার এই উপহারে বোঝা গিয়েছিল বাবার সংকল্পের কথা। চে'র মত শাসকের ঘুম ছুটানো মৃত্যু তিনি কামনা করেছিলেন। শাসকের ঘুম তিনি ছুটিয়েছিলেন বলে বেশি দিন বাঁচতে দেয়নি তারা। ২৬ মার্চেই ব্রিগেডিয়ারের সাথে কথা বলার ছলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর ফিরে আসা হয়নি যেবার বাবার।

স্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের অভিঘাত বাঙালি নারীর অবস্থানকে এক অন্য সমীকরণে পৌঁছে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ের পরিকল্পনায় কোনও স্ত্রী স্বামীর সাথে সামিল। আবার কোনও যোদ্ধা তাঁর কাজকর্ম পরিবারের সবার সাথেই গোপন করেছেন। তারপর একদিন

স্বামীর মৃত্যুর খবর বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। কিম্বা স্বামীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তখন স্ত্রীর জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু। প্রিয়তম মানুষটি দিয়ে ঘেরা নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়া, তার সাথে সন্তানদের লালন পালন, তাদের সুরক্ষিত রাখা। আর প্রিয়তমের নৃশংস হত্যার স্মৃতি বহন করে ক্রমাগত ক্ষত বিক্ষত হওয়া। এ যন্ত্রণা প্রতিটি স্ত্রীর। কিন্তু নিজের যন্ত্রণা উদযাপনের মধ্য দিয়েই শহীদের স্ত্রীরা জীবন জীবন অতিবাহিত করতে পারেন নি। নিজেকে মিলিয়েছেন আরও হাজার শহীদের স্ত্রী সন্তানের দুঃখের সাথে। তাদের দুর্দশা ঘোচানোর জন্য সামিল হয়েছেন। গড়ে তুলেছেন পুনর্বাসন কেন্দ্র।[৪২]

এঁদের মধ্যে অন্যতম পান্না কায়সার। শহীদ কবি সাহিত্যিক আজীবন সংগ্রামী স্বামী শহীদুল্লা কায়সার(১৯২৭-১৯৭১) এর বীরত্বের কথা স্মৃতির পথে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।[৪৩] স্বামীর সাথে মাত্র দু বছরের সংসার জীবন। এ কদিনেই পান্না দেখেছেন নতুন এক বিরাট ভুবন। এক উদার পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে নিষ্ঠুর শাসকের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের স্বপ্নরা অবিরত খেলা করত। অন্যরা যাতে সেই স্বপ্নময় পৃথিবীতে ভালো করে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকতেন। রাত জেগে মোমবাতি জ্বালিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে লিখতেন। শহীদুল্লা কায়সার স্বপ্ন দেখতেন—

> আমি দুটো স্বাধীনতা দেখব– এ স্বাধীনতা দেখার জন্য কত অপেক্ষা করেছি।[৪৪]

না দুটো স্বাধীনতা দেখা হয়নি তাঁর। ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতার প্রাককালে আলবদর এসে তুলে নিয়ে যায় তাঁকে। তিনি প্রায় বলতেন— আমি না থাকলে দুঃখ কোরও না, আমি থাকব আমার সাহিত্যে- আমি থাকব– দেশের মানুষের সাথে।[৪৫] তিনি সত্যিই এমন ভাবে মিশে আছেন দেশের সাথে।

শামসুন্নাহার আজিম নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের কর্মকর্তা স্বামীর বীরের মৃত্য বরণ নিয়ে লিখছেন—

> সেদিন তিনি (আনোয়ারুল আজম) যে স্মৃতি উপহার দিয়ে গেলেন তা শুধু আমার জন্য নয়, দেশবাসীর জন্যও এক অনন্য গৌরব-গাথা বলে আমি মনে করি। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যত বন্দুকের সামনে তিনি অকুতোভয়ে

> জামার বোতাম খুলে বুক পেতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন— "আমাকে গুলী না করে আমার একটি লোককেও গুলী করা যাবে না"[৪৬]

মিলি রহমান তাঁর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমানের(১৯৪১-১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধ পরিকল্পনার একজন অংশীদার।[৪৭] কি অসম্ভব দুঃসাহসিক পরিকল্পনা তাঁরা করেছিলেন! স্বামী ছিলেন করাচীতে কর্মরত। ভেবেছিলেন বিমান হাইজ্যাক করবেন। সাত মাসের শিশু সন্তানকে ঘরে রেখে আর সন্তানকে নিয়ে স্বামী স্ত্রী বিমান ছিনতাই করে মুক্তি পতাকা ওড়াবেন। যান্ত্রিক গোলযোগের কথা মাথায় রেখে রান ওয়ে থেকেই ফিরে আসেন তাঁরা। এর পর দুই সন্তানসহ স্ত্রীকে পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে যান। নিজে বিমান ছিনতাই করে মুক্ত দেশের স্বপ্নে পাড়ি জমান। কিন্তু মুক্ত স্বদেশ দেখা হয়নি তাঁর। তাঁর জীবন কিভাবে নিঃশেষিত হয়েছিল জানা নেই স্ত্রীর।

শাহজাদী বেগম লিখছেন তাঁর ইঞ্জিনিয়ার স্বামী শহীদ আবুল গাজী ওয়াহিদুজ্জামানী বীর চরিত্রের কথা লিখছেন।[৪৮] স্বামী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর ঘরবাড়ি লুট হয়ে যাচ্ছিল। স্বামী মুক্তিযুদ্ধে চলে গেলে তিনি তো নিঃস্ব হয়ে যাবেন। এ নিয়ে স্বামীকে অভিযোগ করেন স্ত্রী। তাতে স্বামীর উক্তি—

> আমার দেশ বাঁচলে তোমরাও বাঁচবে। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। তুমি যদি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও তবে আমি খুশি হব। আমি জানি তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। আমার দেওয়া উপহার ৩ ছেলে তোমাকে দিয়ে গেলাম। আমি হয়তো আসবো না কিন্তু তোমাদের জন্য স্বাধীনতা আসবে।[৪৯]

তিনি আরও বলেছিলেন কত স্বামী কত মায়ের ছেলে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। তিনিও স্বাধীনতার বিনিময়ে তাও দিতে প্রস্তুত। সত্যিই তিনি আর ফেরেন নি। কিন্তু হেসে হেসে প্রাণ যারা দিতে পারে তারা অত্যাচারীর প্রাণ নিতেও পারে। তাঁর গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ২৭৮ জন পাক আর্মি রাজাকারকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

এইসব মুক্তিকামী মানুষদের মনের কোথাও এতটুকু নিষ্ঠুরতার স্থান ছিল না। অথচ দেশের জন্য সহ্য করে গেছেন অকথ্য অপমান আর নিষ্ঠুর অত্যাচার! মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিশ্বাস করে গেছেন— অত্যাচারী মানুষগুলোও শেষ পর্যন্ত মানুষ।

ডাঃ জাহানারা রাব্বী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি -শহীদ ডাঃ ফজলে রাব্বীর এমনই দরদভরা মনের কথা শুনিয়েছেন।[৫০] ১৯৭১ এর ১১ ডিসেম্বর থেকে নতুন করে বুদ্ধিজীবীদের গণহত্যা শুরু করা হয়েছিল। সবাই বলেছিল এই সময় ডাক্তার অন্য কোথাও গিয়ে থাকুন। কিন্তু তাঁর বড় সাধ ছিল নিজের শহরেই বসে স্বাধীনতার ভোর দেখবেন। ১৫ ডিসেম্বর একটু সময়ের জন্য কারফিউ উঠে গেলেই নিজে ড্রাইভ করে এক অবাঙালি রোগী দেখতে গেছিলেন। মীরপুর, মোহাম্মদপুরের অবাঙালি বিহারিদের দ্বারা গণহত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেন স্ত্রী। কিন্তু তাতে ডাক্তার রাব্বী বলেছিলেন— "ওরাও তো মানুষ"। সেদিনই অমানুষেরা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। মৃত্যুমূহুর্তে "টিঙ্কুর আম্মা" বলে কাতরে উঠেছিলেন। টিঙ্কুর আম্মা(ডাঃ জাহানারা রাব্বী) বোধহয় সারাজীবন লালন করেছেন স্বামীর ভালোবাসাভরা এ কাতর উক্তি।

ঝর্ণা জাহাঙ্গীর তাঁর সাংবাদিক স্বামী, শহীদ আ.ন.ম. গোলাম মোস্তাফা শিশুর মত মনের কাহিনি বর্ণনা করছেন—[৫১]

> মোস্তফা কোনওদিন মুরগী জবাই দেখতে পারতো না। সে নিজের শরীরে বেয়নেটের খোঁচা কিম্বা বুলেট কিভাবে সহ্য করেছিল জানা নেই কারুর।[৫২]

সারা আরা মাহমুদ লিখছেন পূর্ব বাংলার প্রিয় গায়ক বীর শহীদ আলতাফ মাহমুদ(১৯৩৩-১৯৭১) সম্পর্কে।[৫৩] তাঁর স্বামীর স্বপ্ন ছিল— স্বাধীন বাংলা বেতারে গাইবেন গান। সেই গানে থাকবে স্বাধীন শোষনহীন দেশ গড়ার স্বপ্ন। সেই কথায় ইন্দ্রজালের মত সুর যোগ করবেন আলতাফ মাহমুদ। না সেই স্বপ্নের দেশে যাওয়া তাঁর হয়নি। ৩০ আগস্টের ভোরে ঘাতক বাহিনী তুলে নিয়ে যায় তাঁকে।

তিনি ফিরে আসেন তাঁর গাওয়া গানে আর সুরে— 'আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ?' দেশের মানুষের জন্য রক্তে রাঙা আলতাফ মাহমুদ একুশেই শুধু নয় স্বাধীনতার ভোরেও ফিরে আসেন।

বোন, দিদি

মুক্তিযুদ্ধে কত বোনের দাদা তার আদর ভরা শাসন সাথে নিয়ে হারিয়ে গেছে অনন্তে। তা লেখযোখা নেই। বাংলার পরিবেশ এমন সন্তান দান করেছে তাতে তার ছেলে মেয়েরা রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠেও ভাই বোন স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধে সে বাঁধন কেটে গেছে কত শত ভাই বোনের সম্পর্কের।

কাজী তামান্না লিখছেন তাঁর ভাই শহীদ ডাঃ হাসিময় হাজরা সম্পর্কে।[৫৪] ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাতের ঊর্ধ্বে উঠে ভাই-বোনের অপার সম্পর্ক। ১৯৬৪'র দাঙ্গার পর মা আর অন্য ভাইয়েরা ভারতে চলে এসেছিল। হাসিময় আর তার বাবা প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে আসতে পারেননি। দিদি অনেক বুঝিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দু বলে তার বেশি করে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতে আসার কথায় রাজি হয়নি। আসলে পরম আদরে ঠাঁই পেয়েছিল মুসলিম দিদির কাছে। মুক্তিযুদ্ধের কাজেই শেষ পর্যন্ত ভারতে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আসা হয়নি। তার আগেই তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। হাসতে হাসতে বীরের মতই মরেছিল হাসিময়।

আরশেদা বেগম রীনা লিখছেন বাংলা বিভাগ, নেত্রকোণা কলেজের প্রভাষক আরজ আলী সম্পর্কে।[৫৫] এই আপনভোলা মানুষটির এক পৃথিবী বোন আর দিদি। রীনাও তেমনি এক বোন। তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেননা। তাঁর বাড়িতে মুক্তিদের ক্যাম্প হয়েছিল। তা তিনি জানতেন না। তিনি জানতেন— এই স্বীকারোক্তি চেয়েছিল পাক কর্ণেল। কিন্তু তিনি তা দেননি। দীর্ঘদিন ধরে শরীর ক্ষত বিক্ষত করে, গায়ে গরম জল ঢেলে স্বীকারোক্তি নিতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত মেশিন গানের সামনে দাঁড়িয়ে অর্ধমৃত দাদা বলেছিল—

> আমি দার্শনিক জে সি দেবের ছাত্র। মিথ্যা বলতে শিখিনি।[৫৬]

তারপরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়।

সেলিনা খাতুন লিখছেন তাঁর মহকুমা প্রশাসক ভাই শহীদ এ কে শামসুদ্দিনের বীরগাথা।[৫৭] খুব কম বয়স হলেও একের পর সফল মুক্তি অপারেশনের নায়ক তিনি।

তিনি মুক্তির স্বপ্নে, আক্রমণকারী ডাকাতকেও মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে গেছেন। ঘরে দেড় বছরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি। আর পাঁচ মাসের সন্তান সম্ভবা স্ত্রী। অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে ঘরে ফিরেছিলেন। কিন্তু তারপর আর ফেরা হয়নি যুদ্ধক্ষেত্রে।

বন্ধু, সহকর্মী

মকবুলা মঞ্জুর লিখছেন তাঁর সহকর্মী কবি শহীদ মেহেরুন্নেসা সম্বন্ধে।[৫৮] মেহেরুন্নেসা অসুস্থ বাবা মা, ছোট ছোট ভাই বোনের কথা ভেবে বিয়েও করেননি। অতি দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে সংসার আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু বাঙালি মেয়ের এই মুক্ত বিচরণের জন্য পাড়ারই অমানুষরা হত্যা করে তাঁকে।

'আমার অগ্রজা বন্ধু' শিরোনামে মালেকা বেগম লিখছেন সাহিত্যিক সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সম্বন্ধে।[৫৯] তিনি লিখছেন—

> সামাজিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গেলে বাঙ্গালী মেয়ের কি অবস্থা হয় তার প্রতীক তিনি। তবে চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে তিনিও শরিক হয়েছিলেন নানা কাজে, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদে সভায়।[৬০]

তাই শ্বেতশুভ্র সাদা জামদানী শাড়ি, সাদা স্কার্ফ, সাদা ব্লাউজ সাদা মোজা পরা মৃত সেলিনাকে ক্ষত বিক্ষত নারী অঙ্গে পড়ে থাকতে হয়েছিল রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে।

'আমার স্বজন' শিরোনামে সেলিনা আখতার জাহান লিখছেন শিল্পী শহীদ আবদুর রশিদ সরকার সম্বন্ধে।[৬১] শহরের সক্কলেই ছিল রশীদের স্বজন। 'মুসলমান ছেলে রশিদ অথচ হিন্দুদের কাছে পরিচিত ছিল ঠাকুর হিসাবে'। যেকোনও ধরণের হাতের কাজে সে ছিল অপূর্ব শিল্পী। পূর্ব বঙ্গের তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খাঁ তাকে বিশ্বভারতীতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। সে প্রাণ ঢেলে জীবন্ত প্রতিমা গড়ত। মুসলমানের ছেলে মূর্তি তৈরি সহ্য হয়নি ধর্মের ধ্বজাধারীদের।

নীলিমা ইব্রাহিম 'আমার সহকর্মী' শিরোনামে লিখছেন প্রফেসর সন্তোষ ভট্টাচার্য(১৯১৫-১৯৭১)[৬২] সম্বন্ধে। প্রফেসর ভট্টাচার্য সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন না। সঠিক ইতিহাস পড়ানোর বাইরে একটাই (অপরাধ!) পূর্ববাংলাকে

বড্ড ভালবাসতেন। সহকর্মী, সুহৃদদের কথাতেও নড়েন নি বাড়ি থেকে। ১৪ ডিসেম্বর আরও অনেক সহকর্মী শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের অনুরোধে বাড়ি থেকে মাইক্রোবাসে করে অনন্তের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান জ্ঞান তাপস সন্তোষ ভট্টাচার্য। স্বাধীন দেশে তাঁদের সাথেই বাক্সবন্দী হয়েই ফিরে আসেন। নীলিমা ইব্রাহিম লিখছেন—

> ১৪ ডিসেম্বর ঠিক বিজয়ের মুখে। দুপুরে স্নান সেরে খেতে বসবেন সন্তোষবাবু। এমন সময় মাইক্রোবাস নিয়ে কজন ছাত্র এলো- 'স্যার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে'। স্যার সম্বোধনেই অধ্যাপক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেলেন, বললেন- 'খাবার দিয়েছে, খেয়ে আসি। তোমরা একটু বোসো'। ত্বরিত উত্তর এলো- 'না স্যার বসতে পারবো না। আপনাদের জন্য ভাল ভাল নাশতার ব্যবস্থা করা হয়েছে চলুন। অবশেষে বেরিয়ে গেলেন সরল নির্ভীক জ্ঞান তাপস।[৬৩]

একই সময়ে তাঁর সহকর্মী ড. আবুল খায়ের(১৯২৯- ১৯৭১), প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন আহমদ(১৯৩৩-১৯৭১), অধ্যাপক আনোয়ার পাশা(১৯২৮-১৯৭১), সাংবাদিক সাইদুল হাসান(১৯১২-১৯৭১), ডা: মোর্তাজাকে(১৯৩১-১৯৭১) তুলে নিয়ে গিয়েছিল আলবদরের দল। মীর পুরের বধ্যভুমিতে এঁদের ক্ষত বিক্ষত মৃত দেহ পাওয়া গিয়েছিল। নীলিমা ইব্রাহিম লিখছেন—

> সন্তোষ বাবুর মুখের কোনও দাঁত ছিল না, মাথায় কোনও চুলও ছিল না। গিয়াসের দেহ কত খণ্ড করা হয়েছিল তা হয়তো মি: মজুমদারের ফাইলে নথিবদ্ধ আছে, আমরা জানি সব টুকরো একসঙ্গে করে তার পরা লুঙ্গি দিয়ে বেঁধে আনা হয়েছিল।[৬৪]

প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধ প্রৌঢ়া বৃদ্ধাদের জপ তপ ও ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকতে দেয়নি। তাঁদেরকেও এনে ফেলেছে লড়াইয়ের ময়দানে। কিশোরগঞ্জের সখিনা খাতুন কখনও ভিখারিনী কখনও পাগলিনীর বেশে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংবাদ দাতার কাজ করেছেন।

রেকি করতেন শত্রু বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে। রাতের অন্ধকারে ক্রলিং করেও গিয়েছেন শত্রু শিবিরে।[৬৫]

যে সব প্রৌঢ়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি; বয়সের কারনেই নিজেদের নিরাপদ ভেবেছেন, তাঁরাও রেহাই পাননি। ধর্ষিতা হয়েছেন অত্যাচারী পাক সেনাদের হাত থেকে । রাবেয়া খাতুন লিখছেন—

> গ্রামের প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা নিজদের বিপদগ্রস্ত ভাবেননি। যে দেশের সৈন্য হোক বয়সে পেটের ছেলের মতই তো হবে। সনাতন সে বিশ্বাসে মার খেয়ে তারা হয়েছেন নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় নির্যাতিতা।[৬৬]

যোদ্ধার বেশে

এক সময় পর্দা রক্ষা করতে গিয়ে মুসলমান নারী আগুনে পুড়ে মরেছে, তবুও পুরুষের সামনে বের হয় নি।[৬৭] আজ সেই মেয়ে যোদ্ধার বেশে সে পুরুষের সাথে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। ড. লাইলা পারভিন বানু আলেয়া বেগম, শিরিন বানু মিতিল, আলমতাজ ছবি, মেহেরুন্নেসা মিরা, হালিমা খাতুন, তারামন বিবি ছিলেন এই সব অসম সাহসী নারী যোদ্ধাদের প্রতিনিধি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ড. লাইলা পারভিন বানু ছিলেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন বলে কলকাতায় বাংলাদেশের কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন। শেষ পর্যন্ত গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[৬৮]

আলেয়া বেগম চোদ্দ বা পনের বছর বয়সে যুদ্ধের কৌশল সমরাস্ত্র চালানোর কৌশল শিখে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রাইফেল, বন্দুক, এস এমজি, এস এল আর- সবকিছুই নিখুঁতভাবে চালাতে পারতেন। শত্রুপক্ষের অবস্থান অত্যন্ত কৌশলে জেনে নিয়ে অতর্কিতে একের পর এক ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দিতে পারতেন শত্রুর বুক। সহযোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়ে করেছেন উপযুক্ত নেতৃত্বদান।[৬৯]

মুক্তিযুদ্ধের আর এক গেরিলা যোদ্ধা আলমতাজ বেগম ছবি। ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিলেন রাজনীতি সচেতন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাতে যোগ

দেন। পারিবারিকভাবেই বিয়েরও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আগে। দুই দাদা আর হবু বর যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তিনিও যুদ্ধে যোগ দেন। ঝোপে জঙ্গলে থেকেছেন। অংশ নিয়েছেন কত ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধের।[৭০]

মেহেরুন্নেসা মিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাগেরহাটে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে অস্ত্রচালনা ডিনামাইট বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সেখানে অনেকগুলি সফল সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন।[৭১]

হালিমা খাতুন ভিক্ষুকবেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বহন করে এক জায়গা থেকে আর জায়গায় পৌঁছে দিতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না করতেন।[৭২]

দুই অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বীথিকা বিশ্বাস ও শিশির কণা। এঁরা গ্রেনেড চার্জ করে পাক বাহিনির গান বোট উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাঁতার কেটে গানবোটের দিকে এগিয়ে যান। পাশাপাশি তিনটে লঞ্চ। একটা লঞ্চের নীচে আশ্রয় নিয়ে চার্জ করলেন হ্যান্ড গ্রেনেড মুহূর্তে উড়ে গেল গানবোট। সাথে সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে গেল দুই তীরে। মুশলধারে বৃষ্টির মাঝে জীবম্মৃতের মত ছিলেন লঞ্চের পিছনে। বেঁচে ফিরবেন সে আশা ছিলোনা। তারপর কচুরীপানার নীচ দিয়ে কোনওক্রমে সাঁতরে কুলে উঠেছিলেন। অন্ধকারে পায়ে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরেছিলেন।[৭৩]

মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যে দুজন মহিলা 'বীরপ্রতীক' সম্মান পেয়েছেন তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন সিতারা ও তারামন বিবি। তারামন মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে ঢুকেছিলেন রান্নার কাজে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু তাঁর অস্ত্রের উপর খুব আগ্রহ। মার্ক ফোর, থ্রি নট থ্রি রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে একদিন অস্ত্রের ট্রেনিংও নিয়ে নিলেন। তারপর হয়ে উঠলেন ওই ক্যাম্পের অন্যতম একজন সশস্ত্র যোদ্ধা। অকুতোভয় এই যোদ্ধা মুক্তিবাহিনী আর পাক আর্মির যুদ্ধের আগে নিরীহ নাগরিকদের ক্ষতি যাতে নাহয় তার জন্য নদী পার হয়ে গ্রাম খালি করেছেন। বারবার পাক আর্মির ডেরায় ঢুকে গুরুত্বপুর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মুসলিম নারী যুদ্ধের ফ্রন্টে কাজ করেছে। রাইফেল হাতে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি সে। শিরীন বানু মিতিল পুরুষের বেশে যোগ দেন যুদ্ধ ফ্রন্টে। স্মৃতি চারণায় তিনি বলছেন—

> ছেলেদের সাথে কাজ করার সময় এমনকি বিশ্রামের সময় ছেলেদের পাশে ছেলে হয়ে থেকেছি।[৭৪]

সেবিকা

মুক্তিযুদ্ধে ডাক্তার হিসাবে নার্স হিসাবে আয়া হিসাবে অসংখ্য মহিলা যুক্ত ছিলেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করা, তাঁদের সেবা সুশ্রুষা করার জন্য তাঁরা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। যুদ্ধের মাসে তাঁদের ছিল বিশ্রামহীন দায়িত্ব। এই কাজে ছাত্রীরা, শিল্প জগতের মানুষ, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা সবাই নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করেছেন। সাঈদা কামাল, সুলতানা কামাল(১৯৫০), লায়লা খানের নাম এক্ষেত্রে সবার মন জয় করেছিল তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য।[৭৫] যাঁরা যুদ্ধের ফ্রন্ট্রে যেতে পারেননি তাঁরা বাড়িতে থেকে ওষুধ পত্র, খাবার, পোশাক সরবরাহ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য।

শিল্পী

আমরা দেখতে পেয়েছি ১৯৭১ পূর্ববর্তী আন্দোলনে সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও শিল্পীরা দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাহিত্যিকরা দেশের এই ক্রান্তিকালে গঠন করেছিলেন ‘লেখক সংগ্রাম শিবির’। এই সংগঠনে দেশের প্রথিত যশা কবি সাহিত্যিকরা ছিলেন। ছিলেন সুফিয়া কামাল, রাবেয়া খাতুন।[৭৬] বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা থেকে ‘বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করা হয়। ফেরদৌসী রহমান ছিলেন এই সংগঠনের সদস্য।[৭৭] টেলিভিশন শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন স্বাধীকার আন্দোলনে। ১৮ মার্চ ফেরদৌসী রহমান (১৯৪১), সাবিনা ইয়াসমিন(১৯৫৪), শাহনাজ বেগম(১৯৫২), আঞ্জুমান আরা বেগম(১৯৪২-২০০৪), সৈয়দ আবদুল হাদী(১৯৪০), খোন্দকার ফারুক আহমদ(১৯৪০-২০০১), রথীন্দ্রনাথ

রায়(১৯৪৯) সহ আরও অনেকের টেলিভিশনে সমবেত সঙ্গীত– 'সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম/ চলবেই দিনরাত অবিরাম' সারা দেশবাসীর মনে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মাতন লাগে।[৭৮]

সনজিদা খাতুন লিখছেন– তিনি যখন স্মরণার্থী হয়ে ভারতবর্ষে অবস্থান করছেন সেই সময়ে ভারতবর্ষে অন্যান্য স্মরণার্থীদের সংগঠিত করে গড়ে তুলছেন– 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীসংস্থা'।[৭৯] এই সংস্থার পক্ষ থেকে একদিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশবাসীকে সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের, স্মরণার্থী ক্যাম্পে অসহায় মানুষদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বিশ্বজনমত গঠনের ক্ষেত্রে।

বীরাঙ্গনা

পাকিস্তানি সেনা নায়ক বলেছিলেন–

> উই উইল মেক দিস কান্ট্রি আ ল্যান্ড অফ প্রস্টিটিউট আ ল্যান্ড অফ স্লেভস, আ ল্যান্ড অফ বেগারস।[৮০]

এই উক্তিতেই বোঝা যায় বাংলাদেশের মানুষকে তারা কি ভেবেছিল। নারীদের প্রতি অত্যাচার কুখ্যাত গেস্টাপো বাহিনীকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল তারা। লক্ষ লক্ষ কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা-মহিলা গণধর্ষিতা হয়েছিলেন। বাবার সামনে, ভাইয়ের সামনে ধর্ষণ করেছে। প্রতিবাদী নারীকে গণধর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। নারী অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে প্রদর্শনের জন্য রেখেছে সবার সামনে। সেদিনের সে 'কুৎসিৎ বীভৎসার' বর্ণনা করার ক্ষমতা এ গবেষকের নেই। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে লেখা রচনায় তা চোখের জলে ধরা আছে। রাবেয়া খাতুন লিখছেন—

> এই অসম যুদ্ধে যাদের নগদ লাভ হচ্ছে তারা হচ্ছে শেয়াল আর শকুন। .... .. জ্বলন্ত জনহীন গ্রামের এক বাড়ির আঙিনায় এক অসহায় তরুনী দাঁড়িয়ে। কাছে একদল শকুনী। না একদল নয়- দু'দল। একদলের সর্বাঙ্গে খাঁকি পোশাক। কাঁধে ঝিলিক দিচ্ছে হিংস্র বেয়নেটের কিরিচ আর এক দলের শক্ত ঠোঁট থকে ঝরছে লালা, কতক্ষণে মেয়েটি মরবে....।

> নালার ঘোলা পানি ও পাংশুটে কাদায় আধ-গোঁজা হয়ে আছে স্ত্রী অঙ্গের বিভিন্ন অংশ। ... ... পাছা কাটা, বুক কাটা, মরা, আধমরা কয়েকজন তরুনী পড়ে আছে শিমুল তলায়। ঝরা লালফুল আর নারীদেহের নিসৃত রুধির একাকার।[৮১]

আড়াই লক্ষ নারী পাক আর্মি, রাজাকার, পাক দালালদের কুৎসিৎ লালসার স্বীকার হয়েছে। নীলিমা ইব্রাহিম 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে এমন সাতজন এর নমাসের অত্যাচারিত জীবনকে তুলে ধরেছেন।[৮২] তারা, মেহেরজান, রীনা, শেফালী, ময়না, ফাতেমা, মিনারা, যারা নিতান্ত নারী থেকে বীর হল– তার কাহিনি। বিদেশী শাসকের আর্মি দ্বারা অত্যাচারিত, ধর্ষিত, ক্ষত বিক্ষত হতে হতেই সারা অন্তর জুড়ে ধ্বনিত করেছে 'জয় বাংলা'। রক্তস্রোতে স্নান করতে করতেই স্বপ্ন দেখেছে জয় বাংলার।

রীনা ছিলেন পদস্থ অফিসারের অতি আদরের অপূর্ব সুন্দরী উচ্চশিক্ষিত মেয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শেষ বর্ষের ছাত্রী। বিয়ে হওয়ার কথা আমেরিকায় পাঠরত গবেষক ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। কিন্তু একাত্তরের হানাদার এসে স্বপ্নজগৎ ভেঙে খান খান করে দেয়। বাবা মাকে বাড়িতেই হত্যা করে তুলে নিয়ে যায় সেনানিবাসে। প্রতিদিন হয়েছেন নির্যাতিতা। একদিন ব্রিগেডিয়ার এসে অত্যাচারের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে গেল–

> হেড কোয়ার্টার থেকে ব্রিগেডিয়ার খান এসেছে। .... আমার এ... দেহটাকে নিয়ে সেই উন্মত্ত পশুর তাণ্ডবলীলা ভাবলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমাকে কামড়ে খামচে বন্যপশুর মত শেষ করেছিল। মনে হয় আমি জ্ঞান হারাবার পর সে আমাকে ছেড়ে গেছে।[৮৩]

রীনার মত শেফালী, মেহেরজান, ময়না, ফাতেমা, মীনাদের সুন্দর হাসি খুশিতেভরা জীবন ছিল। বাবা মা ভাই বোনের আদরে মাখামাখি ছিল। ছিল দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন। কিন্তু একাত্তরের নয়মাসে গণধর্ষণের অত্যাচারিত হতে হতে সুন্দর জীবনের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু 'জয়বাংলা'র স্বপ্ন শত অত্যাচারও ভোলাতে পারেনি–

> শেফার জীবন সম্পর্কে আর কোনও মায়া মোহ নেই। এ দেহের খাঁচাটা থেকে মুক্তি পেলেই সে বেঁচে যাবে। কিন্তু তার বড় আশা একবার শুনে যাবে দেশ স্বাধীন হয়েছে, একবার প্রাণভরে শুনবে 'জয়বাংলা'।[৮৪]

ফাতেমাকে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তার ফলে তিনি মানসিক সুস্থতাও হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের গ্রামে মিলিটারি হামলার সময় ধরা পড়েন পাড়ার বিহারি মোড়ল নাসির আলির হাতে। ছোট্ট বোনকে সেখানে আছড়ে মেরে ফেলে। ধরে নিয়ে গিয়ে নাসির আলী আর তার ছেলে মিলে ধর্ষণ করে। তারপর তাদের উচ্ছিষ্ট দেহ তুলে দেয় পাক মিলিটারির কাছে। শুরু হয় তাঁর জীবনে আরও কুৎসিৎ অধ্যায়। কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে যায় একদিনের ঘটনা। সে দিনের ঘটনা বর্ণনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন। কিন্তু তবু তিনি বলছেন। কারন— ভাবী প্রজন্মের জানা দরকার দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে নারীর কি দুঃসহ নির্যাতনের বিনিময়ে।

এক হিংস্র সিপাই ছিল। সবার সাথেই খারাপ ব্যবহার করত। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কখনও লাথি মারত, মাথায় চাঁটি মারত, গালিগালাজ তো সারাক্ষণই করত। চুপ করে সবই সয়ে যেত। কিন্তু একদিন সমস্ত অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়—

> একদিন পাড় মাতাল হয়ে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাকে উলঙ্গ করে কামড়ে খামচেও ওর তৃপ্তি হলো না, ওর পুরুষাঙ্গটা জোর করে আমার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো। আমি নিরুপায় হয়ে আমার সব কটা দাঁত বসিয়ে দিলাম। লোকটা যন্ত্রণায় পশুর মতো একটা বীভৎস চিৎকার করে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলো। আমি জানি আজই আমার শেষ দিন। আমাকে টেনে নিয়ে পরনের লুঙ্গিটা দিয়ে আমার চুলের ঝুঁটি বেধে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পাখার সঙ্গে লটকে দিয়েসুইচ অন করে দিল। কয়েক মুহূর্ত চিৎকার করেছিলাম। তারপর আর জানিনা। অন্য মেয়েরা বলছে প্রথমে জানোয়ারগুলো হেসে উঠেছিল কিন্তু ভয়ে মরিয়া হয়ে মেয়েগুলো চিৎকার করায় বাইরে থেকে এক সুবেদার এসে পাখা বন্ধ করে দেয় ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। .... ৩/৪ দিন হাসপাতালে ছিলাম মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। কিন্তু জ্বর ছেড়ে দিতেই আমাকে আবার ওই ব্যারাকে পাঠিয়ে দিলো।

> অবশ্য কয়েকদিন আমার উপর কোনও নির্যাতন করেনি ওই পশুরা। কিন্তু যথাপূর্বম তথা পরম।[৮৫]

নীলিমা ইব্রাহিম লিখছেন তিনি যে কজন ধর্ষিতার সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক নির্যাতিতা ছিলেন ফাতেমা।[৮৬]

১৬ ডিসেম্বর বহু প্রত্যাশিত 'জয়বাংলা' এলো। তারা, রীনা, মেহেরজান, ময়না শেফালী, চাঁপা সবাই বাঙ্কারের অন্ধগুহা থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু নমাসের অভিশাপ তাঁদের পিছু ছাড়ল না। অত্যাচারে অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত শরীর। হাসপাতাল ভরে যায় লক্ষ নারীতে। বীভৎস কদাকার জীবনে দেহের অবস্থাও বীভৎস। শেফালী বর্ণনা করছেন—

> আমাদের একটা জিপে তুলে নিয়ে যেখানে আনা হল তা একটা হাসপাতাল। আমাদের গায়ে ঘা, চামড়ায় গুড়ি গুড়ি উকুন। মানুষের মাথা উকুন হয় জানতাম, গায়ে হয় জানতাম না। একে একে ওয়ার্ড মেইডরা এসে আমাদের গরমপানি সাবানে স্নান করালো।[৮৭]

দেহমনকে আরও বিক্ষত করেছিল অন্তঃসত্ত্বা হয়ে। ঘাতক বাহিনীর সন্তান গর্ভ থেকে জানান দিচ্ছে নিদারুণ অপমান আর নিষ্ঠুরতা। মীনা গর্ভপাত করার পর কি স্বস্তি আর শান্তিই না পেয়েছেন! যুদ্ধ আর এক মাস চললে মীনার গর্ভের কথা ঘাতকরা বুঝতে পেরে যেত। মীনাকে হত্যা করে ফেলত। গর্ভপাত করার পর মীনা ভাবছেন—

> দশদিন পর আমার গর্ভপাত করানো হলো। তিনমাস হয়েছিল। আল্লাহ্ আর একমাস দেরি হলেই তো ওরা বুঝতে আরব আমাকে বাইরে নিয়ে কি করত? অস্ফুট চিৎকারে মুখ ঢাকলাম।[৮৮]

স্বাধীনতার কয়েকদিন আগেই তারাদের সামনেই বিনা চিকিৎসায় ময়না মারা গেলেন। সকাল থেকেই প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। বাকিরা তাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চিৎকার করেও কারুর সাড়া পাওয়া যায়নি। নারী এখন তাদের অরুচী। হারের ভয়ে ভীত। ময়না যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে করতে নিস্তেজ হয়ে যান। মুখ নীল হয়ে গেল। এই

হীমশীতল মৃত্যুর মাঝে তারা অপেক্ষা করেছেন শুধু মুক্তির।[৮৯] অবশেষে মুক্তি এসেছে। কিন্তু এ কোন মুক্তি ! মুক্তিবাহিনীর সান্নিধ্যে এসে পরম বিশ্বাসে জ্ঞান হারালেন। যখন জ্ঞান ফিরল তখন মনে হল তিনি অপ্রকৃতস্থ—

> অকথ্য অত্যাচার আর যন্ত্রণাকে আঁকড়ে থাকার ফলে আমার বোধহয় কিছুটা মাথার গোলমাল হয়েছিল। এরপর বলছিলাম— বাবার কাছে যাবো, বাবার কাছে যাবো। কিন্তু যখন বাবার নাম জিজ্ঞেস করলো তখন কিছুতেই বাবার নাম বলতে পারলাম না। শুধু ভেউ ভেউ করে কাঁদলাম।[৯০]

এঁদের ঠাঁই হল বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্রে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সমস্ত ধর্ষিতাকে ঘোষণা করলেন বীরাঙ্গনা বলে। তিনি বলেছিলেন—

> তোরা আমার মা, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিস। তোরা শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা? আমি আছি, তোদের চিন্তা কি?[৯১]

বীর হওয়ার উপাধি তো তাঁরা পেলেন। তবে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ এই থেমে থাকল না। সমস্ত যুদ্ধেই যোদ্ধাদের, নাগরিকদের অঙ্গহানি হয়। তা নিয়ে সমাজের বিশেষ নজর থাকে না। কিন্তু বীরাঙ্গনারা হারিয়েছিলেন তাঁদের নারীদেহ, কুমারীত্ব। সমাজের পক্ষে এ কেমন করে মানা সম্ভব! নীলিমা ইব্রাহীম এই গ্রন্থের ৯৪ সালে প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখছেন- ১৯৭২ সালে যুদ্ধজয়ের পর যখন পাকিস্তানি বন্দিরা ভারতের উদ্দেশ্যে এ ভুখণ্ড ত্যাগ করে, তখন তিনি জানতে পারেন প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন ধর্ষিত নারী এ বন্দীদের সাথে দেশ ত্যাগ করছেন। অবিলম্বে তিনি ভারতীয় দূতাবাসের সামরিক অফিসারের সাথে কথা বলে এঁদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি নেন। সে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা খুবই মর্মান্তিক।

এঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে নীলিমা ইব্রাহিম দেখেন একজন ১৪-১৫ বছরের মেয়েও পাকিস্তানে চলে যেতে চান। কারন তাঁর মনে হয়েছে সমাজে ধর্ষিতার আত্মদানের মূল্য কত অর্থহীন ! তাই ষাট বছরের বৃদ্ধ সেপাইকে বিয়ে করে পাকিস্তানে চলে যাওয়াই ভালো। তাতে সে বৃদ্ধ তাঁকে পতিতা পল্লীতে বিক্রি করলেও আক্ষেপ থাকবেনা। দেশের

মানুষের কাছে, স্বামী সন্তানের কাছে পতিতা হয়ে ধিক্কৃত জীবন যাপন করার থেকে অচেনা বিদেশীদের কাছে পতিতা হয়ে বাঁচা অনেক ভালো।[৯২] বাবা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এলেও ফিরে যাননি। দেশবাসীর উপর তার এত অভিমান। কারণ তাঁরা দেখেছেন পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিবাহিত মেয়েদের স্বামীদের থেকে কি ব্যবহার—

> আমাদের ভেতর অধিকাংশই বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের স্বামী এসেছে, কথা বলেছেন, কেউ কেউ শাড়ি উপহার দিয়ে গেছেন। কিন্তু ফিরিয়ে নিতে পারবেন না একথা অসংকোচে জানিয়ে গেছেন। কারন তাদের সমাজ আছে, সমাজে আর পাঁচজন আছে তাদের ভেতর তো এ ভ্রষ্টা কলঙ্কিনীদের নিয়ে তোলা যাবে না। ... ... এসব মন্তব্য থেকে আমরাও আমাদের অবস্থান জেনে নিয়েছিলাম। স্বামী যখন ঠাঁই দিতে পারেনা তখন কোন রাজপুত্র আমাদের যেচে ঘরে নেবে।[৯৩]

এই স্বামীদের মধ্যে একজন আর্মি অফিসার ছিলেন। যিনি মুক্তিযুদ্ধে গেছিলেন। এতদিনে হয়তো জেনারেল হয়ে গিয়েছেন। স্ত্রীকে মাসে মাসে টাকার বন্দোবস্ত করতেও পারবেন কিন্তু গ্রহণ করতে পারেননি।[৯৪]

আমরা দেখেছিলাম হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তারা বাবাকে দেখার জন্য ডুকরে কেঁদেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা দাদার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখতে আসার সময় পায়নি কেউ। তারার সম্মানের বিনিময়ে সরকার থেকে টাকা এসেছে। তা দিয়ে ঘর মেরামত হচ্ছে। বাবা এলেন অনেক প্রতীক্ষার পর। কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন না। বাগদত্ত শ্যামলদা বীরাঙ্গনা কেমন দেখতে তাও দেখে গেছেন। কলকাতা থেকে দিদির আনা শাড়ি নিয়ে দাদা এসেছে দেখতে। এবং যাওয়ার সময় স্পষ্ট করে কয়েকটা কথা দাদা বলে গেছে—

> দাদা বললো, তারা আমরা যে যখন পারবো তোর সঙ্গে দেখা করে যাবো। তুই কিন্তু হুট করে বাড়ি গিয়ে উঠিস না। .... তাছাড়া আমাদের ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখবারও দরকার নেই।[৯৫]

মীনার অফিসার স্বামীর কাছে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিঠি গেলেও স্ত্রীকে নিতে আসে নি। মীনা তাঁর ছোট্ট মেয়ে ফাল্গুনীর জন্য ঘরে ফিরেছিলেন। এই নমাসে মেয়ে তার মাকে ভুলে গেছে। চিনতে পারেনি তার মাকে। স্বামী তখন অন্য সংসর্গে। তাই স্ত্রী এখন পতিতা। স্ত্রীকে দেখে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া—

> তুমি এখানে কেন? মরবার জায়গা পাওনি? ঐ তো ধানমান্ডি লেকে কত পানি, যাও। কোন সাহসে তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছো ?[৯৬]

পুরুষ একাধিক সংসর্গে গেলে তার পৌরুষত্ব বাড়ে। কিন্তু নারীদেহ লুণ্ঠিত হলেও সে আসলে পতিতাই। সমাজ তাই মনে করে। চরিত্র হননকারীর চরিত্র নষ্ট হয় না। হয় নারীর। এমনই দিক দেখি ময়নার জীবনেও।

ময়না বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। বাবা মা ভাইয়েরা পরম আদরেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু নারী সম্পর্কে এই ধারণা বোধহয় মাও পোষণ করতেন। তাই মেয়ে ময়নার উপর তার প্রতিফলন পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের পর বাবার হাতে কাজ নেই। এক ভাইয়ের হাত কাটা গেছে। আর এক ভাইয়ের ব্যবসা ভালো চলে না। আর এক বোন আছে। এই পরিস্থিতিতে পড়াশুনা স্থগিত রেখে ময়নার বিয়ে দেওয়ার মনস্থির করেন বাবা। বাগদত্তের বাড়িতে সেই প্রস্তাব নিয়ে যান তিনি। কিন্তু ধর্ষিতার বাবা বলে সে বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। বাবার এ অপমানে মা মুহূর্তে ভুলে যান যে ময়নাকে বন্দী করে বাবাকে মুক্তি দেয় ওরা। মা যা করলেন তা ময়নার স্বপ্নেরও অতীত—

> আব্বা শিশুর মত কাঁদছেন; ময়না কিছু বুঝবার বা জানার আগেই আম্মা ছুটে এসে তার দু'গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলেন। রাগে কথা বলতে পারছেন না, চিবিয়ে বললো, ফিরে এলি কেন? যে নরকে গিয়েছিলি সেখানেই থাকতে পারলি না? ওরা এতো লোক মেরেছে, তোকে চোখে দেখলো না? কোন সাহসে ওই পাপদেহ নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিস বল? বল?[৯৭]

এইভাবে পরিবার পরিজন দ্বারাও হয়েছেন চরম লাঞ্ছিত। নয় মাস নির্যাতন সহ্য করে 'জয় বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু যে বাংলার জন্য চরম লাঞ্ছনা সে দেশের মানুষ

তাদের কি 'বেবুশ্যে মাগি' ছাড়া ভাবতে পারেনি। এমনকি মুক্তি যোদ্ধা স্বামী পর্যন্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধা বাবা তাঁর আদরের সন্তানকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। অথচ তারই সম্মানের বিনিময়ে সরকার বরাদ্দকৃত অর্থে তৈরী হয়েছে বাড়ি। চরম অত্যাচার সহ্য করার পর কেউ বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। লোকে বীরাঙ্গনা ফাতেমাকে ডাকে 'ফাতে পাগলি'। এই ধর্ষিতদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেওয়া হয়েছে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি। কিন্তু সমাজ বীর হিসাবে তাদের গ্রহণ করা দূরে থাক মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এর কারন– তাঁরা মুক্তিসংগ্রামে নেমেছিলেন কিন্তু নারীর মুক্তি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাজগৎ বাঁধা ছিল সেই সামন্ত যুগেই কিম্বা আরও আগে। নারী অঙ্গ সুরক্ষিত রাখা নারী চরিত্রের অন্যতম গুণ। নারী অঙ্গেই নারীর প্রকৃত পরিচয়। এই চিন্তা নিয়েই যোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধে নেমেছেন। কিন্তু ঘরের অরক্ষিত নারীর কি হবে তা নিয়ে ভাবিত ছিলেন না।

অত্যাচার, বিশেষত ধর্ষণ করে, বাংলাদেশের মানুষের মানসিক সঙ্কট তৈরী করতে চেয়েছিল। পেরেওছিল তারা। মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনলো। কিন্তু মনের মুক্তি এলোনা। তাই বঙ্গবন্ধু সমস্ত ধর্ষিতাকে 'বীরাঙ্গনা' ঘোষণা করার পরও তাদের তালিকা প্রকাশ নিয়ে পিছু হটেছিলেন। নীলিমা ইব্রাহীম লিখছেন–

> স্বয়ং বঙ্গবন্ধু এই তালিকা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সমাজ এঁদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মত উদার নয়। বঙ্গবন্ধু আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন একাত্তরের নির্যাতিতা নারীরা যেন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন।[৯৮]

১৯৯২ এর ২৬ মার্চ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণ আদালতে যুদ্ধপরাধী গোলাম আজমের বিচার হয়। তখন কুষ্টিয়া থেকে তিনজন বীরাঙ্গনা এসেছিলেন সাক্ষ্য দিতে, বিচার চাইতে। কিন্তু বিচার তো পাননি। উপরন্তু নতুন করে লাঞ্ছিত হন, একঘরে হন সমাজে।[৯৯]

নীলিমা ইব্রাহিম চেয়েছিলেন 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে। কিন্তু তা আর তিনি করতে পারেন নি। তিনি শরীরের অক্ষমতার কথা বলেছেন। কিন্তু মনে হয় তা সবটাই নয়। ভয়ঙ্কর রক্ষণশীল সমাজের কথা ভেবেছিলেন বারবার। ১৯৯৭ সালে অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকায় বলছেন—

> আমি পাঠক সমাজের কাছে 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু দুটি কারণে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। প্রথমত, শারীরিক কারণ। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার হৃদয় ও মস্তিষ্কের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং নতুন করে আর এ অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব। বর্তমান সমাজ '৭২ এর সমাজের চেয়ে এদিকে অধিকতর রক্ষণশীল। বীরাঙ্গনাদের পাপী বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং পঁচিশ বছর আগে যে সহজ স্বভাবিক জীবন থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের নতুন করে অপমানিত করতে আমি সংকোচ বোধ করছি।[১০০]

কিন্তু এ নারীকে সমাজ ছুঁড়ে ফেলেছে বলে নিজেকে দলা পাকাতে পাকাতে সেঁধিয়ে যায়নি সে হতাশার অন্ধকারে। নানা দিক থেকে সমাজের সাথে লড়াই করেছে। সে জোর গলায় ঘোষণা করেছে—

> আমার পরিচয় ? আমি এই বাংলার একজন গর্বিত নারী, যাকে অরক্ষিত ফেলে রেখে আপনারা প্রাণভয়ে পদ্মা পার হয়েছিলেন। ফিরে এসে গায়ে লেবাস চড়িয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধার।[১০১]

সমাজের মুক্তমনা মানুষের আকুতি ছিল বীরাঙ্গনার এই অভিমানের অপমানের শেষ কোথায়? নীলিমা ইব্রাহিম সন্ধান করেছিলেন মুক্তমনা মানুষের। যাঁরা বীরাঙ্গনার বীরত্বের যথাযথ সম্মান দেবেন। যাঁরা পরম আদরে মুছিয়ে দেবেন তাঁদের অবমাননার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত। সেই উদার মনের মানুষগুলির সাথে দেখাও হয়েছিল তাঁর আদরের বীরাঙ্গনাদের।

কিন্তু বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ কেউ কদর করুন বা না করুন তাতে তাঁর বীরত্বের অবস্থান পালটে যায়না। তাঁরা দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়েছেন। অত্যাচার সইতে সইতেও দেখেছেন স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন। দেশের প্রতি তাঁর এই অঙ্গীকার তাঁর নিজের কাছেই নিজেকে অনেক উঁচুতে বসিয়েছে। এই নারীই একাত্তরের নারী। সে অপমান সইতে সইতেও নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গর্ব করতে শিখেছে। এমনকি সমাজকে বলতে ভয় পায় নি যে সে ধর্ষিত। ধর্ষণের অপমানের চেয়ে তার কাছে বীরত্বই প্রাধান। লিখেছে তার আত্মজীবনী। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী লিখছেন, *নিন্দিত নন্দন* (২০১৪)। তাতে সমাজের চোখে যা নিন্দিত তা নিয়ে গর্ব বোধ করে লিখছেন–

> সেই অন্ধকার ধূসর অতীত। ... ... কখন যে মনে হলো আমি নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আত্মচর্চা আমাকে আস্থাশীল করেছে।
>
> আমি বীরাঙ্গনা। আমার চেতনায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষ্য। আমার গর্ব মহান মুক্তিযুদ্ধ।[১০২]

পরিশেষে একথা বলার, এই রচনাগুলিতে একাত্তরের বীর চরিত্রের কথা যেমন ধরা পড়েছে তেমনি আছে হারিয়ে যাওয়া স্বজনের স্বপ্নহারার যন্ত্রণা। আছে বীর যোদ্ধাদের আত্মত্যাগকে লুণ্ঠিত করার ব্যথা। আসলে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক লেখা-লিখিগুলির প্রকাশ শুরু হয় আশির দশক থেকে। তার আগে মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একের পর এক মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের হত্যা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ক্ষমতাসীন হয়ে ঘাতক দালালদের পুনর্বাসিত করছে। সব মিলিয়ে এক দম বন্ধ করা আতঙ্কের পরিবেশ। এই আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আবার জাগিয়ে তুলবার অদম্য চেষ্টা শুরু হয়েছিল। যাতে এক সাগর এই রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনল যাঁরা তাঁদের বীরত্বের ইতিহাস যেন মুছে না যায়। যে সব বীরাঙ্গনার অমানবিক অত্যাচার সহনের মধ্যে বাংলার স্বাধীনতা আসল। তাঁদের সেই প্রাণঢালা আত্মত্যাগ যেন পরবর্তী প্রজন্ম ভুলে না যায়। নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে, হারিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধার অনুসন্ধান শুরু হয়। সম্মাননা প্রদান করা হয় হারিয়ে

যাওয়া বীরযোদ্ধাদের। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালদের শাস্তির দাবিতে তৈরি হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি(১৯৯০)। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে করে শুরু হয় উত্তাল আন্দোলন। সে আন্দোলন গড়িয়ে আসে এই শতকেও। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি, সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু হারিয়েছেন তাঁদের প্রিয়জনদের তাঁরাও নিয়োজিত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রক্ষা করার জন্য। তাই স্বজনহারার অধরা স্বপ্ন দেখে বেদনা, হতাশা শেষ কথা বলে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাহিত হয়ে চলে আজও।

আর নারীদের নিজস্ব ক্ষেত্রে ৭১ নারীকে মুক্ত করেছে। হানাদারের হাত থেকে দেশের সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে, নিজের সম্মানের বিনিময়ে। মুক্ত নারীর এমন পদচারনা বিশ্বের ইতিহাসে কমই পাওয়া যায়। মুখের পর্দা সরালে যে নারীকে কোতল করার বিধান দেওয়া হত, সে নারী এখন রাজপথে, যুদ্ধের ফ্রন্টে। সমাজ কি ভাবল, প্রতিদানে সমাজ কি মর্যাদা দিল সেটা সমাজের দিক। কিন্তু নারী নিজেকে অসীম উচ্চতায় নিয়ে গেছে; ঘোষণা করেছে নিজের মর্যাদাময় মুক্তি– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবস্থান এমন উচ্চতাতেই। জাতির দুর্দিনে লাইট হাউসের মত দিশা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এই নারী ধর্ম সম্প্রদায় ও সমস্ত সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে সর্বোতভাবে একজন উন্নতশীর মানুষ।

তথ্যসূত্র

১. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* ২য় মুদ্রণ- জানু ২০১৫, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ৩৫০/-টাকা, পৃ- ৩৯-৪০।

২. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি,* ১ম প্রকাশ ফেব্রু ১৯৮৬, ৩০ ম জানু ২০১৩, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা- ১০০০, মূল্য-৩০০টাকা, পৃ- ১২।

৩. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* পঞ্চম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১৬, হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ২৫০ টাকা, পৃ- ৩১।

৪. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩।

৫. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০-৪১।

৬. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ১০।

৭. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩২।

৮. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

৯. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি,* প্রাগুক্ত, পৃ- ২২-২৩।

১০. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬।

১১. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬-২৭।

১২. রহমান, আতাউর, 'মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব' উদ্ধৃত বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* পৃ-৪০।

১৩. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০।

১৪. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪১।

১৫. কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩।

১৬. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

১৭. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪২।

১৮. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪২।

১৯. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪২।

২০. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৪।

২১. খাতুন, রাবেয়া, *একাত্তরের নয় মাস,* আগামী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯১, ঢাকা ১১০০, মূল্য-৬৫টাকা, পৃ- ৬।

২২. চৌধুরী, বেগম মাসুমা, *স্মৃতি:১৯৭১* (১ম খণ্ড)হায়দার, রশীদ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৮৮, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, পৃ- ৪০- ৪৪, ঢ়াকা, মূল্য- ৭০টাকা।

২৩. রহমান, সুলতানা, *স্মৃতি:১৯৭১* ৭ম খণ্ড, হায়দার, রশীদ(সম্পা), ১ম প্রকাশ- জানু ১৯৯৫, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৫৫টাকা, পৃ- ৯।

২৪. বানু, রোকেয়া, *স্মৃতি:১৯৭১ (৫মখন্ড)* বানু, ১ম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৯২, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রু ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা, পৃ- ২০-২২।

২৫. বানু, রোকেয়া, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

২৬. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৬।

২৭. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি,* প্রাগুক্ত পৃ-২০০।

২৮. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২০২।

২৯. ইমাম, জাহানারা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭০।

৩০. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৭।

৩১. বেগম, মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৮-১০৯।

৩২. বেগম, মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬০।

৩৩. বানু, খায়রুন্নেসা, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি:১৯৭১* (ষষ্ঠ খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা পৃ- ৩৭।

৩৪. আলমগীর, নাদিরা, 'আমার স্বামী', হায়দার, রশীদ (সম্পা) *স্মৃতি: ১৯৭১,* ১ম প্রকাশ- ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৯ম খণ্ড, পৃ-১১

৩৫. নার্গিস, সালমা, *স্মৃতি: ১৯৭১,* ৭ম খণ্ড,পৃ- ৭৮-৮১।

৩৬. সাদিক, জেসমিন, *স্মৃতি:১৯৭১* , ৬ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৮২, ৮৪-৮৫।

৩৭. হাসিন, মারুফা, *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ- ১৩৭।

৩৮. মাহমুদ, যেবা, 'আমার বাবা', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫০-৫৩।

৩৯. মাহমুদ, যেবা, 'আমার বাবা', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫২।

৪০. মাহমুদ, যেবা, 'আমার বাবা', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩।

৪১. মাহমুদ, যেবা, 'আমার বাবা', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৩।

৪২. কায়সার, পান্না, *হৃদয়ে একাত্তর*, ১ম খণ্ড, প্রসঙ্গ কথা, আগামী প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ-১৯৯৮, ঢাকা- ১১০০, মুল্য- ১২০টাকা।

৪৩. কায়সার, পান্না, 'আমার স্বামী', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৯-৯৩।

৪৪. কায়সার, পান্না, 'আমার স্বামী', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৩।

৪৫. কায়সার, পান্না, 'আমার স্বামী', *স্মৃতি:১৯৭১* , ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৯২।

৪৬. আজিম, শামসুন্নাহার, *স্মৃতি: ১৯৭১*, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ- ১৯০।

৪৭. রহমান, মিলি, *স্মৃতি: ১৯৭১*,, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২-২৬।

৪৮. বেগম, শাহজাদী, *স্মৃতি: ১৯৭১*, ৫ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০০-১০১।

৪৯. বেগম, শাহজাদী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০১।

৫০. রাব্বী, জাহানারা, 'মুক্তির আলোক তীর্থে অনির্বান শিখা : ডা: ফজলে রাব্বী', *শহীদ, বুদ্ধিজীবী স্মারক গ্রন্থ*, প্রকাশক- ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ ১৯৯৪, মুল্য- ৮৫ টাকা, পৃ- ১৭-২১।

৫১. জাহাঙ্গীর, ঝর্ণা, 'আমার স্বামী, গোলাম মোস্তফা, *স্মৃতিঃ১৯৭১*, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ- ২১।

৫২. জাহাঙ্গীর, ঝর্ণা, 'আমার স্বামী, গোলাম মোস্তফা, *স্মৃতিঃ১৯৭১*, (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ- ২১।

৫৩. মাহমুদ, সারা আরা, *স্মৃতি: ১৯৭১*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত।

৫৪. তামান্না, কাজী, 'আমার ভাই', *স্মৃতি: ১৯৭১*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৬-৮১।

৫৫. বেগম, আরশেদা রীনা, 'আমার ভাই', *স্মৃতি: ১৯৭১* , ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৯-৭৫।

৫৬. বেগম, আরশেদা রীনা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৫।

৫৭. খাতুন, সেলিনা, 'আমার ভাই', *স্মৃতি: ১৯৭১* , ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৩।

৫৮. মঞ্জুর, মকবুলা, 'আমার বন্ধু', *স্মৃতি: ১৯৭১*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৮-১৪১।

৫৯. বেগম, মালেকা, *স্মৃতি: ১৯৭১* , ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৫-১০৯।

৬০. বেগম, মালেকা, *স্মৃতি: ১৯৭১* , পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৮।

৬১. জাহান, সেলিনা আখতার, 'আমার স্বজন', *স্মৃতি: ১৯৭১* , ৯ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ- ১১১।

৬২. ইব্রাহীম, নীলিমা, আমার স্বজন, *স্মৃতি: ১৯৭১* , ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৫।

৬৩. ইব্রাহীম, নীলিমা, আমার স্বজন, *স্মৃতি: ১৯৭১* , ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৯।

৬৪. ইব্রাহীম, নীলিমা, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৫।

৬৫. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৯-১১১।

৬৬. খাতুন, রাবেয়া,বেগম, মালেকা, *একাত্তরের নয়মাস* , পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৭।

৬৭. রোকেয়া,*অবরোধ বাসিনী* , *রোকেয়া রচনাবলী* , ঘোষ, অনিল(সম্পা), কথা, কলকাতা ৭০০০৬৭, কথা সংস্করণ- ২০১৪, মূল্য- ৪০০টাকা। পৃ- ৪১১।

৬৮. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৬-৬৮।

৬৯. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , পূর্বোক্ত, পৃ- ১০১-১০৮প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত- আনোয়ার, রশীদা, ঢাকা, *দৈনিক জনকণ্ঠ* , ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৮।

৭০. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৫।

৭১. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৩।

৭২. বেগম, মালেকা,*মুক্তিযুদ্ধে নারী* ,প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৩।

৭৩. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৮।

৭৪. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৬।

৭৫. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,*প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৮-১১৯।

৭৬. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬।

৭৭. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬।

৭৮. ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি* প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১।

৭৯. খাতুন, সনজিদা, 'প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধ', *প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন* , নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, ১ম প্রকাশ- ফেব্রু ২০১০, মূল্য- ৫৮০টাকা, পৃ-৪০।

৮০. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৩।

৮১. খাতুন, রাবেয়া, *একাত্তরের নয় মাস,* আগামী প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯-৪০।

৮২. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , জাগৃতি প্রকাশনী, সপ্তম মুদ্রণ- ২০১৬, মূল্য-৩০০টাকা।

৮৩. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৬।

৮৪. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৪।

৮৫. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩৩-১৩৮।

৮৬. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৪।

৮৭. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৬।

৮৮. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৯।

৮৯. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২০।

৯০. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২১।

৯১. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

৯২. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪।

৯৩. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৩।

৯৪. ইব্রাহীম, নীলিমা, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪।

৯৫. ইব্রাহীম, নীলিমা, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩।

৯৬. ইব্রাহীম, নীলিমা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫১।

৯৭. ইব্রাহীম, নীলিমা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১৭।

৯৮. ইব্রাহিম নীলিমা, উদ্ধৃত- *মুক্তিযুদ্ধে নারী* বেগম, মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৯।

৯৯. বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭০।

১০০. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকা।

১০১. ইব্রাহীম, নীলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৮০।

১০২. প্রিয়ভাষিণী, ফেরদৌসী, *নিন্দিত নন্দন*, মুখবন্ধ, শব্দশৈলী, প্রথম প্রকাশ-২০১৪, বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, মূল্য-৩০০টাকা।

উপসংহার

উপসংহার

মধ্যযুগের দৈবীপ্রভাব থেকে মুক্ত মানবতার বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল নবজাগরণ। ধর্ম সংস্কারের পথে যার সূচনা, মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে যার বিজয় ঘোষণা। একদিন সমগ্র ইয়োরোপে নবজাগরণের এই বিজয়-যাত্রা ঘোষিত হয়েছিল। যার অভিঘাত এসে পৌঁছেছিল সেকালের বাংলায়। যে কাল তখনও অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়নি। নবজাগরণের আধুনিক চিন্তা তার সে অবগুণ্ঠন খুলে দিয়েছিল। ফলে জড়তার সীমা অতিক্রম করে আত্ম অনুসন্ধানে ব্রতী বাঙালি বেছে নিয়েছিল জ্ঞানার্জনের পথ। উনিশ শতকের শুরু থেকে একটু একটু করে সে পথের সন্ধান হতে হতে রামমোহন(১৭৭২-১৮৩৩) বিদ্যাসাগরের(১৮২০-১৮৯১) প্রচেষ্টায় তা আরও প্রশস্ত হয়। একটু দেরি হলেও বাংলার মুসলিম সমাজও আত্মবিস্মৃতির অতল থেকে ক্রমে স্পর্ধিত মস্তক উন্নীত করছিল আধুনিক চিন্তার উচ্চতায়। দেশীয় ভাষা সংস্কৃতির চর্চা বাদ দিয়ে প্যান ইসলামিজমের ঐক্য তাকে বেঁধে রেখেছিল মধ্যযুগীয় আরব-পারস্যের দুনিয়ায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে আবদুল লতিফ(১৮২৮-১৮৯৩), এবং সৈয়দ আমির আলী(১৮৪৯-১৯২৮)র প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলিম আধুনিক হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করে। মীর মোশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯১২) বাংলা সাহিত্য জগতে ব্যতিক্রমী অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বাঙালি মুসলমানকে একধাক্কায় আধুনিকতার অভিমুখে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যান। আধুনিক চিন্তা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণ 'মানুষ' হিসাবে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইল। সেই ভাবনাকে ভর করে নারীকেও 'মানুষ' হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার দাবি উঠল। একদিকে মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে নারীদের সে মর্যাদা দেওয়ার জন্য লেখা-পত্র প্রকাশ হতে থাকল। 'তালাক প্রথা', 'বাঁদী প্রথা', 'বহু বিবাহ'-র বিরুদ্ধে; বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। অন্যদিকে মেয়েদের অন্তঃপুরে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এই প্রচেষ্টা বহু যুগের পুরুষতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রকে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বিরুদ্ধতা ছিল নানাবিধ। কিন্তু নবজাগৃতির চিন্তা এক স্পর্ধার জন্ম দিয়েছিল। যে স্পর্ধা ইতিমধ্যে মুসলিম সমাজের অন্দরমহলেও প্রবেশ করেছে। দিয়েছে সেই চেতনা যে চেতনাকে ভর করে বাংলার মুসলিম নারী মনুষ্যত্বের মর্যাদা দাবী করেছে।

সে লড়াই সহজ ছিল না। মধ্যযুগীয় চিন্তার সুগভীর বুনোটকে আধুনিক চিন্তার অভিঘাতে আলগা করতে বাংলার আলোকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পর্দাপ্রথার প্রবল প্রতাপ, ইসলামী শরিয়তি আইন এবং বহু দিনের দাসত্বের শৃঙ্খলকে অতিক্রম করে আত্মঅনুসন্ধানে ব্রতী বাংলার মুসলিম নারীকে পথ খুঁজতে হয়েছে জ্ঞানের আলোকে হাতিয়ার করে। সে আলোয় সে নিজেই শুধু আলোকপ্রাপ্ত হয়নি, সমগ্র মুসলিম সমাজের অন্দরমহলে সেই আলো বিস্তারে তারা ব্রতী হয়েছে। নিজেরা কলম ধরেছে। কোথাও আবার প্রতিষ্ঠা করেছে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়, জানানা হাসপাতাল। তাহেরুন্নেসা, নবাব ফয়জুন্নেসা(১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসা(১৮৫৫-১৯২৬), লতিফুন্নেসা(১৮৭৭) প্রমুখ নারীরা এইসময় নারী মুক্তির পথে ঊষার আলোর মত আশা সঞ্চার করেছেন।

এই পথেই প্রভাত সূর্যের সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন রোকেয়া(১৮৮০-১৯৩২)। প্রবল বিরোধিতা অতিক্রম করে নিজেই শুধু শিক্ষিত হলেন না ভাবী প্রজন্মের জন্য রেখে গেলেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রতিষ্ঠা করলেন বালিকা বিদ্যালয়। সামাজিক কল্যাণের জন্য মেয়েদের নিয়ে তৈরি করলেন সংগঠন— আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম(১৯১৬)। এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে রোকেয়া সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের নিয়োজিত করলেন। তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীরা যাতে কোনও অংশেই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে না থাকে। 'অর্ধাঙ্গী' যেন সত্যিকারের অর্ধেক অংশ হতে পারে। এই মর্যাদা অর্জনে যে প্রধান বাধা পুরুষতন্ত্র ধর্মতন্ত্র তা তিনি তাঁর জীবন-সংগ্রাম দিয়ে প্রতিমুহূর্তে বুঝেছিলেন। এ আমরা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হতে দেখেছি। কিন্তু নারীর নিজস্ব মুক্তির প্রশ্নটি তার নিজের কাছেই— তা তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন। নারী দীর্ঘদিন অন্তঃপুরের অন্ধকারে থাকার কারণে তার মন ততোধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুরুষতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার ও বিধি নিষেধ তার মুল্যবান সম্পত্তি বলে মনে করে সে। অলংকার এবং বাইরের চাকচিক্য দিয়ে নিজেকে শোভিত করাকে গৌরবময় মনে করে। এ বিষয়টি নারীর পক্ষে তীব্র মর্যাদাহানিকর বলে মনে করতেন রোকেয়া। আজও যাঁরা নারী স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামছেন তাঁদের মধ্যেও অলংকার, প্রসাধন, বাইরের চাকচিক্যই 'নারীর নিজস্ব' পরিচয় হয়ে রয়েছে। অথচ সেই অন্ধকারময় যুগে জন্ম নেওয়া একজন নারী তাকে 'দাসত্বের চিহ্ন' বলে উল্লেখ

করেছেন। প্রসাধন ব্যবহার করে চকচকে হওয়ার চেয়ে যাঁতা ঘোরান, লাঠি-ছুরি খেলা, ব্যায়াম করার মাধ্যমে শারীরিক মানসিক উন্নতির কথা বলেছেন। তাঁর এই বলিষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। সেই চিন্তা অনুপ্রেরণা দেয় আজকের নারীমুক্তি আন্দোলনেও।

এইভাবে শিক্ষাচিন্তা প্রসারের পথেই সেদিন মুসলিম নারীর মুক্তি ও প্রগতীর পথের সূচনা হয়েছিল। যা ক্রমে মুসলিম নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পথ বেয়ে এনে দিয়েছিল সেই বোধ, যে বোধের উদ্বোধনে মুসলিম সমাজের অন্দরমহলের চেতনাকে সেদিন প্রগতির অভিমুখে ক্রিয়াশীল করেছিল। খায়েরুন্নেসা(১৮৭৪/৭৬- ১৯১০), মাসুদা রহমান(১৮৮৫-১৯২৬), বিদ্যাবিনোদিনী নুরুন্নেসা খাতুন(১৮৯৪- ১৯৭৫), মামলুকুল ফতেমা খানম(১৮৯৪-১৯৫৭), মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেছা প্রমুখ প্রগতির সেই পথে একদল বলিষ্ঠ অভিযাত্রী। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম আঘাত নেমে আসে বঙ্গবাসীর উপরেই। বাংলার জনগণের ঐক্য নষ্ট করতে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। তার বিরুদ্ধে প্রথম গণআন্দোলনে ফেটে পড়ে বাংলার মানুষ। সেই আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছায় মুসলিম অন্তঃপুরেও। বাঙালি মুসলিম নারী অবরোধের বাঁধন ঠেলে নেমে আসে রাজপথে। আন্দোলনে ও মিছিলে। খায়েরুন্নেসা এমনই একজন নারী। নারী শিক্ষার সাথে স্বদেশ রক্ষায় সামিল হয়েছেন। কলম ধরেছেন। ইংরেজ শাসক সৃষ্ট ভেদনীতি দ্বারা ভাতৃঘাতী দাঙ্গায় বারবার রক্তাক্ত হয়েছে এই বাংলা— তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন এই মহীয়সী নারীরা। নারীর নিজস্ব মুক্তির সাথে সাথে সমাজ প্রগতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁদের রচনায় ধরা পড়ে। তাঁদের এই উদ্যোগ ভাবী প্রজন্মের নারীদের বহুমুখী সম্ভাবনাকে বিকশিত করেছে।

সম্ভাবনার সেই পথেই আমরা পেয়েছি ফজিলতুন্নেসা(১৯০৫-১৯৭৫), শামসুন নাহার মাহমুদ(১৯০৮-১৯৬৪), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা(১৯০৬-১৯৭৭), রাজিয়া খাতুন(১৯০৭-১৯৩৪), সুফিয়া কামাল(১৯১১-১৯৯৯), জাহানারা ইমাম(১৯২৯-১৯৯৪), আছিয়া মজিদের মত আরও অনেক প্রগতিশীল নারীদের। যাঁদের রচনা ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলনের সেই সম্ভাবনাকেই পূর্ণতার দিকে নিয়ে গেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে নারীমুক্তির সাথে সমাজ মুক্তির ভাবনাকে পরিপূরক করে দেখতে পারার মধ্য দিয়েই। তাই আমরা লক্ষ্য করেছি নারীমুক্তি আন্দোলনের সমস্ত অনন্যাই তাঁরা একই

সাথে সমাজমুক্তির পথেও পদচারণা করেছেন। কারণ এই সমাজের অর্ধেক আকাশ যে নারী তাঁকে বাদ দিয়ে সমাজের পূর্ণমুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

এদেশের জতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তা যথার্থ গণ চেহারা অর্জন করেছে। তার অভিঘাত মুসলিম সমাজের অন্দরমহলেও এসে পৌঁছেছে, তা আমরা দেখেছি। ক্রমে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথেই শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, যথাযথ মানবমুক্তির প্রসঙ্গটিও যুক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি অগ্নিযুগের মধ্যে। পরবর্তীকালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সে চিন্তাকে আরও পূর্ণতা পেতে দেখি। এই সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে কোথাও সরাসরি কোথাও চিন্তায় যোগ ছিল এই অনন্যাদের। কারও কারও ক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের এই মণীষাদের সাথে ছিল ব্যাক্তিগত যোগাযোগ। ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব কোথাও সেই সময়ের প্রভাব এই অনন্যাদের চিন্তা জগতে কাজ করেছে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। বাংলা ভাগ হল। হিন্দু বাঙালির জন্য পশ্চিমবঙ্গ, মুসলমান বাঙালির জন্য পূর্ববঙ্গ। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে শত্রু হিসেবে ইংরেজ এবং হিন্দুদের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার ইতিহাস বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের কপাটটি রুদ্ধ করে রেখেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা নিজের ধর্মের শাসক পেল, কিন্তু শাসকের কাছ থেকে ইসলামের সাম্য পেলনা। পেল আর একটি ঔপনিবেশিক শাসন। এই প্রথম বাঙালি মুসলমান জনগণ নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হল। তাই পাকিস্তান শাসকের বাংলা ভাষাভাষীদের অবদমনের বিরুদ্ধে তার বাঙালি পরিচয় সর্বাগ্রে প্রাধান্য প্রল। আমরা আগে দেখেছি বাঙলা ভাষা শিখবার জন্য করিমুন্নেসা, রোকেয়া সহ অগ্রগামী বাঙালি মুসলিম নারীদের কি বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশ ভাগের পর পূর্ববঙ্গে বাঙ্গলা ভাষাকেই রক্ষার দাবিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সামিল হল অগণিত বাঙালি মুসলিম। সমাজের নানা পেশায় নিযুক্ত মানুষ যুক্ত হলো ভাষার দাবিতে আন্দোলনে। সব পরিচয়ের ঊর্ধে তখন তাদের পরিচয়, তারা বাঁঙালি। ভাষা রক্ষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি মুসলিম নারী তখনও পর্যন্ত অনেক সামাজিক-

ধর্মীয় বাধায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন সে বাধার বাঁধ ভেঙে দেয়। ভাষা রক্ষার দাবিতে রাজপথে নেমে আসে সে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের লাঠি গুলির সম্মুখীন হয়েছে। বাঙালি মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করল। সেদিনের সে আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শত শত বাঙালি মুসলিম নারী তার বহুদিনের সংস্কার উপেক্ষা করে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবাহে যুক্ত হয়ে কারাবরণ করেছে। স্বামীর তালাককে সে তুচ্ছ মনে করেছে। সুফিয়া কামাল, সুফিয়া আহমদ(১৯৩২-২০২০), রওশন আরা বাচ্চু(১৯৩২- ২০১৯), সনজিদা খাতুন(১৯৩৩), বেগম হবিবর রহমান সেই সময়ের সংগ্রামী চেতনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের রচনায়।

ভাষা আন্দোলনে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হল, তাকে অবদমিত করতে চেয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা। দফায় দফায় চালু হল সামরিক শাসন। মানুষের ঐক্যকে ভেঙে দিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সংঘটিত হল অসংখ্য দাঙ্গা। নিষিদ্ধ করা হল বাংলা ভাষা। নিষিদ্ধ হল রবীন্দ্রচর্চা। এর বিপরীতে পূর্ববঙ্গের মানুষ নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি রক্ষায় ব্রতী হল আরও দৃপ্ত ভাবে। শিল্প সাহিত্য চর্চা আর নিছক চর্চা হয়ে থাকল না, তা পরিণত হল এক সামাজিক আন্দোলনে। সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম(১৯৪৪), সনজিদা খাতুন(১৯৩৩), নবুয়াৎ ইসলাম পিনকি(১৯৪৪), কোহিনূর হোসেন সেই সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনায়। যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ গণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। দেশময় এই বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পাকিস্তানী শাসকরা নির্বাচনের কৌশল অবলম্বন করেছে। সেই নির্বাচনেও হয়েছে তাদের অভূতপূর্ব পরাজয়। এই পরাজয়ের পরেও সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি নীতিকে উপেক্ষা করে তাদের দেয় প্রতিশ্রুতিকে দুপায়ে মাড়িয়ে তারা সামরিক শাসন নামিয়ে এনেছে।

যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১-এর ২ মার্চ জাতীয় অধিবেশন স্থগিত করা হল। নতুন করে চাপিয়ে দেওয়া সামরিক শাসনের ভার দুর্বহ হয়ে উঠল পূর্ববঙ্গবাসীর কাছে। তারা স্বাধীনতার ডাক দিল। শুরু হল মুক্তির সংগ্রাম। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অস্ত্র ধারণ করল আপামর জনতা। ছাত্র-ছাত্রী, নারী পুরুষ নির্বিশেষে জীবন বাজি রেখে দেশ রক্ষার আন্দোলনে সামিল হল। যে নারীকে আমরা নারীমুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলনের ধারায় একদিন পর্দার

বিরুদ্ধে শিক্ষার দাবিতে লড়তে দেখেছি, পরবর্তীকালে পেয়েছি সমাজ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সচেতন ভূমিকা। এই পর্বে এসে আমরা পেলাম যোদ্ধা নারীকে। যে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ। যে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেদিনের গৃহবন্দী নারী তার সমস্ত অবগুণ্ঠনের বাধা অতিক্রম করে সমাজমুক্তি ও প্রগতি আন্দলনের পথে পূর্ণতা অর্জন করেছে। সে ইতিহাস লেখা আছে জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯২৪), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), পান্না কায়সার(১৯৪৭), রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫), মুশতরী শফী (১৯৩৮), মালেকা বেগম(১৯৪৪) নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২), সেলিনা হোসেন(১৯৪৭) বেগম মাসুমা চৌধুরী, সুলতানা রহমান, রোকেয়া বানু, শেখ সালমা নার্গিস, সারা আরা মাহমুদ, জেসমিন সাদিক, যেবা মাহমুদ, মারুফা হাসিন, শামসুন্নাহার আজিম, মিলি রহমান, শাহজাদী বেগম, ডাঃ জাহানারা রাব্বী, ঝর্ণা জাহাঙ্গীর, কাজী তামান্না, আরশেদা বেগম রীনা, নাদিরা আলমগীর, খায়রুন্নাহার বানু, সেলিনা খাতুন, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা আখতার জাহান, ফেরদৌসী প্রিয়ভাসিনী(১৯৪৭) প্রমুখের রচনায়।

আমাদের গবেষণায় আলোকপ্রাপ্তা মুসলিম নারীর সেই চেতনাকে অনুসন্ধান করা হয়েছে; যে চেতনায় ভাস্বর হয়ে সেদিনের সেই চরম প্রতিকূলতার আবহেও তাঁরা তাঁদের যুগোপযোগী ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছেন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। যে দায়িত্ব পালনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা মর্যাদাময় জীবনের গৌরবময় পথ। সে পথে তাকে পরিবার ও সমাজের কাছে লাঞ্ছিতা হতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে সম্ভ্রম। কিন্তু তবুও তাঁরা পথ ছেড়ে দেন নি। সে পথে আলো জ্বেলেই একদিন এই পৃথিবীর সামগ্রিক মুক্তি অর্জিত হবে— এ কথা তাঁরা বিশ্বাস করেছেন। তাঁকে প্রমাণ করার জন্য বিশেষ যুগে সবথেকে উন্নত বৈজ্ঞানিক দর্শনের আশ্রয়ও তাঁরা নিয়েছেন। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুক্তির অবতারণা করেছেন। সে সংগ্রাম সহজ ছিল না। তাঁদের সে সংগ্রামের মধ্যেই রয়েছে আজকের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। তাঁদের সেই চেতনার মধ্যেই রয়েছে আজকের চেতনার ইন্ধন। তাই তাঁরা অনুস্মরণীয়।

যে স্বপ্নের অনুকূলে সেদিনের মুসলিম সমাজের অন্দরমহল অজস্র বিনিদ্র রাত পার করেছে অসীম ধৈর্যে। নিজেদের একটু একটু করে প্রস্তুত করেছে সংগ্রামের উপযোগী করে, সে স্বপ্নের অনেকটাই আজও অধরা। নারী প্রগতি ও মুক্তির জন্য সেদিনের আলোকপ্রাপ্তা

মুসলিম নারীরা যে অনুপ্রেরণাময় ভূমিকা সেদিন পালন করেছিলেন সেই সংগ্রামের ফল আজও সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। তাই অবগুণ্ঠনের প্রভাব, শরিয়তি আইনের চোখ রাঙানির উর্দ্ধেও সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আবর্তে বিপন্ন হচ্ছে আজকের নারী সমাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বাত্মক উন্নতির এই যুগে মানুষ হিসেবে নারীর সর্বাত্মক বিকাশের প্রয়োজনে এ সমাজ থেকে তার যা কিছু প্রাপ্য তা থেকে অনবরত তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, খর্ব করা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক অধিকার, ধনতান্ত্রিক সমাজের মুনাফা ভিত্তিক চিন্তার দ্বারা আজকের নারী প্রতিনিয়ত বিপন্ন হচ্ছে। আধুনিক সমাজের এই সমস্যার বিরুদ্ধেও অনবরত সংগ্রামে ব্রতী থাকতে হবে আজকের নারীকে। সেই সংগ্রামের চেতনা হবে আজকের যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক আদর্শ। আর অনুপ্রেরণা হবেন সেদিনের সেই আলোকপ্রাপ্তা নারীরা যারা নারী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। তাই যুগে যুগে তাঁরা প্রাসঙ্গিক থাকবেন। বেঁচে থাকবেন মননে ও চেতনায়। আমাদের এ গবেষণায় সেই অনুপ্রেণার উৎসকেই অনুসন্ধান করা হয়েছে। কখনও সে অনুপ্রেরণার নাম বেগম রোকেয়া, কখনও সুফিয়া কামাল, কখনও জাহানারা ইমাম। এভাবেই সেদিনের বাঙলার অসংখ্য মুসলিম নারীর সংগ্রাম আজকের নারী মুক্তি ও সমাজ প্রগতি আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করবে এই আমাদের প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন সেদিনের এক অনন্য যোদ্ধা জাহানারা ইমাম। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের প্রতি বার্তা দিয়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত জাহানারা ইমাম সেই স্বপ্ন দেখেছেন—

> আমাদের অঙ্গীকার ছিল লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ রাজপথ ছেড়ে যাব না। মরণব্যাধি ক্যানসার আমাকে শেষ মরণকামড় দিয়েছে। আমি আমার অঙ্গীকার রেখেছি। রাজপথ ছেড়ে যাইনি। মৃত্যুর পথে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। তাই আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং অঙ্গীকার পালনের কথা আর একবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণ করবেন। আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে থাকবেন। আমি না থাকলেও আপনারা, আমার সন্তান-সন্ততিরা-আপনাদের উত্তরসূরীরা সোনার বাংলায় থাকবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

আকরগ্রন্থ:

রোকেয়া, স্ত্রী জাতির অবনতি,*মতিচূর,* ১ম খণ্ড, ১৯০৫,কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

রোকেয়া, 'মুক্তিফল', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* শ্রাবণ ১৩১৮/৪:২, সম্পাদক-শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ; হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল, ৪:২ ।

রোকেয়া, বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি, সভানেত্রীর অভিভাষণ, *সওগাত,* চৈত্র ১৩৩৩, সম্পাদক- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, ৪:১০।

রোকেয়া, 'রানী ভিখারিনী', *মোহাম্মদী,* সম্পাদক- আকরম, খাঁ, পৌষ ১৩৩৪/১:৬।

রোকেয়া, 'নিরীহ বাঙ্গালী', *মতিচূর,* ১ম খণ্ড, ১৯০৫, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

রোকেয়া, 'চাষার দুক্ষু', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* বৈশাখ-১৩২৮, ৪:১, সম্পাদক- শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ; হক, মোহাম্মদ মোজাম্মেল, ৪:১।

রোকেয়া, 'বলিগর্ত্ত, *নবনূর* , আশ্বিন ১৩১১/২:৬, সম্পাদক- আলী, সৈয়দ এমদাদ।

রোকেয়া, '৭০০ স্কুলের দেশে', *সওগাত,* সম্পাদক- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ, কার্তিক ১৩২৭।

রোকেয়া, 'আমাদের অবনতি'/ 'স্ত্রীজাতির অবনতি' *মতিচূর,* ১ম খণ্ড, ১৯০৫।

রোকেয়া, 'শিশুপালন', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* কার্তিক- ১৩২৭/৩:৪, প্রাগুক্ত।

রোকেয়া, 'সুগৃহিনী', *মতিচূর,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত।

রোকেয়া, 'অর্ধাঙ্গী', *মতিচূর,* ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত।

রোকেয়া, 'সুবেহ সাদেক', *মোয়াজ্জিন,* আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৭।

রোকেয়া, 'এণ্ডি শিল্প', *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,* কার্তিক ১৩২৮/৪:৩, প্রাগুক্ত।

রোকেয়া, 'তিন কুঁড়ে', বার্ষিক *সওগাত* , ১৩৩৩, সম্পাদক- নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ।

খায়েরুন্নেসা, 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়',*নবনূর* , ৮ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৩১১, সম্পাদক: আলী, সৈয়দ এমদাদ।

খায়েরুন্নেসা, 'স্বদেশানুরাগ', *নবনূর* , আশ্বিন, ১৩১২, সম্পাদক- আলী, সৈয়দ এমদাদ ।

রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ 'খনা',*ভারত মহিলা,* অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ ।

রাহাতুন্নেসা, মোসাম্মৎ, 'ভারতী', *ভারত মহিলা* , ভাদ্র, ১৩১৯।

রহমান,মাসুদা, 'বাড়বানল', *বিজলী,* ২ চৈত্র, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, সদনুষ্ঠান- "কথা বনাম কাজ", *বিজলী* , ৩০ চৈত্র, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, 'শান্তি ও শক্তি', *ধূমকেতু* , ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, 'আমাদের স্বরূপ', *ধূমকেতু,* ২১ আশ্বিন, ১৩২৯।

রহমান, মাসুদা, 'আমাদের দাবী', *ধূমকেতু,* ২ আশ্বিন, ১৩২৯।

বিদ্যাবিনোদিনী, নুরুন্নেছা, 'আমাদের কাজ', *সওগাত,* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৬।

খাতুন, নুরুন্নেসা, বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা সংঘ সভানেত্রীর অভিভাষণ, *সওগাত,* মাঘ ১৩৩৩।

খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'সাহিত্য ও আর্ট', *মাসিক মোহাম্মদী,* অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'পল্লীর প্রতি নারীর কর্ত্তব্য', *গুলিস্তা,* অগ্রহায়ণ ১৩৪০

খাতুন সিদ্দিকা, মাহমুদা, 'বর্ত্তমানে নারীর কর্ত্তব্য' *মোয়াজ্জিন* ৩য় বর্ষ চৈত্র ১৩৩৮,

ফজিলতুন্নেসা, 'নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ', *শিখা,* ২য় বর্ষ, ১৯২৮, সম্পাদক- হোসেন, আবুল।

ফজিলতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', *সওগাত* , অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪।

ফজিলতুন্নেসা, 'মুসলিম নারীর মুক্তি', *সওগাত* , ভাদ্র, ১৩৩৬।

খানম ফাতেমা, 'দিদারুলের সাহিত্য প্রতিভা', *মাসিক সঞ্চয়,* ফাল্গুন - চৈত্র ১৩৩৬

খানম, মামলুকুল ফতেমা, 'তরুণের দায়িত্ব', *শিখা* , ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০, প্রাগুক্ত।

খাতুন চৌধুরানী, রাজিয়া, 'সমাজে ও গৃহে নারীর স্থান', *সওগাত* , ভাদ্র, ১৩৩৪।

মজিদ, আছিয়া বি এ, 'নবযুগের শিশু,*সওগাত, মহিলা সংখ্যা,* কার্তিক ১৩৪২।

মজিদ, আছিয়া, বি এ, 'শিক্ষা', *সওগাত, মহিলা সংখ্যা,* ১৩৪০।

নাহার, মাহমুদ, 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার', *সওগাত, মহিলা সংখ্যা* , কার্তিক, ১৩৪২।

খাতুন, সনজিদা, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই',*প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন,* নবযুগ প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১১০০, ১ম প্রকাশ ফেব্রু ২০১০।

খাতুন, সন্‌জিদা, 'দুটি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি' *প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন,* প্রাগুক্ত।

খাতুন, সন্‌জিদা, 'আমাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির আন্দোলন', *প্রবন্ধ সংগ্রহ: সন্‌জিদা খাতুন*, প্রাগুক্ত।

আহমেদ, সুফিয়া, 'ভাষার জন্য বাঁধ মানেনি সেদিন', *অমর একুশে এবং আজকের বাংলাদেশ,* হক, ইমদাদুল(সম্পা), মুন্নী প্রকাশক, বাংলা বাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ- ১০০, মূল্য- ৭০টাকা।

খাতুন, সনজিদা, 'একুশ আমাকে ভাষা দিয়েছে', *একুশে ফেব্রুয়ারি,* রাষ্ট্রভাষা আবুল হাসানত সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭, নয়া উদ্যোগ, কল-৬, পৃ- ১৪, মূল্য- ২৫০টাকা।

আরা, বাচ্চু 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', *ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর,* মাওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ফেব্রু ২০০৩, ঢাকা ১১০০, পৃ- ১০৬, মূল্য- ৩০০ টাকা।

স্মৃতিকথা ও অন্যান্য

রোকেয়া, *পদ্মরাগ,* প্রকাশ- ১৯২৪, ৮৬ এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

রোকেয়া, *অবরোধ বাসিনী,* প্রকাশ- ১৯৩১, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা।

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *রোকেয়া জীবনী*, সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ- জুন ২০১০, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ১০০/- টাকা।

কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী,* পঞ্চম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১৬, হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ২৫০ টাকা।

কামাল, সুফিয়া, *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮), *নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল* , গুপ্ত, শ্যামলী; সাত্তার, আবদুস; রায়, গৌতম (সম্পা), পুনশ্চ, কলকাতা ৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, মূল্য- ২৭০টাকা, পৃ-৪৯০।

ইমান, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি,* ১ম প্রকাশ ফেব্রু ১৯৮৬, ৩০ ম জানু ২০১৩, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা- ১০০০, মূল্য-৩০০টাকা।

ইমাম, জাহানারা, *অন্যজীবন* , ৪র্থ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪২৩, চারুলিপি প্রকাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা, দাম- ২০০টাকা।

প্রিয়ভাষিণী, ফেরদৌসী, *নিন্দিত নন্দন*, শব্দ শৈলী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রু ২০১৪, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৩০০ টাকা।

কায়সার, পান্না(সম্পাদিত), *হৃদয়ে একাত্তর,* ২য় মুদ্রণঃ বৈশাখ ১৪০৫ মে ১৯৯৮, আগামী প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, মূল্য- ১২০টাকা।

কায়সার, পান্না, 'আমার স্বামী' শহীদুল্লাহ কায়সার, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড), হায়দার, রশীদ(সম্পা), ১ম পুনমুদ্রণ- ফেব্রু ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা।

চৌধুরী, বেগম মাসুমা, 'আমার সন্তান' এ এফ জিয়াউর রহমান, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড),, প্রাগুক্ত।

মাহমুদ, সারা আরা, 'আমার স্বামী' আলতাফ মাহমুদ, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

মাহমুদ, যেবা, 'আমার বাবা' *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

হাসিন, মারুফা, 'আমার বাবা' আবু তালেব, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

জাহাঙ্গীর, ঝর্ণা, 'আমার স্বামী, গোলাম মোস্তফা, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

আজিম, শামসুন্নাহার, 'আমার স্বামী', আনোয়ারুল আজিম, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (১মখণ্ড), প্রাগুক্ত।

বেগম, আরশেদা রীনা, 'আমার ভাই', আরজ আলী, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতিঃ১৯৭১,*(২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রু ১৯৯৩, মূল্য- ৭০ টাকা।

মঞ্জুর, মকবুলা, 'আমার বন্ধু', মেহেরুন্নেসা, *স্মৃতিঃ১৯৭১,*(২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত।

তামান্না, কাজী, 'আমার ভাই' ডাঃ হাসিময় হাজরা, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (২য় খণ্ড), প্রাগুক্ত।

রহমান, মিলি, 'আমার স্বামী' বীরশ্রেষ্ঠ মতিয়ূর রহমান, *স্মৃতিঃ১৯৭১,* (২য়খণ্ড), প্রাগুক্ত।

খাতুন, সেলিনা, 'আমার ভাই' এ কে শামসুদ্দীন, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতিঃ১৯৭১* (৩য় খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৩৫টাকা।

বেগম, মালেকা, 'আমার অগ্রজা বন্ধু' সেলিনা পারভিন, হায়দার, রশীদ(সম্পা), হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতিঃ১৯৭১* (৪র্থ খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৫০টাকা।

হোসেন, কোহিনূর, 'আমার স্বামী' মোয়াজ্জেম হোসেন, *স্মৃতি:১৯৭১,*(৪র্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত।

হোসেন, সেলিনা, 'আমার প্রতিবেশী' ডঃ সিদ্দিক আহমদ, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি:১৯৭১* (৫ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯২, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা।

বানু, রোকেয়া, 'আমার ছেলে' মোকারম হোসেন, *স্মৃতি:১৯৭১* , (৫ম খণ্ড) প্রাগুক্ত।

সাদিক, জেসমিন, 'আমার বাবা' সোনাওর আলী, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি:১৯৭১* (ষষ্ঠ খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৩, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৭০টাকা।

বানু, খায়রুন্নাহার, 'আমার বাবা' শেখ মো. শামসুজ্জোহা, *স্মৃতি:১৯৭১* (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রাগুক্ত।

রহমান, সুলতানা, 'আমার সন্তান' আহমদ ওয়াহিদুর রহমান, হায়দার, রশীদ(সম্পা), *স্মৃতি:১৯৭১*(৭ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ- জানু ১৯৯৫, ১ম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ৫৫টাকা।

সালমা নার্গিস, শেখ, 'আমার বাবা' শেখ আবদুস সালাম, হায়দার, *স্মৃতি:১৯৭১* (৭ম খণ্ড), প্রাগুক্ত।

জাহান, সেলিনা আখতার, 'আমার স্বজন' আবদুর রশিদ সরকার, *স্মৃতি:১৯৭১* (৯ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ- ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আলমগীর, নাদিরা, 'আমার স্বামী' এ টি এম আলমগীর, *স্মৃতি:১৯৭১* (৯ম খণ্ড), প্রাগুক্ত।

রাব্বী, ডা: জাহানারা, 'মুক্তির আলোকে অনির্বান শিখা : ডা: ফজলে রাব্বী'; *শহীদ, বুদ্ধিজীবী স্মারক গ্রন্থ* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ- জানু ১৯৯৪, মূল্য- ৮৫ টাকা।

খাতুন, রাবেয়া, *একাত্তরের নয় মাস*, আগামী প্রকাশনী, ১ম সং- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৬৫ টাকা।

ইব্রাহিম, নিলিমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি,* ৭ম মুদ্রণ: এপ্রিল ২০১৬, জাগৃতি প্রকাশনী, শাহবাগ ঢাকা ১০০০, মূল্য- ৩০০টাকা।

চিঠিপত্র:-

রোকেয়া, প্রাপক- রহমান, মোহসেনা, ২৮.১১.৩১, ২১.০৫.১৯২৯, রো র, প্রাগুক্ত, পৃ- যথাক্রমে ৫৪০-৫৪১, পৃ- ৫৩৪।

রোকেয়া, প্রাপক- রহমান, মুজিবর, ১০.০১.১৯১১, ১০.০১.১৯১৩, ২০.১২.১৯১৮, রো র, প্রাগুক্ত, যথাক্রমে পৃ- ৫৪৮- ৫৪৯, ৫৪৬, ৫৫৮-৫৫৯।

রোকেয়া, প্রাপক- ইয়াসিন, মোহাম্মদ, ৩০.০৯.১৯১৩-০১.১০.১৯১৩, ওই, পৃ- ৫৫০-৫৫১ ।

রোকেয়া, প্রাপক- রসীদ, মরীয়ম, ২৪.০৩.৩০, পৃ- ৫৩৫।

রোকেয়া, প্রাপক-আহমদ, খান বাহাদুর তসদ্দক , ২৫.০৪.৩২, পৃ- ৫৪৩।

কামাল, সুফিয়া; আলম, মাহবুবকে লেখা চিঠি, ২০.০৯.১৯৩৭, *নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল* , গুপ্ত, শ্যামলী, সাত্তার, আবদুস, রায়, গৌতম (সম্পা), পুনশ্চ, কলকাতা ৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, মূল্য- ২৭০টাকা, পৃ-৪৯০ ।

কামাল, সুফিয়া, নাসিরুদ্দীনকে লেখা চিঠি, ২৩ জুলাই, ১৯২৯,*নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল* , প্রাগুক্ত পৃ-৪৮৮।

কামাল, সুফিয়া; ফজল, আবুলকে লেখা, ০৪.০৯.৩৭,*নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল* , প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯৩।

ইমাম, জাহানারা, মৃত্যুর আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি, *শাহবাগ শাহবাগ,* আমরা, এক সচেতন প্রয়াস, ৩৯৩ সার্ভে পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯২, ১ম প্রকাশ- বৈশাখ,১৪২০, সম্পাদনা- রায় চৌধুরী, শুভ্রপ্রতীম, মূল্য- ১০০/- টাকা।

সহায়ক গ্রন্থ :

আহমেদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা,* প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ১৯৮৩, প্রকাশক- হাবিব-উল-আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মূল্য- ২১০টাকা।

আলম, মুহম্মদ শামসুল, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জীবন ও সাহিত্য কর্ম,* প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, প্রকাশক- শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, মূল্য- ১৭০টাকা।

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী; নিয়োগী, গৌতম (সম্পা), *ভারত ইতিহাসে নারী,* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানী, কল- ৭০০০১২, ২য় মুদ্রণ- ২০০৯, মূল্য- ১৩০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ* , ন্যাশনাল এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় প্রকাশ- ২০১০, কল- ৭৩, মূল্য- ১০০টাকা।

সেন, ড: দীনেশ চন্দ্র, *প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান* , কথা সং ২০১১, রামগড়, কল- ৭০০০৪৭, মূল্য- ১০০/-টাকা।

সেন, ড: দীনেশ চন্দ্র, *বৃহৎ বঙ্গ* (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।

সেন, সুকুমার, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ- ২০১৫, মূল্য- ২৫০টাকা।

বিবেকানন্দ, চিঠি, *রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ : মুক্ত মনের আলোয়* (পত্র বিতর্ক সংকলন), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ২০০২, মূল্য-২০ টাকা।

কোকা, আন্তনভা; গ্রিগরি বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগরি কোৎভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* ২য় প্রকাশ ১৯৮৬, প্রগতি প্রকাশ।

সিংহ, কঙ্কর, *মনুসংহিতা এবং নারী* , র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ৩য় প্রকাশ- নভেম্বর, ২০১৫, মূল্য- ১০০টাকা।

ঘোষ, বিনয়, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০০৭৩, ৭ম সং- ২০১৩, মূল্য-২২০ টাকা।

মিত্র, ইন্দ্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০০৯, ৩য় মুদ্রণ- ২০০১, মূল্য- ২০০টাকা।

দেবদাস, সুপ্রতীপ, *বাংলা সাহিত্যে মীর মোশার্‌রফ হোসেন* , উত্তরক্ষণ, ১ম প্রকাশ- জুন ২০১৭, জোড়াবাগান রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৭, মূল্য- আশি টাকা।

পোলিট, হ্যারি, *নারী ও কমিউনিজম মার্ক্স থেকে মাও* , র‍্যাডিক্যাল, কল-৭০০০০৯, ২য় পরিমার্জিত সং- ডিসেম্বর ২০১২, মূল্য- ৮০টাকা।

নাসরিন, রাশেদা, *নারী ভাবনা শিক্ষা ভাবনা,* অবসর, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৮, মূল্য- ১১০টাকা।

ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ(সম্পা), *রোকেয়া যুক্তিবাদ নবজাগরণ ও শিক্ষা সমাজতত্ত্ব,* প্রথম প্রকাশ- ২০০৮, প্রকাশক- রিয়াজ খান, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ৪০০.০০টাকা।

হোসেন, আনোয়ার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১,* প্রথম প্রকাশ- মে, ২০০৬, ২য় সং- জুন,২০১৪, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, মূল্য- ২০০টাকা।

মুরশিদ, গোলাম, *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী,* ১ম ভারতীয় সং- জানুয়ারি ২০০১, প্রকাশক- পার্থশঙ্কর বসু, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা- ৬, মূল্য- ১৫০ টাকা।

বেগম, রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গে মুসলিম সমাজ,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০০, মূল্য-৯০ টাকা।

নাসিরুদ্দীন, মোহাম্মদ,*বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* , প্রকাশক, নূরজাহান বেগম, ১৯৮৫, ঢাকা।

হক, মফিদুল, *নারীমুক্তির পথিকৃৎ,* ১ম সং- ২০০৯, প্রকাশক- কথা, কলকাতা-৪৭, মূল্য- ১০০টাকা।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়: সমাজসংস্কার থেকে স্বাধীনতা* , অবভাস, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১০, কলকাতা-৮৪, মূল্য- ১০০টাকা।

নিশাত আমিন, সোনিয়া, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন,* প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০০২, প্রকাশক- ওবায়দুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০।

সুফী, মোতাহার হোসেন, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য* উত্তরণ, ১ম প্রকাশ – ১৯৮৬, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ২৫০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুতপা(সংকলন ও সম্পাদনা), "বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য উনিশ শতক", সাহিত্য অকাদেমি, ৫ম মুদ্রণ: ২০১৪, মূল্য- ১৫০টাকা।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাঙলা সাহিত্য,* চারুলিপি, ১ম প্রকাশ- ১৯৬৪, ঢাকা ১১০০, মূল্য- ৪০০ টাকা।

মাহমুদ, শামসুন নাহার, *বেগম রোকেয়া জীবনী,* সাহিত্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশ- ১৯৩৭, ঢাকা ১০০০, মূল্য- ১০০টাকা।

মাহ্মুদ, মোশফেকা, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি,* সাহিত্য প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪০২, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ১০০টাকা।

ঘোষ, অনিল(সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী,* কথা, কলকাতা ৭০০০৪৭, কথা সংস্করণ- ২০১৪, মূল্য- ৪০০টাকা।

হাসান, মোরশেদ শফিউল, *রোকেয়া পাঠ ও মুল্যায়ন* বিশ্ববঙ্গীয়, ১ম প্রকাশ ২০১৫, কল-৭০০০০৭, মূল্য- ১২০ টাকা।

রহমান, হাবিব, *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন* , মিত্রম, কল-৭৩, ১ম প্রকাশ ২০০৯, মূল্য- ১০০টাকা।

আখতার, শাহীন, ভৌমিক, মৌসুমী (সম্পা), *জানানা মহফিল* , স্ত্রী প্রকাশক, ১ম প্রকাশ- জানু ১৯৯৮, কলকাতা ৭০০০২৬।

দেব, চিত্রা, *অন্তঃপুরের আত্মকথা,* আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ- এপ্রিল ২০০৫, কল-৭০০০০৯, মূল্য- ৭৫টাকা।

আরা, বেগম জাহান, *বাঙলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান,* মুক্তধারা, প্রথম প্রকাশ- জানু ১৯৮৭, ৭৪, ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১।

খাতুন, খোদেজা; সালাহ্উদ্দিন, খালেদা; লুৎফুন্নেসা, সৈয়দা; খালেক, সেলিনা; রহমান, হামিদা; (বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ) সম্পাদিত, *শতপুষ্পা,* ছোটগল্প সংকলন, (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত মহিলা গল্পকারদের নির্বাচিত গল্প সংকলন), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ জানু- ১৯৮৯, মূল্য- ১০০টাকা।

আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, সাহিত্য বাজার, ১ম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৪০৬, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ৫০টাকা।

শরীফ, আহমদ, *বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা-১১০০, ৩য় মুদ্রণ- আগষ্ট ২০১২, দাম-২৫০টাকা।

সেনগুপ্ত, গীতশ্রী বন্দনা, *স্পন্দিত অন্তর্লোক, আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কল-৭৩, ১ম প্রকাশ- জানু ১৯২৯, মূল্য- ১৫০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুতপা, *মেয়েলি আলাপ*, পুস্তক বিপনি, কল-৯, ১ম প্রকাশ- আগষ্ট ২০১২, মূল্য-১৪০টাকা।

জামান, লায়লা, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, ১ম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, মূল্য-১১০ টাকা।

দত্তগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা, *নারী সওগাত পত্রিকায় বাঙালি নারীর আত্মপ্রকাশ (১৯২৭-৪৭)* , ১ম প্রকাশ ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, মূল্য- ৩০টাকা ।

চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, স্ত্রী, কলকাতা- ২৬, ১ম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, মূল্য- ১৫০টাকা।

বেগম, মালেকা, *নারীমুক্তি আন্দোলন* , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৮৯, মূল্য-৭০টাকা।

বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১০০০, ১ম প্রকাশ: ১৯৮৯।

মোহাম্মদ, নূর, *বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ও ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫, প্রকাশকাল- ফেব্রু ২০১৫। মূল্য- ৩৭৫টাকা।

বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা, দেশভাগ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কল-৭০০০২৭, ১ম প্রকাশ- জানু ২০০৬, মূল্য-১২৫টাকা।

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল(ভূমিকা), *নূরুন্নেছা গ্রন্থাবলী*, বাংলা একাডেমী: ঢাকা, জুন ১৯৭৭, ঢাকা-১, মূল্য- ১৬/- টাকা।

পারভীন, শাহিদা, *শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১২, মূল্য- ২০০ টাকা।

ইসলাম, মুস্তাফা, নূরউল (সম্পাদিত ও সংকলিত), *শিখা সমগ্র* (১৯২৭-১৯৩১), ১ম প্রকাশ জুন ২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, মূল্য- দুই শত পঞ্চাশ টাকা।

সিংহ, কঙ্কর, *দেশভাগ সংখ্যালঘু সংকট* , আমরা এক সচেতন প্রয়াস, কল-৬৭, ১ম প্রকাশ বইমেলা ২০১১, মূল্য- ১৪৮টাকা।

রফিক, আহমদ, *নারী প্রগতির চার অনন্যা* , কথা, কলকাতা ৭০০০৪৭, ১ম প্রকাশ-জানু ২০০৯, মূল্য- ৮০টাকা।

জাহাঙ্গীর, সেলিম, সুফিয়া কামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, প্রকাশকাল- জানু ১৯৯৯, ঢাকা-১১০০, মূল্য- ১০০টাকা।

জামান, সেলিনা বাহার(পরিকল্পনা-সম্পাদনা), *নির্বাচিত বুলবুল* (১৩৪০-১৩৪৫), বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা; বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা-৭০০০০৬, মূল্য- ৫০০টাকা।

গুপ্ত, শ্যামলী; সাত্তার, আবদুস; রায়, গৌতম (সম্পা), *নির্বাচিত রচনা সুফিয়া কামাল*, পুনশ্চ, কলকাতা ৭০০০০৯, সর্বাধুনিক সং- ২০০৭, মূল্য- ২৭০টাকা।

দাশগুপ্ত, প্রদীপন, *নারীমুক্তি মানবীচেতনা বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-৭২১১০১, ১ম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৫, মূল্য-৮০টাকা।

বিশ্বাস, কালিপদ, *যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়* , নয়া উদ্যোগ, পরিমার্জিত সংস্করণ-২০১২, কল-৭০০০০৬, মূল্য- ২৫০টাকা।

চৌধুরী, ড: কিরণ, *ভারতের ইতিহাস কথা* (১৫২৬-১৯১৪) ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কল- ৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ- ২০০০, মূল্য- ৭০/-টাকা।

উমর, বদরুদ্দীন, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশক-কমলকান্তি দাস,ঢাকা- ১২০৫, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৮, চতূর্থ মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মূল্য- ১২৫টাকা

সাদিয়া, সুপা, *৫২'র বায়ান্ন নারী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশ ফেব্রু-২০১১, ঢাকা-১১০০, মূল্য- ১৮০টাকা।

রফিক, আহমদ; ঘোষ, বিশ্বজিৎ(সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর* ,মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০০৩, মূল্য- ৩০০।

রহমান, মিজান(সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের ইতিকথা*, প্রকাশক- মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, কথাপ্রকাশ, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ১ম প্রকাশ-২০০৯, ২য় মূদ্রণ-নভেম্বর ২০১০, মূল্য- ১৫০.০০টাকা।

সরকার, স্বরোচিষ, *বিশ শতকের মুক্ত চিন্তা,* প্রকাশক- এফ. রহমান, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ১১০০, ১ম প্রকাশ- ২০০৮, মূল্য- ১৫০.০০টাকা।

রহমান, হাবিব, *বাঙালি মুসলমান সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন,* প্রকাশক- মিত্রম, কল- ৭৩, ১ম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর,২০০৯, মূল্য- ১০০টাকা।

হোসেন, সেলিনা, 'ফিরে দেখা', *একুশে ফেব্রুয়ারি,* নয়া উদ্যোগ, কল-৭০০০০৬, পুনর্মূদ্রণ ২০১৭ মূল্য- ২৫০ টাকা।

মতিন, আবদুল; রফিক, আহমদ, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য* , সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় সং ফেব্রু ২০০৫, মূল্য- দুইশ' পঁচিশ টাকা।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০, পুনর্মুদ্রণ-২০১৩, মূল্য- ৬০০টাকা।

খাবীরুজ্জামান, এস এম, *উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান,* পালক পাবলিশার্স, পুরনো পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রু ১৯৯২, মূল্য- ১০০টাকা।

উমর, বদরুদ্দীন, *সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি,* ১ম প্রকাশ ফেব্রু ১৯৮৯, প্রতীক, দাম- ৬২/-টাকা।

আহ্মদ, প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন; সরকার, মোনায়েম; মঞ্জুর, ড: নুরুল ইসলাম(সম্পা), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)* , আগামী প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ- ২০০৪, মূল্য-৪০০টাকা।

পারভিন, শাহনাজ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম পুনর্মুদ্রণ- আষাঢ়, ১৪১৭, মূল্য- ১৬০.০০টাকা।

খান, শামসুজ্জামান, হোসেন, সেলিনা, ইসলাম, আজহার, ইসলাম, নূরুল, ব্যানার্জী, অপরেশ কুমার, সুলতান, আমিনুর রহমান, তপন বাগচি (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান,* বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০, তৃতীয় সংস্করণ- জুন ২০১১, মূল্য- ২৫০টাকা।

আহমদ, বদরুদ্দিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী* , নওরোজ সাহিত্য সংসদ, বাংলা বাজার ঢাকা, জুন ১৯৮৬, দাম- ৪৫/- টাকা।

বেগম, মালেকা, *মুক্তিযুদ্ধে নারী,* প্রকাশক- প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, ১ম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০১১।

মামুন, মুনতাসীর, *মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১,* প্রথম প্রকাশ – ফেব্রুয়ারি ২০১০, ৩য় মূদ্রণ – মে ২০১৩ অনন্যা, ঢাকা, মুল্য—২৫০ টাকা।

হোসেন, সেলিনা, *একাত্তরের ঢাকা,* প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮৯, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, মূল্য- ১২০ টাকা।

শফী, মুশতরী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* , তৃতীয় সংস্করণ- ফেব্রুয়ারী- ১৯৯২, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা- ১১০০, মূল্য- ১৬০/-টাকা।

লতিফ, মমতাজ, *যুদ্ধ ও আমি,* ২০১৪, বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড। ঢাকা-১২৯, মুল্য- ২০০ টাকা।

আনাম, তাহমিনা, *এ গোল্ডেন এজ সোনাঝরা দিন* , অনুবাদ- গাজী, লীসা, সাহিত্য প্রকাশ, বাংলা অনুবাদ ১ম প্রকাশ- ২০০৮, ঢাকা- ১০০০, মূল্য- ৩৫০টাকা।

১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা , হায়দার, রশীদ(সম্পাদিত), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৩৯৬, পুরনো পল্টন, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ১০০টাকা।

বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, মূল সংগ্রহ ও সম্পাদনা : কাদেরী, ফজলুল কাদের, বাংলা অনুবাদ সম্পাদনা: হোসেন, দাউদ, সংঘ প্রকাশন, ঢাকা-১০০০, ৪র্থ সংস্করণ- সেপ্ট ২০১৩, মূল্য- সুলভ ৪০০/- টাকা।

রায় চৌধুরী, শুভ্রপ্রতীম, (সম্পাদনা), *শাহবাগ শাহবাগ,* আমরা, এক সচেতন প্রয়াস, ৩৯৩ সার্ভে পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯২, ১ম প্রকাশ- বৈশাখ,১৪২০, মূল্য- ১০০/- টাকা।

সহায়ক পত্রিকা

মণ্ডল, বরেন্দু, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁস বিতর্ক: ফিরে দেখা; *এবং মুশায়েরা,* 'উনিশ শতক: ফিরে দেখা' চন্দ, নবকিশোর; মন্ডল ড.দেবজ্যোতি; সরকার, ড. বিনোদ(সম্পাদিত), কলকাতা- ৭০০০০৭, মূল্য- ৩০০টাকা।

শাকেরউল্লাহ, (সম্পাদক), *ঊষালোকে,* রোকেয়া সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ২০১৩, প্রকাশ- মালিবাগ ঢাকা ১২১৭। মূল্য- ২০০টাকা।

আর্য্য, চন্দন, 'রোকেয়া: নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর', *সিউ পত্রিকা,* ২০১৪, সম্পাদক- খাতুন, আফরোজা, ডি-৪৮, ক্যালকাটা গ্রিনস কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, কল- ৭০০০৭৫।

চট্টোপাধ্যায়, গীতা, 'প্রাক স্বাধীনতা পর্বে মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্র', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ১১৩ বর্ষ-৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৪১৩।

দেবদাস, সুপ্রতীপ, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা- পশ্চাদ্‌পট ও উত্তর-উপলব্ধি', *স্মরণ শ্রদ্ধার্ঘ্য* , সারা বাংলা সার্ধশত রবীন্দ্র জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, সম্পাদক- চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য, কলকাতা ৭০০০১২, মূল্য- ৫০টাকা।

বসু, সঞ্জীব কুমার (সম্পাদক) *সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* 'বঙ্গভঙ্গ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম', কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা ১৪১১, মূল্য- ৭৫টাকা।

সাহা, অপূর্ব (সম্পাদক), *থির বিজুরি,* 'সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫-১৯১১', মাঘ ১৪১১, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, মূল্য- ৫০টাকা।

হাসান, জাহিরুল, 'বঙ্গভঙ্গের মুসলমান দিক' সাউথ গরিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সপ্তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০০৫, চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত, (সম্পাদক) বিনিময় মূল্য- ১০০টাকা।

ভট্টাচার্য, তপোধীর, ' বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভাগ: ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাস' *পরিকথা,* 'বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ', প্রাগুক্ত।

কর্মকার, লক্ষণ, 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ', *সৃজন,* 'শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন(বিশেষ সংখ্যা), এপ্রিল-জুন- ২০০৫, আমন্ত্রিত সম্পাদক- চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুদিন; সম্পাদক- কর্মকার, লক্ষণ; মূল্য- ৬০টাকা।

মহাপাত্র, রাজর্ষী, 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়', *সৃজন,* 'শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন(বিশেষ সংখ্যা), প্রাগুক্ত।

সেন, শুভঙ্কর, 'হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীন ভারত', *প্রমিথিউসের পথে* , ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টম্বর ২০১৪, সম্পাদক- ঘোষ, শংকর, বারাসাত, উ: ২৪ পরগণা, মূল্য- ৩০টাকা।

দেবদাস, সুপ্রতীপ, 'ইসলামের উৎস ইতিহাস ও শাস্ত্রীয় ভাষ্য', *প্রতিস্বর,* ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৮, জোড়াবাগান রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৭, মূল্য- ১১০/-টাকা।

বানু, খাদিজা, *পথিকৃৎ,* আগষ্ট ২০১৬, বাহান্ন বছর, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক- মানিক মুখোপাধ্যায়, দাম- তিরিশ টাকা।

দত্তভৌমিক, গোপা, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: অনন্য অগ্রপথিক, জার্নাল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, Lady Brabourne College, প্রধান সম্পাদক- সরকার, শিউলি, সম্পাদক- ভট্টাচার্য, ড: অর্পিতা; দত্ত, ড: স্বাতী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭, মূল্য- ১৮০টাকা।

ভট্টাচার্য, সুতপা, 'নারীর কলমে নারী', *আকাদেমি পত্রিকা* , সম্পাদকমণ্ডলী- মজুমদার, নেপাল; ঘোষ, শঙ্খ; দত্ত, বিজিতকুমার; ধর, কৃষ্ণ; বসু, অরুণকুমার; সরকার, পবিত্র; ঘোষ, জ্যোতির্ময়; বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; মজুমদার, মানস; চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার; মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ; অষ্টম সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৫, কলকাতা- ৭০০০১২, পৃ- ১৫, মূল্য- ৫০টাকা।

চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, 'বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা ও নারী', *আকাদেমি পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৫৭।

বসু, স্বপন, সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাঙালি নারী(১৮০০-১৯০০),*আকাদেমি পত্রিকা* , প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮৮।

রায়, বিনয়ভূষণ, 'অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা', *আকাদেমি পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪২।

আহমেদ, জাকিউদ্দিন, 'আগরতলা মামলা, সার্জেন্ট জহুর হত্যা এবং শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি', *নতুন দিগন্ত*, ষোড়শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭, সম্পাদক- চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, মূল্য- ৫০টাকা, ভারতে ১০০ রুপী।

ঊষালোকে, 'জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি* , জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪, সম্পাদক- শাকেরউল্লাহ, প্রকাশ- মালিবাগ ঢাকা ১২১৭। মূল্য- ৩০০টাকা।

অন্তর্জালিক সূত্র

https://arts.bdnews24.com>archives

www.kalerkantho. com

www.bhorerkagoj.net

protichinta.com

http://bn.m.wikipedia.org

https://www.liberationwarbangladesh.org

http://www.amarboi.com

https://m.facebook.com

https://songramernotebook.com/archives/42223

http://www.womennews24.com

www.narikothon,net

www.jugantor.com

https://www.anadabazar.com

https://alorpathshala.org

www.bbc.com

www.jugantor.com

https://www.prothomalo.com